এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারীর অবস্থান

নাদিয়া ইসরাত

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারীর অবস্থান

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নাদিয়া ইসরাত

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫২

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ:

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাদিয়া ইসরাত কর্তৃক উপস্থাপিত "রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারীর অবস্থান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি তার একক ও মৌলিক গবেষণার ফল। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভটি বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ আগে প্রকাশিত হয়নি এবং ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেয়া হয়নি।

এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের লক্ষ্যে এই অভিসন্দর্ভটিকে গবেষণাপত্র হিসেবে জমা দেয়ার জন্য গবেষককে অনুমতি দেয়া হলো।

.....
তত্ত্বাবধায়ক
এবং অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

"রবীন্দ্র–ছোটগল্পে নারীর অবস্থান" শীর্ষক অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের তত্ত্বধানে সম্পন্ন অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো গবেষণাপত্রে ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। সহায়ক যেসব তথ্য ও উপাত্ত অন্য উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে সেগুলোর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ আমার নিজস্ব।

অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদভুক্ত বাংলা বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

নাদিয়া ইসরাত
শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫২
রোল: ১২
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৪
প্রথম অধ্যায়	
বাংলা ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	০৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রবীন্দ্র-ছোটগল্প: সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৬
তৃতীয় অধ্যায়	
রবীন্দ্র-ছোটগল্প: নারীর অবস্থান	১১৬
ক) প্রথাগত	
খ) প্রথাবিরোধী	
উপসংহার	১৪৯
পরিশিষ্ট:	১৫০
গ্রন্থপঞ্জি	১৭৫
সহায়ক ও পঠিত গ্রন্থসমূহ	১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের একজন বিরলপ্রজ প্রতিভাবান সাহিত্যিক। নবতর রীতিবৈচিত্র্য ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের কারণে তিনি বাংলাসাহিত্যের জনপ্রিয় ও প্রভাবসঞ্চারী সাহিত্যিক। যদিও সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর বিচরণ, তথাপি রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প প্রথম সার্থকতা পেয়েছে। গতিশীল এই পৃথিবীতে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবন-যাপন, চিন্তা-চেতনা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সভ্যতা সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। সভ্যতার পরিবর্তনের এই ধারায় কথাসাহিত্যে মানুষের এই জীবন চিত্রিত হয়। আর সেই জীবন চিত্রণের নিপুণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর ছোটগল্প রচনার কাল পরিক্রমা ১৮৭৭ থেকে শুরু হয়ে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি অসংখ্য বিষয়, বিপুল বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে ছোটগল্পের অঙ্গনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারীর অবস্থান'। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া আরো তিনটি অধ্যায় রচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় 'বাংলা ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এ বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের উন্মেষ বিকাশ এবং কালপরিক্রমায় তা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরিদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামা 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প: সংক্ষিপ্ত পরিচয়'-এ 'গল্পগুচ্ছ' এর অন্তর্ভুক্ত চুরানব্বইটি গল্পের মধ্যে যে একাশিটি গল্পে নারীচরিত্র উল্লিখিত হয়েছে এবং যেসব গল্পে নারীচরিত্র মুখ্য হিসেবে এসেছে শুধু সেসব গল্পের আলাদা আলাদা ভাবে চরিত্রের পরিচয়, কাহিনি সংক্ষেপ এবং আমার মন্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প: নারীর অবস্থান ক) প্রথাগত খ) প্রথাবিরোধী'-এ 'গল্পগুচ্ছ'-এর অসংখ্য নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রথাগত ও প্রথাবিরোধী নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। স্বতন্ত্র সাহিত্য-আঙ্গিক সন্ধানে ব্রতী এই কথাসাহিত্যিককে মূল্যায়ন করার চেষ্টা এই অভিসন্দর্ভ।

২০১১ সালে আমি 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারীর অবস্থান' শিরোনামে বাংলা বিভাগে এম.ফিল. কোর্সে ভর্তি হই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. সৌমিত্র শেখরের অনুপ্রেরণা, পরামর্শ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পরম শ্রদ্ধেয় চিন্তাবিদ ও লেখক অধ্যাপক যতীন সরকার, টঙ্গি সরকারি কলেজের বিভাগীয় প্রধান খালেদা রায়হান, বাংলা একাডেমির সহকারী পরিচালক মো. নাসিরুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদক কামরুল হক ও বাংলা বিভাগের সাবেক ছাত্র মো. হাসানুল হক হাসান আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, মা-বাবা, ভাই, বোন, স্বামী আল- হেলাল মামুনের অফুরন্ত অনুপ্রেরণা আমাকে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী করেছে। তাঁদের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রেরণা আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ও সর্বকনিষ্ঠ অঙ্গন হচ্ছে ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। নব্য মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও বিকাশের অবধারিত দ্বন্দ্বের শিল্পমাধ্যম রূপ ছোটগল্পের উন্মেষের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হয়। তবে বাংলা ছোটগল্পের পূর্ণতা প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। আর তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়।

বিশ্ব কথাসাহিত্যে ছোটগল্পের আগমন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যথার্থ উপন্যাসের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে কালপরিক্রমায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছোটগল্পের সূচনা হয়। এই শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় রক্ষণশীল সমাজচেতনার সাথে ব্যক্তিচেতনার সংঘর্ষ যখন অবধারিত হয়ে ওঠে, যখন পুরনো মূল্যবোধকে একপাশে সরিয়ে নতুন আত্মপ্রতিষ্ঠাবাসনা সক্রিয় হয়ে ওঠে, ছোটগল্পের জন্ম সেই ক্ষণে। ঐতিহাসিক দিক থেকে ছোটগল্পের সূচনা হয় "উত্তর আমেরিকায় ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল,' এঙ্গার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট ফাউন্ড ইন এ বটল; আর নাথানিয়েল হথর্ন-এর সিলেশ্চিয়াস ওমনিবাস'-এ। এটিও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে ছোটগল্পের জন্ম হল পুরাতন পৃথিবীতে (য়োরোপে) নয়, নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায়)।"[১] এ সময়ই দেখা মিলে এডগার অ্যালান পো, নাথানিয়েল হথর্ন সহ আরো দু'জন নতুন প্রবর্তকের। তাঁরা হলেন গী-দ্য-মোপাসাঁ ও নিকোলাই গোগোল।

ছোটগল্পের জন্ম ও প্রসারতার মূলে সাময়িক পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা "অষ্টাদশ শতাব্দীতে কথাসাহিত্যের যে নূতন রূপ দেখা দিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাই সংবাদপত্রের প্রয়োজন ও পাঠক সাধারণের রুচির তাগিদে ছোটগল্পের রূপ পরিগ্রহ করল। আধুনিক ছোটগল্পের আদিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এডগার অ্যালান পো নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন "Essentially a Magazinist"।[২] বস্তুত সংক্ষিপ্ততার দিকে তিনি ছিলেন বিশেষ যত্নবান। ইংরেজি কথাসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যেও ঠিক এমনিভাবে প্রথম ছোটগল্পের আকস্মিক বিকাশ সাধিত হয় সাহিত্য সাময়িকীর প্রয়োজনের তাগিদে। "বাংলা ভাষার সাহিত্য" সাময়িক হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' কেবল নূতন যুগের পথিকৃৎ-ই নয়; নবজীবনের ধারাবাহকও [...] ছোট আকৃতির গল্প রচনা, তথা ছোটগল্প লেখারও প্রয়োজন-প্রেরণা প্রথমে যুগিয়েছে এই 'বঙ্গদর্শন'ই। প্রথম বর্ষের (১২৭৯) 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম ছোট আকারের গল্প লিখলেন, - 'ইন্দিরা' "[৩] পরবর্তীতে (১২৮০) সালের বৈশাখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বঙ্কিমের সম্পূর্ণ 'যুগলাঙ্গুরীয়' অবশ্য 'যুগলাঙ্গুরীয়'এবং

Dhaka University Institutional Repository

'ইন্দিরা'- কে 'বঙ্গদর্শনে'-এ উপন্যাস হিসেবে সে সময়ে পরিচায়িত করা হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত ছোট আকারের গল্পের অনেকগুলোকেই বঙ্কিম পরে দীর্ঘ করেছেন। তবুও যে একান্তই 'বঙ্গদর্শনের জন্য তিনি সংক্ষিপ্ত গল্প লিখেন এর মধ্য দিয়েই ছোটগল্প রচনার যাত্রা সূচিত হয়।

পরবর্তীকালে 'বঙ্গদর্শনে'ই (১২৮০) সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'মধুমতী' নামের একটি গল্প। গল্পটির লেখক বঙ্কিমের সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই 'মধুমতী' গল্পটিকে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও 'মধুমতী' ছিল লেখকের অবচেতন মনের ফসল, আর সে সময়ে 'বঙ্গদর্শনে' 'মধুমতী'কে উপন্যাস নামেই পরিচিত করা হয়েছিল। মূলত সাময়িক পত্রিকার তাগিদে এবং সাধারণ পাঠকের চাহিদার মুখে বিশ্বকথাসাহিত্যে তো বটেই বাংলা কথাসাহিত্যেও ছোটগল্প ধীরে ধীরে পূর্ণতার পথে এগোতে শুরু করে।

ছোটগল্প এক বিচিত্র সৃষ্টি। ছোটগল্পের সংজ্ঞা বা গঠনকৌশল সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত কোনো সিদ্ধান্তে এ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ছোটগল্পের গঠন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ইংরেজ গল্প লেখক স্টিভেনসন তাঁর বন্ধু গ্রাহাম বালফ্যুরকে জানিয়েছিলেন–"There are, so far as I know, three ways, and three ways only, of writing a story. You may take a plot and fit characters to it, or you many take a character and choose incidents and situations to develop it, or lastly, you may take 'certain atmosphere' and get actions and persons to realise it."[৪]

ছোটগল্পের রূপ বিভিন্ন ধরনের রীতি বহু প্রকারের। ছোটগল্পের কাহিনি ঘিরে একটি অখণ্ড ভাবরস জমাট বেঁধে ওঠে। বক্তব্যের স্পষ্টতা, উদ্দেশ্যের একমুখিতা ছোটগল্পের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন– "একটি ক্ষুদ্র আখ্যান-খণ্ডে সমগ্র জীবন-তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্যখচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবন প্রবাহের বেগ গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ইক্ষুদণ্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ঠ রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়োর বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরো স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা তৃপ্তি ঘটায়–এই নিগূঢ় জীবন সত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী বা সমালোচকগণ ছোটগল্পকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। এতে দেখা গিয়েছে একজনের কাছে যা গ্রহণযোগ্য অন্যের কাছে তা বর্জনীয়। মূলত যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করেই ছোটগল্প রচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অপরিহার্য হচ্ছে গল্পকারের সৃষ্টিতে তার সত্তার প্রতিফলন। জীবনের অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে শিল্পী যে কোনো একটি বিষয়কে নির্বাচন করে তাঁর মানসচেতনার আলোকেই ছোটগল্পের রূপ দিতে পারেন। ছোটগল্পকার বিন্দুতে সিন্দুর অন্বেষণ করেন।

ছোটগল্প, জীবনের রূপকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করে। ছোটগল্প তখনই ব্যঞ্জনাধর্মী হয় যখন তা ইঙ্গিতবহ হয়। তাই বলা যায় ছোটগল্পের বিষয়বস্তু কি হবে আর কি হবে না তা নির্বাচন করা কঠিন। ছোটগল্পের আঙ্গিনায় সকল বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাই বিষয়ের উপর নির্ভর করে ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ করার যৌক্তিকতা নেই। ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ সংকট, মনস্তত্ব, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ভৌতিক শিহরণ, গোয়েন্দা রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, রোমান্টিক জীবনবোধ, নর-নারীর প্রেম–কি নেই ছোটগল্পের দুনিয়ায়। আর সে কারণেই ছোটগল্প বৈচিত্র্যময়।

বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ রূপকার যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তথাপি ছোটগল্পের পথ-পরিক্রমায় তাঁর পূর্ববর্তীদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আর এ প্রসঙ্গে যাঁর নাম প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য সাময়িকী ‘বঙ্গদর্শনে’র কল্যাণে তিনিই প্রথম ছোট গল্প লিখেন যথাক্রমে ‘ইন্দিরা’ ও ‘যুগলাঙ্গুরীয়’। যদিও বঙ্কিমের আঠার পৃষ্ঠার ‘ইন্দিরা’ ও পনের পৃষ্ঠার ‘যুগলাঙ্গুরীয়’ রচনা দুটোকে ‘বঙ্গদর্শনে’ উপন্যাস বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তাঁর গল্প দুটো ছিল বড়, অনেকটা উপন্যাসধর্মী। মূলত তিনি ছিলেন অভিঘাত সংকুল জীবন চিত্রের নিপুণ শিল্পী। তাই উপন্যাস সৃষ্টিতে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন সে তুলনায় ছোটগল্পের ভুবনে তাঁর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তবে তিনিই পথ প্রদর্শক।

পরবর্তীতে ‘বঙ্গদর্শনে’র পাতাতেই বাংলা ১২৮০ সালের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মধুমতী’ নামের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। পূর্ণচন্দ্র তাঁর রচনায় সমকালীন জীবন-সমস্যার নিগূঢ় পর্যালোচনা করতে ব্যর্থ হয়ে একটি দুর্বল মুহূর্তের বিন্দুমূলে তাঁর চেতনাকে কেন্দ্রিভূত করে তুলেছেন, এবং প্রদর্শন করেছেন সমকালীন জীবনের প্রতি সহজাত সহানুভূতি। পূর্ণচন্দ্রের চৌদ্দ পৃষ্ঠার কিছু বেশি এই গল্প স্বার্থকনামা ছোটগল্প না হলেও ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে অনেকাংশে ত্বরান্বিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরই ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা যেতে পারে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তাঁর জন্ম (১৮৩৪-১৮৮৯) সালে, তাঁর 'নভেলা'জাতীয় রচনা ছিল 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' গল্প দুটো। গল্প দুটোতে ছোটগল্পের অভ্যন্তরীণ ঘটনার অনিবার্যতার পরিবর্তে বহিঃঘটনারই প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয়। 'দামিনী' গল্পটিতে চরিত্রগুলোর পারস্পরিক ও কার্যকারণ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, এবং ছোটগল্পের যে একমুখিতা তা গল্পটিতে অনুপস্থিত। অন্যথায় গল্পটি আধুনিক ছোটগল্পের অনেকটা কাছাকাছি ছিল।

রবীন্দ্রপূর্ব গল্পকারদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গল্পে ভিন্ন ধরনের আমেজ পাওয়া যায়। রূপকথা, রূপক, আজগবি ঘটনা, উদ্ভট চরিত্র সৃষ্টিতে এমন সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্য বাংলা গল্পকারদের মধ্যে খুব কমই লক্ষ করা গিয়েছে। তাঁর গল্প রচনার রীতিটি ছিল গ্রাম বাংলার বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করার মতো।

ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম সৃষ্টি 'কঙ্কাবতী'। এটিই তাঁর প্রথম রচনা, এই 'কঙ্কাবতী'তেই তাঁর মনোজগতের বৈশিষ্ট্য রূপ লাভ করে। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে 'ভূত ও মানুষ', (১৮৯৭) 'মুক্তামালা', (১৯০১) 'মজার গল্প', (১৯০৪) 'ডমরু-চরিত' (১৯২৩)। তাঁর ভৌতিক গল্পগুলো কৌতুক রসে পরিপূর্ণ। এছাড়া তিনি সমসাময়িক দেশকালের রূপ, চালচিত্র রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'ডমরু-চরিত'তে গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে কৌতুকের সংমিশ্রণ এই গল্পগুচ্ছকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। গল্পগুলোর মূল চরিত্রে ছিল ডমরুধর। অসংগত ও মাত্রাতিরিক্ত বিচিত্র কথক ডমরু ত্রৈলোক্যনাথের এক অনন্য সৃষ্টি। গল্প বলায় তাঁর ক্লান্তি নেই, শুধু মানুষই নয়, খেচর-ভূচর-জলচর, স্বর্গ-মর্ত্য রসাতল সবই তাঁর গল্পের বিষয়। মূলত ত্রৈলোক্যনাথের এই গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে যে নতুনত্ব নিয়ে এসেছে তা আজো মৌলিকত্বের দাবিদার ।

ত্রৈলোক্যনাথের চারটি গল্প সংকলনের মধ্যে মোট গল্প ছিল ত্রিশটি। "বঙ্কিম যুগের-অবসান কালে ও রবীন্দ্র যুগের সূচনা কালে ত্রৈলোক্যনাথ গল্প লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্প লেখেননি, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সূচনা ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। হিতবাদী সাধনা ভারতী নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে গল্পগুচ্ছের প্রথম দু খণ্ডের গল্পসমূহ প্রকাশিত হয়। এ সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্প লেখেন। দুজনের গল্প পাশাপাশি রেখে আমরা এই অনায়াসসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রবীন্দ্র-গল্প-ভাবনা ও শিল্প-রূপ ত্রৈলোক্যনাথকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। [...] উদ্ভট, আজগুবি, অলৌকিক ও রূপকথা-উপাদানে পরিপূর্ণ তাঁর গল্প। অথচ তা একেবারে বাস্তব বর্জিত নয়। ত্রৈলোক্যনাথের

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদের যুক্তিধর্মিতা, পরার্থপরতা, দেশহিতৈষিতা ও মানবমুখিতার পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়ানো আছে। সমাজ সংস্কারকের সচেতনতা ও মানবপ্রেমিকের সীমাহীন দরদ তাঁর গল্পে উপস্থিত।"[৬]

রচনা প্রকাশের সন তারিখের দিক থেকে দেখা যায় ত্রৈলোক্যনাথ রবীন্দ্র-উত্তর লেখক। কেননা তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'উপকথার উপন্যাস' 'কঙ্কাবতী' ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব রচনা আগের বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। "ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম গল্প 'বীরবালা' কিন্তু আরো এক বছর পরে ১৮৯৩-এ প্রকাশিত। তাহলেও শিল্পের পরিচয় শিল্পি-মনের অভিব্যক্তির চরিত্র ও কাল-চৈতন্য ঘিরেই। এদিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-চরিত্র, তাঁর জীবন-ভাবনা রবীন্দ্র-পূর্ব গল্প শিল্পেরই প্রতিনিধি"।[৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) রবীন্দ্রপূর্ব অপর আরেক গল্পকার। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বেশ কিছু ছোট গল্প রচনা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা ন-দিদি। 'নবকাহিনি' তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থ। তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-'কুমার ভীমসিংহ' 'ক্ষত্রিয় রমণী' ও 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব, তরবারী'। বিবৃতিসর্বস্ব এই কাহিনিগুলোতে ছোটগল্পের একমুখী তীক্ষ্ণতা খুব একটা লক্ষ করা যায়নি। তাঁর 'প্রতিশোধ' ও 'রক্তপিপাসু' গল্পদুটোতে প্লট ও চরিত্রের অভাব, হত্যাকাণ্ড ও বিভীষিকার চিত্র কেবল চিত্রিত হয়েছে। তবে স্বর্ণকুমারীর কিছু কিছু গল্পে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'নূতন বালা' গল্পটিতে বিহারীলালের পরিবারের আশাভঙ্গের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিহারীলাল সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে, ধারদেনা করে পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান। এবং উপযুক্ত পুত্রের জন্য বাবা-মা পাত্রীও ঠিক করেন। কিন্তু পুত্র সিভিলিয়ান হয়ে বিদেশী মেম বিয়ে করে বাড়ি ফেরে। এ গল্পে বাঙ্গালী ঘরের চিরায়ত ঘটনাটিকে নাটকীয় পরিণতির মাধ্যমে তিনি রূপায়িত করেছেন। 'চাবিচুরি' গল্পটি স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। লেখিকা খুব কৌশলে দেখিয়েছেন শৈশবে চাবি হারানোর বিষয়টি কিভাবে ঘটনাক্রমে জীবনের চাবি হারানোর রূপ নিল। ঘটনার বর্ণনার কৌশল, নাটকীয় চরম মুহূর্ত গল্পটিকে অনেকটাই পরিণতি এনে দিয়েছে। 'মিউটিনি' গল্পটিতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন ইংরেজ নারীর সাহসিকতার কৌতুককর পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আর 'টেলিসম্যান' গল্পটিতে পাঞ্জাবী আর্দালি রণবীর সিংয়ের আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ইতিহাস আশ্রিত ও রোমাঞ্চকর গল্পগুলোর পরিবর্তে পরিচিত সমাজ সংসার, ব্যক্তির সম্পর্ককেন্দ্রিক গল্পগুলো বেশি প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর প্রেমের গল্পগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম বেদনার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। 'অমরগুচ্ছ' গল্পটিতে হিন্দু বিধবার, দাদার বন্ধুর প্রতি নব প্রণয় ও বৈধব্যের সংস্কারের দ্বন্দ্ব, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করেছেন। এ জাতীয় গল্পের মধ্যে লেখিকার 'পেনে প্রীতি' যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ গল্পে একজন প্রেমিকার ব্যর্থ প্রতীক্ষার চিত্র কারুণ্যে ও মাধুর্যে ফুটে উঠেছে।

'ভারতী' পত্রিকার অপর আরেকজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার হচ্ছেন 'নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত' (১৮৬১-১৯৪০)। তিনি ছোটগল্প ছাড়াও নানা জাতীয় লেখা লিখেছেন। নগেন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রোমান্সের আধিক্য লক্ষ করা যায়, এমনকি সামাজিক কাহিনিগুলোতেও। তাঁর কোনো কোনো গল্পে পাশ্চাত্যের ছায়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

ছোটগল্পকার হিসেবে যাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণযোগ্য তিনি হচ্ছেন শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বজনবিদিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখক। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তিনি বিপুল বিষয় বহু বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ছোটগল্পের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। বঙ্কিম যুগের আবেগঘন প্রেম ও শহুরে আভিজাত্যের ছদ্মাবরণ থেকে বাংলা কথাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে।

রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শেই বাংলা ছোটগল্প পেয়েছে অপার সমৃদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই যে সব ছোট আকারের গল্প লেখার চেষ্টা করেছিলেন সেগুলোকে প্রস্তুতি পর্বের ছোটগল্প হিসেবে সনাক্ত করা যৌক্তিক। কেননা যথার্থ ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের স্ফূর্তি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিনী' (১৮৭৭) বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে। প্রথম গল্প হলেও 'ভিখারিনী'তেই রবীন্দ্র সত্তার রূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে "গল্পটি 'বঙ্কিমী ছত্রচ্ছায়ায়' রচিত, অনুরূপ আপাতবিচার অপ্রয়োজনীয়, এবং তা প্রতিধ্বনিসর্বস্ব। গল্প হিসেবে 'ভিখারিনী' নির্ভুল, সুষম ও শিল্পনিপুণ–এ-জাতীয় অসতর্ক মন্তব্যের আমি পরিপোষক নই। [···] কালগত বিবেচনায় এ গল্পে বিশুদ্ধ শৈলিনিষ্ঠা, সমগ্রতা ও নিবিড় ব্যঞ্জনধর্মিতা প্রত্যাশিত নয়। তবুও 'ভিখারিনী' যে রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক সাহস তা স্বতঃস্বীকার্য। [···] বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি হৃদয়ের পরাভবের কারণ হিসেবে অনুশীলন ধর্মের অভাবজাত মোহগ্রস্ত চিত্তবৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে করেছেন চিহ্নিত। অথচ এ সময় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানবজীবনের ট্রাজেডির কারণ, নির্বিচারী হৃদয়হীন প্রেমহীন পশুশক্তি, [···] নবজাগরণ-উদ্ভূত মানবতাবাদী [···] রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে হৃদয়ধর্মের জাগরণশক্তি হিসেবে মানুষকে চিহ্নিত করেছেন। মানুষের হৃদয়ের অনির্বচনীয় শক্তি অনুধাবনে তিনি মূলত গণতান্ত্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রগামিতা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথাসাহিত্য যাত্রায় নির্যাসশক্তি ও সামর্থ্যে প্রথমাবধি ছিলেন বঙ্কিম বলয়বিকেন্দ্রিক, স্বতন্ত্র পথচারী ।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিয়ত নিরীক্ষাশীল রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য সাধনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন, কোন সুনির্দিষ্ট রীতিতে তাঁর চিন্তা-চেতনাকে আবদ্ধ করে রাখেননি। সাধারণত তিনি যে সমাজের মানুষ ছিলেন সেখান থেকেই বহুদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল, আর সেই দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। "এবং প্রসঙ্গ বিশেষে অতি-মনোযোগ বা obsession-এর দোষও তাঁর নেই। তাঁর মন সজীব, সুতরাং তাঁর কৌতূহল ও ব্যাপক। গল্পগুচ্ছে বালকের চাপল্য এবং প্রৌঢ়ের জল্পনা, দরিদ্রের অশ্রু এবং ধনবানের অপব্যয়, কুমারীর অনুরাগ এবং বিধবার প্রেম, সবই আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোথাও অতি নিবদ্ধ নয় [···]।"[৯] মূলত রবীন্দ্রনাথই প্রথম পদ্মাপার থেকে তাঁর চোখে দেখা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হন। এবং এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বসূরিদের সর্বপ্রভাব মুক্ত স্বাধীন স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে: "এক সময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে; দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। [···] আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি; মর্মে অনুভব করেছি; সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। [···] আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙ্গালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। "[১০]

জীবন ও শিল্প এ দুটো রবীন্দ্রনাথের বেলায় আলাদা ছিল না। আর সেজন্যই তাঁর বাস্তব জীবন-কথার সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় সংযোগের প্রসঙ্গটি অনেকেই বলেছেন। যদি ধরা হয় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তাঁর বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক ভাবনার পরিপোষক, তবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে একটি আলাদা মাত্রা যোগ হয়। গঠন ও প্রকৃতির দিক থেকে তাঁর ছোটগল্প পাশ্চাত্যের ছোটগল্প থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় যথার্থ ছোটগল্পের পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন, এমনকি ছোটগল্প রচনার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আর তাই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে "নিজস্ব প্রতিভায় গল্পের রূপ এবং রীতি আবিষ্কার করতে হয়েছে, নানা পরীক্ষা নানা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকে রূপে রসে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়েছে। মাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়–নিজের সম্পর্কে গল্পকে আন্তর্জাতিক মানে সমুন্নত করেছেন তিনি এবং নিরপেক্ষ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত ত্রয়ীর (অ্যালান পো, চেকভ এবং মোপাসাঁ) তালিকায় চতুর্থ সংযোজন। কালের সঙ্গে পদক্ষেপ এবং বারে বারে, নবতম আন্দোলনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ এই চিরমহান প্রগতিশীলতাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সৃষ্টি-গর্ভ-ও সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। তাঁর ছোটগল্পও কালের সহগামীরূপে যুগচেতনার শীর্ষে থেকে রীতি ও বক্তব্যে বারে বারে নবীনায়িত হয়েছে।"[১১]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের মোট চারটি গল্পকে প্রস্তুতি পর্বের গল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গমনের পূর্বে যে চারটি গল্প লিখেছিলেন, সেগুলো হলো - "'ভিখারিনী'-১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় ভারতীতে প্রকাশিত; 'ঘাটের কথা' ভারতী পত্রিকায় ১২৯১ সালে কার্ত্তিক সংখ্যায় 'রাজপথের কথা' - নবজীবন পত্রিকায় এবং 'মুকুট' - বালক পত্রিকায় ১২৯২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।"[১২] এগুলোর মধ্যে 'ভিখারিনী' গল্পটি ষোল বছর বয়সে রচিত হয়েছিল ফলে এতে বেশি কিছু আশা করা অবান্তর। 'ঘাটের কথা' গল্পটিতেও ছোটগল্পের রূপ সুচারুভাবে ওঠে আসেনি, আবার 'রাজপথের কথা' গল্পটি বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে 'মুকুট' গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রস্তুতি পর্বের এ গল্পগুলো প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে না।

প্রস্তুতি পর্বের পরপরই ১২৯৮ সালেই রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী পত্রিকার জন্য প্রায় ছয়টি গল্প লিখেছিলেন। গল্পগুলো হলো– 'দেনা পাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'ব্যবধান' ও 'গিন্নি'। এ পর্বের গল্পগুলোতে জীবনের বাস্তবতা ও প্রকৃতি সমান গুরুত্ব পেয়েছে। এবং এ গল্পগুলোর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের আপন গল্পের জগৎ সৃষ্টি হয়। এ পর্বেরই দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাধনা' পত্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাসূত্রে 'সাধনা' পত্রিকার ১২৯৮ থেকে ১৩০২ সালের ভাদ্র-কার্ত্তিক সংখ্যা পর্যন্ত প্রায় চুয়াল্লিশটি গল্প লিখেছিলেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো–"খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, (১২৯৮), সম্পত্তি সমর্পণ (১২৯৮), কঙ্কাল (১২৯৮), একরাত্রি (১২৯৯), জীবিত ও মৃত (১২৯৯), কাবুলিওয়ালা (১২৯৯), ছুটি (১২৯৯), সুভা (১২৯৯), মধ্যবর্তিনী (১৩০০), শাস্তি (১৩০০), সমাপ্তি (১৩০০), মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১), নিশীথে (১৩০১), ক্ষুধিত পাষাণ (১৩০২), অতিথি (১৩০২) ইত্যাদি।"[১৩]

'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পগুলোকে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবের দিক থেকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। স্তরগুলো হল-"প্রেম, সামাজিক জীবন সম্পর্ক বৈচিত্র্য, প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ, অতি প্রাকৃতের স্পর্শ।"[১৪] প্রথম পর্যায়ে প্রেমের গল্প হিসেবে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হলো–'একরাত্রি, 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক জীবন সম্পর্কিত গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে–'পোস্টমাস্টার', 'ব্যবধান', 'দানপ্রতিদান', 'কাবুলিওয়ালা', 'মাস্টারমশায়', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'পণরক্ষা', 'রাসমনির ছেলে', 'কর্মফল', 'দিদি', 'হালদার গোষ্ঠী', 'ঠাকুরদা', 'দেনাপাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী' ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে যে গল্পগুলোতে সেগুলো হলো–'সুভা', অতিথি ও আপদ এই কয়েকটি গল্প।

চতুর্থ পর্যায়ে অতিপ্রাকৃত গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে 'গুপ্তধন', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'জীবিত ও মৃত' ও কঙ্কাল'।

অন্যদিকে আবার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার কালপ্রবাহ সুদীর্ঘ হওয়ায় বিশ্বজিৎ ঘোষ আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর রচনার এই কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন:

"(ক) আদিপর্ব : ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্য;
(খ) মধ্যপর্ব : বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত;
(গ) অন্ত্যপর্ব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত।"[১৫]

ষোল বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিনী' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হয়ে সময়ের কাল পরিক্রমায় ও বহু পরিচর্যায় তাঁর গল্পভাণ্ডার হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়। প্রথম পর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি প্রায় একষট্টিটি গল্প লিখেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো–'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দালিয়া', 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'জীবিত ও মৃত', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি', 'ডিটেকটিভ', 'অধ্যাপক' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পগুলোতে মানব হৃদয়-রহস্য উন্মোচনের বিষয়টি লক্ষণীয়। এবং এ পর্বের গল্পগুলো পল্লীকেন্দ্রিক হওয়ায় প্রকৃতির সাথে মানব মনের মেলবন্ধনে গাঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। গল্পগুলোর বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশ ও পরিণাম সৃষ্টিতে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ পর্বের গল্পগুলোতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের আবেগঘন অন্তর্জীবন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করায় স্বাভাবিকভাবেই গল্পের গদ্যভাষা হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত পত্রাবলি ও ডায়েরিতে চলিত গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, তথাপি এ পর্বের গল্পগুলো সাধু গদ্য ভাষায় রচিত। রবীন্দ্রনাথের এই গদ্য আবেগ দ্বারা প্রভাবিত। এখানেই এ পর্বের গল্পগুলো স্বকীয়তা। কবি রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন কবির গল্প লিখেছেন লেখকের মতো করে নয় কবির মতো করে। তাঁর গল্পের কাব্য ধর্ম সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য–"বিশ্বসাহিত্যে আমরা আর কোনো লেখকের কথা জানি না যিনি

Dhaka University Institutional Repository

একই সঙ্গে বিরটি কবি এবং মহৎ গল্প লেখক, শুধুমাত্র এই কারণে আমরা যেন ধ'রেই নিই যে একসঙ্গে ও-দুটো হওয়া যায় না,"[১৬] কিন্তু এক্ষেত্রে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনিই বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। এবং কাব্য ও গল্পের ক্ষেত্রে তিনি সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের গল্পসমূহের সময়সীমা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বিংশ শতাব্দী শুরু থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ষোলটি ছোটগল্প লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'মণিহারা', 'নষ্টনীড়', 'মাল্যদান', 'গুপ্তধন', 'পণরক্ষা', প্রভৃতি। প্রথম পর্বের গল্পগুলোতে পল্লীর মানুষের হৃদয়ের ভাষা মুখ্য বিষয় হলেও মধ্য পর্বের গল্পগুলোতে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্বের শেষের দিকের গল্পগুলোতে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলো সামান্য আকারে উপস্থাপিত হয়েছিল দ্বিতীয় পর্বে তা বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ক্রমশ নগর অভিমুখী হয়ে নাগরিক জীবনকে তাঁর গল্পের প্লট হিসেবে নিয়েছেন। নাগরিক জীবনের অস্তিত্বের সংকট মনস্তাত্তিক জটিলতা বহুমাত্রিক কৌশলে রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ প্রথম পর্বের আবেগ দ্বিতীয় পর্বে বিশ্লেষণধর্মী চর্চার রূপ নিয়েছে।

অন্ত্যপর্বের সময়সীমা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে রচিত হয়েছে প্রায় ঊনত্রিশটি গল্প। আর এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–'হৈমন্তী', 'হালদার গোষ্ঠী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', রবিবার', 'ল্যবরেটরি' ইত্যাদি। এ পর্যায়ের গল্পগুলোর সৃষ্ট চরিত্রে ঘোষিত হয়েছে ব্যক্তিত্বের আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমা। রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে, সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ও প্রথাসিদ্ধ ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির বিদ্রোহই অন্ত্যপর্বের গল্পগুলোর মূল বিষয়। পরাধীন মাতৃভূমির লাঞ্ছনা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু ঘাত-প্রতিঘাত রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখীন করে এক নবজীবন জিজ্ঞাসার। শেষ পর্বের গল্পগুলোতে তাঁর চেতনার পরিচয় সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন–"My stories of a later period have got the necessary technique, ... I have different strata of my life and all my writings can be divided into so many periods, all of us have different incarnations in this very life, we are born again & again in this very life. "[১৭]

মূলত রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের মুক্তি। তাঁর পূর্বসূরিরা বাংলা ছোটগল্পের সূত্রপাত ঘটালেও যথার্থ ছোটগল্পের বিকাশ ও পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কঠোর সমালোচনাকারী বুদ্ধদেব বসুর উক্তিটি স্মরণযোগ্য–"গল্পগুচ্ছ আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য,

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিক মূল্যেও তা-ই। বাংলাভাষায় প্রথম ছোটগল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং এমন সময় লেখেন, যখন ইংরেজী সাহিত্যেও ছোটগল্প নামক বস্তুটির চল হয় নি। [···] গল্পগুচ্ছ [···] যা অসংখ্যবার পড়েও পুরোনো হয় না।"[১৮] বাংলা মহাকাব্য, সনেটও নাটকের প্রথম ও নিপুণ শিল্পী মাইকেল, উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিম আর গীতিকবিতার প্রবর্তক বিহারীলাল, এ যেমন সর্বজনবিদিত তেমনি বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এও সর্বজন স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে বলা যায় "ছোটগল্পে তিনি সর্বপ্রভাবমুক্ত স্বাধীন শিল্পী। এ ক্ষেত্রে কোনো ভারতীয় লেখকের প্রভাব তাঁর উপরে নেই। সমকালীন বা ঈষৎ পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য ছোটগল্পকাররা তাঁকে প্রাণিত করেছেন বটে, কিন্তু প্রভাবিত করেননি। বস্তুত ভারতীয় সাহিত্যে ছোটগল্প নামক শিল্পরূপটি তিনিই গড়ে তুলেছেন।"[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর সৃষ্টি ছোটগল্পই আমাদের গবেষণার আধার।

তথ্য নির্দেশঃ

০১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা,' প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং: আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ৬।

০২। রথীন্দ্রনাথ রায়, 'ছোটগল্পের কথা,' প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯, পুস্তক বিপণি প্রকাশনী, পৃ. ১২৭।

০৩। ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, পৃ ৪৮।

০৪। উদ্ধৃত, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

০৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা,' ১৩৭৩, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, পৃ. ৭।

০৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯।

০৭। ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৮। সৈয়দ আকরম হোসেন, 'প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,' প্রকাশকাল: অক্টোবর ১৯৯৭, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১০-১১।

০৯। ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

১০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১১। তরুণ ঘোষ, 'প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ও ছোটগল্প,' প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৮, বসুশ্রী বুক স্টল, ৫৭/২বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, পৃ. ৫-৬।

১২। তরুণ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৩। তরুণ ঘোষ প্রাগুক্ত পৃ. ৭।

১৪। তরুণ ঘোষ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১৫। বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'একুশের স্মারক গ্রন্থ' ৯৭', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, পৃ. ১৬২।

১৬। উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

১৭। উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

১৮। বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য', প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৫৫, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা– ৪০, পৃ. ১৭।

১৯। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-ছোটগল্পঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রবীন্দ্র ছোটগল্প সৃষ্টিজগতের আয়তন যতোই হোক এর একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক সীমা আছে। আমরা প্রথমেই এই ছোটগল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পাঠান্তে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। এই পরিচয় লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গল্পগুলোর শিরোনামের আদ্যাক্ষরক্রম মান্য করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পটি জল ও স্থলভাগের মেলবন্ধনে সৃষ্টি নৈসর্গিক চিত্রে ভরপুর একটি গল্প। কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকায় করে যখন সপরিবারে স্বদেশে ফিরছিলেন পথের মাঝে পনেরো ষোল বছর বয়সী এক ব্রাহ্মণছেলে তাদের সহযাত্রী হয়েছিল। নাম তার তারাপদ। অতিথি হিসেবে পুরো গল্প জুড়েই তারাপদর বিচরণ। গিন্নী অন্নপূর্ণাদেবী তাকে মাতৃস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। "সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোটকথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। [···] সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; [···] কিন্তু বন্ধন এমনকি স্নেহ বন্ধনও তাহার সহিল না; [···] তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।"[১]

তারাপদ ক্রমান্বয়ে কখনো যাত্রা কখনো পাঁচালি আবার কখনো জিমন্যাস্টিকের দলে ভিড়ে নানা বিদ্যা আয়ত্ব করেছে, এমনকি রান্নার কাজেও সে নিপুণ, নৌকা চালাতেও সে পটু। সবার সব কাজেই তারাপদ চিরকালের সহযোগীর মতো অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারত। ভিয়ান করতে সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তার কিছু কিছু জানা আবার কুমারের চক্রচালনা যে সে একেবারেই জানে না তাও নয়। এভাবেই তারাপদ সমস্ত গ্রামটির হৃদয় অল্পদিনেই হরণ করে নিয়েছিল। কেবল জমিদারবাবুর নবম বর্ষীয়া কন্যা চারুশশীকে তার দুর্ভেদ্য মনে হয়েছিল। এই বালিকাটি ঈর্ষা সে তখনো জয় করতে পারেনি। তারাপদর গুণগুলো যতই অন্যের সামনে প্রকাশিত হতে লাগল চারুর রাগ যেন ততই বাড়তে লাগল। আবার এই তারাপদর একাধিকার নিয়ে চারু তার সখী সোনামণিকে প্রবল আক্রমণ করে তার সাথে মর্মান্তিক আড়ি পর্যন্ত ঘটিয়েছে।

চারুর আচরণের এই বৈপরীত্য ছাড়াও তারাপদর কাছে জমিদারবাবুর লাইব্রেরিটি ছিল আরেকটি কৌতূহলের ক্ষেত্র। তারাপদর পড়াশোনায় অসীম আগ্রহ দেখে জমিদারবাবু তার ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে

Dhaka University Institutional Repository

দেন। সেই সাথে বাধ্য হন তাঁর জেদী কন্যার ইচ্ছা পূরণ করে তাকেও তারাপদর সহপাঠীকা করতে। অপর দিকে জমিদারবাবু কন্যার সম্বন্ধ করতে গিয়ে চারুর একগুয়ে স্বভাবের জন্য হেনস্থা হয়ে অবশেষে তারাপদকেই ঘরজামাই করার মনোস্থির করেন। এবং তারাপদর মা ও ভাইয়ের সম্মতি নিয়ে জমিদারবাবু গোপনেই সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে কুড়ুলকাটায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা উপলক্ষে পণ্যদ্রব্য বোঝাই বহু নৌকা ঘাটে এসে লাগে, আর তার পরদিন থেকে তারাপদকে কাঁঠালিয়া গ্রামে কোথাও দেখা যায় না । "স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"[২]

এক কথায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জল-স্থলের এই চিরস্থায়ী নির্বাক বিশ্বপ্রকৃতির পরমাত্মীয়। আর তারাপদকে তিনি যেন তাঁর শিল্পমানসের প্রতিরূপ করেই সৃষ্টি করেছেন, প্রতিনিয়ত সম্মুখাভিমুখে চলাই ছিল যার একমাত্র কাজ। সংসারে নানা জটিলতা, কুৎসিত-কদর্য বিষয় সে দেখেছে, শুনেছে কিন্তু কোনো কিছুই তার শুভ্র অন্তঃকরণে ছাপ ফেলতে পারেনি। ঠিক যেন তারাপদর ভেতর দিয়ে চিরপথিক রবীন্দ্রনাথই নির্লিপ্ত সুদূরতার পানে ধেয়ে চলেছেন।

'অধ্যাপক' গল্পটিতে শুধু পারিবারিক জীবন কাহিনিই আলোচিত হয়নি বহির্জগতের ঘটনাবলীও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। নায়ক মহীন্দ্রকুমারের চরিত্রে আত্মম্ভরিতা প্রকাশমান। কলেজে সহপাঠী মহলে মহীন্দ্রের একটু বিশেষ কদর ছিল,' কেননা রচনা করতে, বক্তৃতা দিতে, সমালোচনা করতে সে কখনোই অনাগ্রহী ছিলেন না। যে কোনো বিষয়ে অধিকাংশ মানুষেরই যেখানে অভিমত দ্বিধায় দোদুল্যমান সেখানে মহীন্দ্রকুমার ভুল হোক আর ঠিক হোক জোরের সাথে অভিমত ব্যক্ত করতে পারতেন। তার এই আপন মহিমা সে বন্ধু সম্প্রদায়ে শেষ পর্যন্ত অক্ষয় রাখতে পারতেন কিন্তু মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন 'তাদের কলেজের একজন নবীন অধ্যাপক। তাই এই নব্যহিন্দুর দল এই নবীন শিক্ষকের নাম দিয়েছিল ব্রহ্মদৈত্য।

এই নব্যহিন্দু দলের একটি তর্কসভা ছিল। সে সভার বিক্রমাদিত্য, নবরত্ন ঐ একজনই মহীন্দ্রকুমার। তাই এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মহীন্দ্র কার্লাইলের সমালোচনা করে এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার অসাধারণত্বে শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হবে–চমৎকৃত হওয়ার কথা ছিল, কারণ তার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত তিনি নিন্দা করেছিলেন। "সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে ... বামাচরণবাবু উঠিয়া শান্তিগম্ভীরস্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমৎকর এবং যে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।"[৩]

এই ঘটনার পর থেকে সহপাঠীদের কাছে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলেও কেবল তা অক্ষুণ্ন ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমূল্যচরণের হৃদয়ে। এবং অমূল্যের পরামর্শে নিজের বিখ্যাত 'বিদ্যাপতি' নাটকটি বামাচরণের দৃষ্টিগোচরের লক্ষ্যে আরেকটি অধিবেশন আহূত হয়। সেখানেও একইভাবে অধ্যাপক সকলের সামনে জানিয়ে দেন যে এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে রচিত টাসো নাটকের অনুকরণে রচিত। বামাচরণের এই দ্বিতীয় তীব্র আক্রমণে মহীন্দ্রকুমার প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নির্জনবাসের আশ্রয় নেন। এবং ঘটনাচক্রে তিনি পরিচিত হন ভবনাথবাবু ও তার কন্যা কিরণবালার সাথে। ক্রমান্বয়ে তার হৃদয়ে সোনার কাঠির স্পর্শে প্রেমের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এই প্রথমবার সে বুঝতে পারে–জার্মান পণ্ডিত-রচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাস, ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোক ছাড়াও আরেকটি স্বপ্নলোকের জগৎ আছে। কিন্তু এই কল্পলোকের জগৎ থেকে বাস্তবের ধরাধামে মহীন্দ্রকুমার এক মুহূর্তে পদার্পণ করে লাল পেন্সিলে দাগ-দেয়া একখানা স্টেট্স্ম্যান কাগজ হাতে পেয়ে। পরীক্ষায় নিজের অকৃতকার্যতার সংবাদ ভবনাথবাবুকে জানাতে গিয়ে বুঝতে পারে প্রথমস্থান অধিকারিণী কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় তারই পূর্ব কল্পনাপ্রেয়সী কিরণ এবং চরম অপ্রিয় বামাচরণ কিরণের হবু স্বামী। তাই মহীন্দ্রকুমার আর কালক্ষেপণ না করে দেশে ফিরে পিতার ইচ্ছে পূরণ করে।

'অধ্যাপক' গল্পটিতে নায়ক যদিও মহীন্দ্রকুমার তথাপি লেখক তাকে এড়িয়ে গল্পের নামকরণ করেছেন। কবিখ্যাতি প্রার্থী দৃঢ়বিশ্বাসী মহীন্দ্র যে পরিমাণ আত্মদম্ভে ডুবে ছিলেন সে তুলনায় তার যোগ্যতা তেমন কিছু ছিল না। বরং অযোগ্যের অপ্রয়োজনীয় চাতুরী গল্পে কৌতুক আবহের সৃষ্টি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সেসময়ের নব্যহিন্দুদের মধ্যে সকলের প্রতি অর্থাৎ বাহ্ম এবং অহিন্দুদের প্রতি একধরনের তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় অহংকারে অহংকারী গল্পের নায়ক মহীন্দ্রকুমার। তাই সে অধ্যাপককে জ্ঞানের গভীরতায়, যুক্তির জালে বাঁধতে না পেরে আড়ালে নতুন-নতুন নামে আখ্যায়িত করে নিজেই কৌতুকের সামগ্রী হয়েছেন।

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে লেখক জয়কালী চরিত্রটিকে তার ভেতরে বাহিরে সামঞ্জস্য রেখে সৃষ্টি করেছেন। জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রীলোক যা তার মানসিক চরিত্রের সাথে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল। কেননা অধ্যাপক স্বামী মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বর্তমানে তাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিঃসন্তান বিধবা জয়কালী বাকি বকেয়া আদায় করে বহুদিনের

Dhaka University Institutional Repository

বেদখল সম্পত্তি উদ্ধার করে সবদিক গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলন। তার প্রাপ্য থেকে কেউ তাকে একবিন্দু কম দিতে সাহস পেত না।

> "এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাহাকে ভয় করিত; কারণ পল্লীবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত। [···] যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না। রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।"[৪]

কেবলমাত্র পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র পুলিন ও নলিন তাঁর সাথে থাকত। পুলিনের বিয়ের সম্বন্ধ এলেও তিনি কোথাও কথা পাড়তেন না তাঁর ইচ্ছে ছিল পুলিন আগে উপার্জন করবে তার পরে বধূ ঘরে আনবে।

তবে জয়কালী যত কঠোর মানসিকতারই হোন না কেন রাধানাথ জীউর মন্দিরে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন। এই মন্দির ছিল তার সবচেয়ে যত্নের স্থান যার এতটুকু ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই পূজক ব্রাহ্মণ ও নিস্তারিণী দেবতার চেয়ে জয়কালীকে বেশি ভয় পেতেন। এমনকি মন্দিরের স্বার্থে তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র নলিনকে কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল এক মূক প্রাণী শূকরের প্রাণ রক্ষার বেলায়। যার খোঁজে মাতাল ডোমের দল তাঁর মন্দিরের দ্বারে এলে তিনি দ্বিধাহীন ভাবে মিথ্যা ভাষণ করেছিলেন। তার মন্দির অপবিত্র না করে ডোমের দলকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মানুষ যে অতি বিচিত্র জীব তারই আরেকটি উদাহরণ হিসেবে লেখক সৃষ্টি করেছেন এই জয়কালী চরিত্রটিকে। যার ভয়ে সমস্ত পল্লীর মানুষ ভীত তিনিই কিনা স্নেহের প্রস্রবণ বইয়ে দিলেন এক অশুচি শূকরছানাকে বাঁচাতে। যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে কোথাও একটি তৃণমাত্র পড়ে থাকতে পারত না সেই মন্দিরেই তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন এই অসহায় জীবকে। পবিত্রতার দোহাই দিয়ে সমাজের রক্তচক্ষুকে তিনি পরোয়া করেননি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব। এবং তাঁর ভাবনার ব্যাপ্তি ছিল ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করে বৃহত্তের দিকে। তাই বলা যায় তিনি জয়কালীর পরিচিত স্বভাবের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অপ্রকাশিত এই স্নেহের ধারাটি যোগ করে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা পাঠকের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম পুরুষে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পটি পণপ্রথাকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে। গল্পের নায়কেরা নাম অনুপম। তেইশ বছর বয়সে বিয়েকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনি সাতাশ বছর বয়সে বিবৃত করেছেন। অনুপমের পিতা ওকালতি করে অর্থ উপার্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু অকাল মৃত্যুতে তিনি অর্থ ভোগের অবকাশ পাননি। ছেলেবেলা থেকে অনুপম মায়ের হাতে মানুষ হলেও তার আসল অভিভাবক তার মামা। অঘটন ঘটনে সক্ষম এই মানুষটির কারণেই আজ তাকে কয়েক বছর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়েছে।

অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুর থেকে এক কন্যার সন্ধান নিয়ে এসেছিলেন অনুপমের জন্য। মেয়ের বয়স যদিও পনের তথাপি মেয়ের চেয়ে মেয়ের পিতার অবস্থাটাই মামার কাছে বেশি গুরুতর ছিল। কেননা তিনি এমন বেহাই চান যার টাকা নেই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করবে না। যাই হোক হরিশের রসনার গুণ আছে মামার মন নরম হল বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল।

কিন্তু বিবাহ সভায় মামাকে অতি চতুরতার খেসারত দিতে হয়েছিল। তিনি সভায় দাঁড়ি-পাল্লা কষ্টিপাথর সমেত বাড়ির স্যাকরাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, পাছে কন্যার পিতা নকল গহনা দিয়ে তাকে ঠকিয়ে দেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়েছিল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথ সেনের দেয়া তার পিতামহীর আমলের সকল গহনার সাথে একজোড়া এয়াড়িং ছিল যা দিয়ে পাত্রপক্ষ কন্যাকে দেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। মামা যখন সমস্ত গহনা যাচাই করাচ্ছিলেন তখন শম্ভুনাথ এয়াড়িং জোড়া স্যাকরার হাতে দিলেন পরখ করার জন্য। এবং সাথে সাথেই প্রমাণ হয়ে গেল কন্যার পিতা নন পাত্রপক্ষই জালিয়াতি করেছেন।

সকল ঘটনা অনুপমের সামনে সংঘটিত হওয়ার পরও তার নীরব ভূমিকা শম্ভুনাথকে পরবর্তী বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছিল। তাই তিনি বরকে বিবাহসভায় না নিয়ে ভজনসভায় নিয়ে আহারপর্ব শেষ করেন। এবং সবশেষে কন্যাকে সম্প্রদান না করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

কন্যার পিতার অতি দম্ভ, নিজের পরিবারের এমন চরম অপমানের পরও অনুপম তার কল্পনাপ্রেয়সীকে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেননি। ঘটনার বহুদিন পর সে লোকমুখে শুনেছিলেন সেই মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটেছিল কিন্তু সে পণ করেছে আর কখনো বিয়ে করবে না। বলা আবশ্যক মেয়েটির এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অনুপমকে পুলকিত করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এমনি একসময় অনুপম মাকে নিয়ে তীর্থে যাবার কালে কাকতালীয়ভাবে তার কল্পনাপ্রেয়সীর সাক্ষাৎ পান, যদিও তারা জানতেন না এই মেয়েটিই কল্যাণী। এক ট্রেন থেকে অপর ট্রেন বদল করার সময় অনুপমদের পূর্বকৃত টিকিটকে রেলোয়ে কর্মচারী ইংরেজ জেনারেল সাহেবের জন্য বাতিল বলে দাবি করেন।

> তখন অনুপমদের পাশের "মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।" বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন মাস্টারকে ইংরেজী ভাষায় বলিল "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্য কথা।" বলিয়া নাম লেখা টিকেটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।"[৫]

দেখাগেল গাড়ি ছাড়ার সময় অতিক্রান্ত হলেও গাড়ি না ছেড়ে আরেকটি গাড়ি জুড়ে তবে ছাড়া হলো। কানপুরে স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াতেই মেয়েটি জিনিসপত্র গুছিয়ে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন মা আর থাকতে না পেরে মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলেন। উত্তর শুনে মা ও ছেলে চমকে উঠেন। নায়ক তার পরে কানপুরে গিয়েছেন হাত জোড় করেছেন মাথা হেঁট করেছেন। শম্ভুবাবুর হৃদয় নরম হয়েছে কিন্তু কল্যাণীর পণ সে বিয়ে করবে না। অনুপম কিন্তু আশা ছাড়তে পারেননি। বছরের পর বছর তিনি কানপুরেই থাকেন আর ভাবেন এই যে তিনি জায়গা পেয়েছেন।

মূলত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সমাজ-বাস্তবতার আলোকে নারীজাগরণের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে এই 'অপরিচিতা' গল্পটির মাধ্যমে। পণপ্রথার মতো একটি সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে এই গল্পের আবর্তন। স্থিতধী ব্যক্তিত্ববান শম্ভুনাথ সেনই সম্ভবত বাংলাসাহিত্যের একমাত্র পিতা যিনি বিবাহের আসর থেকে কন্যাকে সম্প্রদান না করে বরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবং পিতার এই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তার কন্যার স্বভাবেও। বিবাহসভায় সংঘটিত সেই অপমানজনিত ঘটনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী কল্যাণী বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে কর্মময় জীবনকে বেছে নিয়েছেন।

'অসম্ভব কথা' গল্পটিতে লেখকের ছেলেবেলার স্মৃতিচারণা স্থান পেয়েছে। সেই সাথে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক ও শিশু পাঠকের মানসিকতার তুলনামূলক আলোচনা আলোচিত হয়েছে। ছেলেবেলায় যে কথাটি লেখকের বা কথকের হৃদয়কে আকর্ষণ করত তা হলো–এক যে ছিল রাজা। সে রাজাকে নিয়ে শিশু মনে আর কোনো জটিল প্রশ্ন উদয় হতো না। শিশু কেবল রূপকথার মধুর রসটুকু আস্বাদন করত। কিন্তু এখনকার প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক যেন শুরুতেই ধরে নেন যে লেখক মিথ্যাবাদী। তাই শেষে তাকে কেউ নির্বোধ ভাবে সেজন্য চালাক হওয়ার অভিপ্রায়ে হাজার প্রশ্ন করে মিথ্যা উত্তর শুনে তবে লেখককে বিশ্বাস করেন। লেখক তাই আফসোসের সাথে জানিয়েছেন–মানুষ ঠকতেই ভালোবাসে তবে শেষটায় খুব আড়ম্বর করে ঠকে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের ছেলেবেলার এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যেবেলার কথা উল্লিখিত হয়েছে গল্পে। সেদিন কলিকাতা শহর বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল। তার শিশু প্রাণ ভেবেছিল আজ আর গৃহশিক্ষক আসবেন না কিন্তু ঠিক সময়ে দেখা যায় মাস্টার মহাশয়ের ছাতাটি। শিক্ষককে দেখেই তিনি মাকে জানালেন আর তার অসুখ আজ আর পড়া হবে না।

তার এই মিথ্যা অসুখের খবর মায়ের কাছে গোপন রইল না তবে তিনি শাস্তিও পেলেন না বরং অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো। এবং শেষটায় অসুখের মেয়াদ আর দীর্ঘস্থায়ী করে মা ও দিদিমার বিন্তি খেলায় ভঙ্গ দিয়ে দিদিমার কাছে বায়না করেন গল্প শোনার। শুরু হয় গল্পের ভেতর গল্পের আয়োজন–এক যে ছিল রাজা। তার ছিল এক রানী। তাদের একটি পুত্র সন্তান না থাকায় রাজা দেবতার নিকট প্রার্থনা করে কঠিন তপস্যা করার জন্য রানী ও শিশু কন্যাকে রেখে বনে চলে যান। এদিকে একে একে বার বছর কাটে তবুও রাজার কোনো খবর নেই। তার কন্যা ষোড়শী হওয়ায় রানী কন্যার বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে রাজাকে খবর পাঠালেন–শুধুমাত্র তার গৃহে একদিনের আহার গ্রহণের জন্য। রাজা রানীর কথামতো গৃহে এলে রানী স্বহস্তে রান্না করা চৌষট্টি ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন এবং রাজকন্যা রূপে চারদিক আলো করে চামর করতে লাগলেন। রাজা রাজকন্যাকে দেখে রানীর কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারেন এ কন্যা তারই এবং তার অবর্তমানে কন্যা এখনো অবিবাহিত। তখন রাজা তড়িঘড়ি জানালেন পরের দিন রাজদ্বারে যার মুখ দেখবেন তার সাথে কন্যার বিয়ে দেবেন। সত্যি পরের দিন সাত-আট বছর বয়সী এক ব্রাহ্মণ বালকে কাঠ সংগ্রহ করতে দেখে রাজা তার সাথেই কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন। কন্যা মনের দুঃখে বহু দূরদেশে গিয়ে এক অট্টালিকা নির্মাণ করে বালক স্বামীকে যত্নে মানুষ করতে থাকে। বালক প্রতিদিন পুঁথি হতে পাঠশালে যায়। ক্রমেই গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখে বালক যত বড় হতে লাগল ততই তার সহপাঠীরা তার কাছে জানতে চাইল সাত মহলা বাড়িতে সে যার সাথে থাকে সে তার কে। বালক ভেবে অস্থির একটু একটু মনে পড়ে চার পাঁচ বছর আগে রাজবাড়ির জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়াতে গিয়ে ভারী গোলমাল হয়েছিল, সেই থেকে এই রাজকন্যার সাথে সে থাকে। গৃহে এসে বালক রাজকন্যার কাছে জানতে চায় রাজকন্যা তার কে? রাজকন্যা পরে জানাবে বলে জানায়। এমনি করে আরো চার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণতনয় রাগ করে রাজন্যার কাছে তাদের সম্পর্ক জানতে চাইলে রাজকন্যা জানায় আজ রাতে আহার করে সে যখন শয়ন করবে তখন বলবে। ব্রাহ্মণতনয় সূর্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানা পেতে, ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধি তেলে বাতি জ্বালিয়ে চুল বেঁধে নিলাম্বরী কাপড় পরে রাত্রির জন্য প্রহর গুণতে থাকে। ব্রাহ্মণতনয় রাত্রির আহার শেষে ফুলের বিছানায় শয়ন করে এবং মনে মনে ভাবে আজ সে জানবে রাজকন্যা তার কে। রাজকন্যা তার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খেয়ে পালঙ্কে প্রবেশ করে দেখলেন–ফুলের মধ্যে সাপ ছিল তার স্বামীকে দংশন করেছে মৃত দেহখানি মলিন হয়ে পুষ্পশয্যায় পড়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

গল্প শুনে শ্রোতা বালক লেখকের বক্ষস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসে, দিদিমার কাছে আবার প্রশ, তারপর? এর উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারেন না। কিন্তু বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুর অনুগমন করেছিলেন। শিশুরও বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর আঁচল ধরে ফেরাতে চায়। কিছুতেই ভাবতে পারে না যে, তার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা যাবে। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের কবল থেকে গল্পটিকে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়। ক্লান্তিতে বালকের শ্রান্ত দুটি চোখ আপনি বুজে আসে সে শুনতে পায়–

"আমার কথাটি ফুরোল,
নোটে গাছটি মুড়োল।"[৬]

কিন্তু এখন বয়স বেড়েছে এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থেমে কঠিন কণ্ঠে শুনতে হয়–

"আমার কথাটি ফুরোল না,
নোটে গাছটি মুড়োল না।
কেন রে নোটে মুড়োলি নে কেন।
তোর গোরুতে ..."[৭]

'অসম্ভব কথা' গল্পটি লেখকের আত্মস্মৃতি বিবৃতিমূলক গল্প। গল্পের ভেতর গল্পের অবতারণা। গল্পকথক তার শৈশবের এক সন্ধ্যেবেলার নিরানন্দ পড়ায় ফাঁকি দিয়ে দিদিমার মুখের এক রূপকথার গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। গল্পের প্রথম দিকে গল্পকথক খুব সুচারুভাবে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের তুচ্ছ জ্ঞানাভিমানের বিদ্রূপ করে শিশুর নিতান্তই সরল রসজ্ঞ মনের প্রশংসা করেছেন। কথকের ভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঠকতেই ভালোবাসে, কিন্তু তাকে কেউ নির্বোধ ভাবে সে জন্য সেয়ানা হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অথচ শেষ পর্যন্ত অতি আড়ম্বর করে ঠকে। অন্যদিকে শিশুর মন এত কিছু জানতে চায় না শুধুমাত্র মধুর রসটুকু উপভোগ করতে জানে। কিন্তু গল্পের শেষে শৈশবের বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটিয়ে পূর্ণবয়স্কের মন নিয়ে ছোটগল্পের অসম্পূর্ণতাকেই মেনে নেয়া হয়েছে।

'আপদ' গল্পটি অন্তঃপুরের কাহিনি নিয়ে রচিত। গল্পের নায়িকা কিরণময়ীর অসুস্থতার কারণে বায়ু পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন হলে স্বামী শরৎ স্ত্রী ও মাকে নিয়ে চলেন চন্দননগরের বাগান বাড়িতে। কিন্তু এখানে এই অখণ্ড অবসর জীবনে কিরণ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কেবল ঘড়ির সময় ধরে ধরে ঔষধ খাওয়া, তাপ দেওয়া, পথ্য পালন করা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই স্বামীর শত অনুরোধকে চোখের জ্বলে ভাসিয়ে যখন তার জয়ের সম্ভাবনা সূচিত হচ্ছিল তখনই বেহারার মাধ্যমে খবর এল নৌকাডুবি হয়ে একটি ব্রাহ্মণবালক সাঁতার দিয়ে তাঁদের বাগানে আশ্রয় নিয়েছে। এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে কিরণের অভিমান দূর হয়ে যায় সে তখন সেই

Dhaka University Institutional Repository

বালকের জন্য শুষ্কবস্ত্র তার আহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সাথে শরৎবাবুও কিছুটা নিশ্চিন্ত হন এই ভেবে যে তার স্ত্রী আপাতত এই কাজটি নিয়ে মেতে থাকবেন, বাড়ি ফেরার কথা মুখেও আনবেন না। এমনকি কিরণের শাশুড়িও ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় প্রসন্ন হয়েছিলেন।

ক্রমান্বয়ে দেখা যায় ধনী পরিবারের আশ্রয়ে যাত্রা দলের নীলকান্ত অনধিকার চর্চা করতে শুরু করে। যেমন গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে তামাক টানা, বৃষ্টিতে শরতের শখের সিল্কের ছাতা নিয়ে গ্রাম পর্যটন করা, এমনকি একটি মলিন গ্রাম্যকুকুরসহ অসংখ্য শিশুভক্ত সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত তার দলের নানান উপদ্রবের তো গ্রামে সীমাপরিসীমা ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে শরৎ ও তার মা চাচ্ছিলেন আর নয় অনেক হয়েছে এখন নীলকান্তের চলে যাওয়াই উচিৎ কিন্তু বাঁধ সাধে কিরণ– কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশি স্নেহ দিতেন, তা সন্দেহ নেই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাকে অনেক নিষেধ করতেন, কিন্তু তিনি তা মানতেন না।

ইতিমধ্যে কলেজের ছুটিতে কলকাতা থেকে শরতের ভাই সতীশের আগমন ঘটে। আমোদপ্রিয় কিরণময়ী সমবয়সী দেবরের আবির্ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। এদিকে দেবর বৌদিদির নিত্য কৌতুক পরিহাসে আড়ালে চলে যায় নীলকান্ত আর তাই তার অন্তর জর্জড়িত হয় সতীশের প্রতি তীব্র ঈর্ষায়। নীলকান্তে'র কাছে সম্মুখের সব কিছুই যেন তিক্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নীলকান্ত স্পষ্টত সতীশের সাতে শত্রুতা করার সাহস না পেলেও সুযোগমত সতীশের জামাটা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে, সাবান চুরি করে কিছুটা ক্ষোভ দমন করার চেষ্টা করত।

ও পরবর্তীতে তাদের স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হলে কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব করেন কিন্তু স্বামী-শাশুড়ি-দেবর একবাক্যে অস্বীকৃতি জানান। তাই কিরণ নীলকান্তকে স্নেহবাক্যে তার নিজ দেশে যাওয়ার উপদেশ দেন-কিরণের কথায় নীলকান্তকে মর্মাহত হয়ে কাঁদতে দেখে সতীশ বিরক্তি প্রকাশ করেন।

অবশেষে যাত্রার আগের দিন সতীশের শৌখিন দোয়াতদান নিখোঁজ হলে সতীশ সরাসরি নীলকান্তকেই চোর সাব্যস্ত করেন, সেই সাথে কিরণও সতীশের হয়ে নীলকান্তকে পাশের ঘরে নিয়ে অনুরোধ জানান দোয়াতদানটি ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু নীলকান্তের কান্না তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করায় যে সে জিনিসটি নেয়নি এমনকি স্বামী দেবর নীলকান্তের বাক্স খুঁজে দেখতে মনোস্থির করলে কিরণ রাজি হননি। পরবর্তীতে স্নেহরসে সিক্ত হয়ে কিরণ কিন্তু নতুন পোষাক নীলকান্তের জন্য আনিয়ে তাকে না জানিয়ে তার বাক্সের মাঝে রাখতে গিয়ে সেই দোয়াতদানটি আবিষ্কার করেন। এমনি সময় নীলকান্ত উপস্থিত হলে পেছন থেকে কিরণকে দেখতে পেয়ে ভাবে কিরণ তার বাক্সে চুরির জিনিস খুঁজতে এসেছে। কিন্তু সে যে সাধারণ চোর নয় এই কথাটি বোঝানের অক্ষমতায়

সে পরের দিন কিরণের সামনে থেকে, নিরুদ্দেশ হয়। তার অনুপস্থিতিতে শরৎ সতীশ তার বাক্স অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হলে কিরণ অস্বীকৃতি জানান এমনকি সেই দোয়াতদানটি গোপনে বাক্স থেকে সরিয়ে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। তারপর সকলে মিলে চন্দননগর ত্যাগ করেন। গ্রামে নীলকান্তের কুকুরটি কেবল তার জন্য হাহাকার করে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

'আপদ' গল্পটিতে লেখক নীলকান্তকে যথার্থই আপদ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নীলকান্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত গল্পটির নাম 'আপদ' সার্থক হয়েছে। গল্পের নায়িকা কিরণময়ী অসুস্থ অবস্থায় স্বামী শাশুড়ির সাথে বায়ু পরিবর্তনে চন্দননগরের বাগান বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এবং ঘটনাক্রমে এ বাড়িতে আশ্রয়পায় এক অনাথ যাত্রাদলের ছোকরা ব্রাহ্মণবালক নীলকান্ত। যাকে বাড়ির কেউই সহ্য করতে পারত না, সে ছিল কেবল কিরণময়ীর স্নেহভাজন। কিন্তু কালক্রমে স্বভাবের নিয়মে সম্ভবত কিরণময়ীর সান্নিধ্যে বালক নীলকান্ত তার বয়ঃসন্ধিকাল নিঃশব্দে পার হয়ে আর বালক থাকে না। তাই তার অচেনা মন আরো বেশি কিছু দাবি করে। তার অতীতটাকে সে ভুলে যেতে চায়, হতে চায় নতুন এক নীলকান্ত, যে হবে কিরণময়ীর সমকক্ষ। তাই সে পড়াশোনা শেখার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। তবে কিরণময়ী নীলকান্তের এই পরিবর্তনের কিছুই জানতেন না। নীলকান্তের প্রতি তার অনুভূতি ছিল নিখাঁত দয়া স্নেহ ও কৌতুকের। কিন্তু পরবর্তীতে দেবর সতীশের দোয়াতদানটি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিরণময়ীর কাছে নীলকান্তের মনোভাব ধরা পড়ে। যা কিরণময়ীকে বিস্মিত করেছিল। কিন্তু সে নীরব থেকে নিরুদ্দেশ নীলকান্তকে চোরের অপবাদ থেকে বাঁচিয়ে দেন। এখানে কিরণময়ীর মানসিকতাও যুক্তিপরম্পরাহীন। তবে সব দিক বিবেচনায় 'আপদ' গল্পটি উঁচু শিল্পের দাবিদার।

'উদ্ধার' স্বল্পপরিসরে ঘটনামূলক গল্প। গল্পের শুরুতেই পরিলক্ষিত হয়–স্ত্রী গৌরীর প্রতি স্বামী পরেশের অনাস্থা। বিয়ের পর পরেশের সংসারে গৌরীর ভবিষ্যৎ অসুবিধার কথা চিন্তা করে ধনী শ্বশুর-শাশুড়ি বিলম্বে কন্যাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ করেছেন। আর সে কারণেই প্রথম থেকেই পরেশ সুন্দরী বয়স্কা স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য বলে বোধ করতে পারেননি। তাছাড়া পরেশ ছিলেন সন্দিগ্ধ স্বভাবের। তার সন্দেহ প্রবণ মন স্ত্রীর জন্য উদ্বিগ্ন থাকত। প্রথম-প্রথম অকারণে কাজের লোকদের ছাড়িয়ে তারপর গোপনে দাসীর কাছ থেকে নিজস্ত্রীর খবরা-খবর নেয়ায় স্বল্পভাষিণী, তেজস্বিনী গৌরী স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। পরেশের এই উন্মত্ত সন্দেহ তাদের মাঝে প্রলয়খড়গের মতো দাঁড়িয়ে দু'জনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অবশেষে স্বামী ও সংসারের সুখ বঞ্চিতা সন্তানহীনা গৌরী ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীর সংস্পর্শে এলে, পরেশের সন্দেহ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড ক্ষোভে পরেশের মিথ্যা সন্দেহকে

গৌরী সত্য বলে ঘোষণা করে সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থিনী হলে সন্ন্যাসী তাকে পরেশের গৃহেই ফেরত পাঠিয়ে দেন কিন্তু সুস্থির হতে পারেন না। এদিকে উৎপীড়িতকে উদ্ধারের পরিকল্পনা জানিয়ে সন্ন্যাসী পত্র প্রেরণ করেন, ঘটনাক্রমে তা পরেশের হাতে পৌঁছায়। এবং পত্রপাঠে পরেশ মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেই সন্ন্যাসীর আগমনে গৌরীর নিজের অজ্ঞাত মনের বাসনা, সন্ন্যাসীর মানসিকতা, সবই তার কাছে ইঙ্গিতবহ হয়ে প্রতিভাত হয়। যার ফলে তিনি আত্মহননে উদ্বুদ্ধ হন।

গল্পটিতে ত্রিকোণ জটিল মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে। পরেশের সাথে গৌরীর বিয়ের পর তাদের মানসিক দূরত্বের কারণ হিসেবে দু'পক্ষের পারিবারিক অবস্থানকে সনাক্ত করা যেতে পারে। পরেশের আর্থিক সংগতির প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ির স্পষ্ট ইঙ্গিত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। হতে পারে পারিবারিক অবস্থানে এই পার্থক্য তাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে যা পরবর্তীতে মানসিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যে কারণে সে বাড়ির কাজের লোক থেকে শুরু করে সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত তার সন্দেহের অনলে দগ্ধ করেছেন। অপরদিকে নিজেদের অজ্ঞাতে গৌরী ও সন্ন্যাসী একে–অপরের প্রতি দুর্বল হয়েছেন। পরেশের মৃত্যুর পর সদ্যবিধবা গৌরী উপলব্ধি করতে পেরেছেন পরেশের সন্দেহ অবান্তর নয়। তাই যে মুহূর্তে গৌরীর আত্মোহংকারের পতন হয়েছে সেই মুহূর্তেই তিনি বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ।

'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে জমিদারের নায়েব বৃদ্ধ গিরিশ বসু। তার গৃহে দূরদেশী প্যারী নামের এক অল্প বয়সী মেয়ে কাজে যোগ দেয়। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগদৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে সে গৃহিণীর কাছে আশ্রয় চায়। গৃহিণী তাকে গোপনে সামান্য অর্থ দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার পরামর্শ দেন। প্যারী আশ্রয় নেয় গ্রামের অপর গণ্যমান্য ব্যক্তি হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে। নায়েব হরিহর মহাশয়কে সরাসরি অভিযোগ করেন তার ঝি ভাগিয়ে আনার জন্য। আর এতে ভট্টাচার্য কিছু অপ্রিয় সত্য কথা নায়েবকে শুনিয়ে দেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নায়েব সেদিন মনে রাগ জমিয়ে ভট্টাচার্যের পায়ের ধুলা নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু দু'চারদিন পরই ভট্টাচার্যের গৃহে পুলিসের আগমন ঘটে। এবং ভট্টাচার্যের গৃহিণীর বালিশের নিচ থেকে নায়েবের স্ত্রীর এক জোড়া ইয়ারিং বের হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিপত্তির জোরে পুলিসি হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলেও প্যারী চোর সাব্যস্ত হয়ে জেলে যায়।

এরপর নায়েব হরিহরের কাছে দাবি করে তার গৃহসংলগ্ন জমি, কেননা ওটা জমিদারের পরগনার ভিটার অন্তর্গত। হরিহর ভট্টাচার্য প্রতিবাদ করায় নায়েব ঐ জমি পরগনার অন্তর্গত বলে নালিশ রুজু করেন। বৃদ্ধ হরিহর আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে যান এবং মুন্সেফ নবগোপালবাবু তাঁর সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করে মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করে দেন।

এদিকে নায়েব আবার আপিল রুজু করেন। উকিলেরা ভট্টাচার্যকে আশ্বাস দেন মকদ্দমায় তার হারার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শেষ ভট্টাচার্য মহাশয় মকদ্দমায় হেরে যান। কারণ উকিল বসন্তবাবুর কাছে তলব করে জানতে পারেন - "সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাঁধিয়া ছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন;"[৮] সেজন্যই তিনি হেরেছেন। আর হাইকোর্টে এর কোনো আপিল নেই জেনে বৃদ্ধ হতাশ হয়ে যান, অন্যদিকে লোকবল সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে গৃহে নায়েবের আবার আগমন ঘটে।

'উলুখড়ের বিপদ' একটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ গল্প। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখড়ের যেমন প্রাণ যায়, এ গল্পের প্রথমাংশে সেই প্রবাদটি সত্য বলে প্রমাণিত। এবং দ্বিতীয়াংশে ক্ষমতাবানের ব্যক্তিগত ঈর্ষায় ন্যায় বিচার যে নিয়ন্ত্রিত তাই প্রকটিত হয়ে উঠেছে। এ গল্পে মাত্র অল্প কিছু চরিত্রের মধ্যে চরম সমাজ বাস্তবতাকে লেখক দ্বিধাহীনভাবে তুলে এনেছেন।

'একটি আষাঢ়ে গল্প' গল্পে তাসের রাজ্য সমুদ্র মধ্যবর্তী বহির্বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জাতি বর্ণে বিভাজিত একটি দ্বীপ। এ দ্বীপের কোনো মানুষকে কখনো কিছু চিন্তা করতে হয় না। শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদিগের দেখানো পথে সকলেই নিজ নিজ কাজ করে, বংশাবলিক্রমে কার কতটুকু মূল্য তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। এখানে কারো কোন আশা-আগ্রহ নেই, হাসি-কান্না নেই, দ্বিধা-সন্দেহ নেই এমনকি নতুন পথে চলার ইচ্ছাও নেই। সমস্ত রাজ্যে কেবল পরিপূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্তব্ধতা ও সামান্য কর্ম সামান্য বিশ্রাম।

অন্যদিকে দূর সমুদ্রের পরপারে নির্বাসিত দুয়ারানী তার পুত্র নিয়ে বাস করতেন। রাজপুত্র পাঠশালে পড়তে যায়, তার পরিচয় হয় সদাগরের পুত্র ও কোটালের পুত্রের সাথে। রাজপুত্র গৃহে মাতার কাছে ও পাঠশালে বন্ধুদের কাছে দেশ-বিদেশের নানা কাহিনি শুনে বড় হয়েছে। অবশেষে পাঠাভ্যাস সাঙ্গ হলে তারা তিন বন্ধু একসঙ্গে দেশ ভ্রমণে বাহির হয়। তারা চার বছরে বিভিন্ন দ্বীপ থেকে শঙ্খ, চন্দন, প্রবাল, গজদন্ত মৃগনাভি-লবঙ্গ, জায়ফল সংগ্রহ করে দেশে ফেরার পথে ঝড়ের মুখে পতিত হয়ে সব নৌকা হারিয়ে তাসের দেশে এসে উপস্থিত হয়। নিরুপদ্রব তাসের রাজ্যে এতদিন কোন ঝামেলা ছিল না তারাই প্রথম গোলমাল বাঁধিয়ে তোলে। সে রাজ্যের মানুষেরা এই তিন যুবকের জাতি, গোত্র ও আহার নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এবং ক্ষুধার্ত যুবকদের আহার-বিহারে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করে তাসের রাজ্যের লোকেরা তাদের নিচু গোত্রের বলে ধরে নেয়। পরবর্তীতে দেখা যায় এই তিন যুবক কোন নিয়ম-কানুনের পরোয়া না করে নিজেদের ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করে। একদিন টেক্কা

সাহেব হাঁড়ির মতো কণ্ঠ করে তিন যুবককে নিয়মের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে জানতে পায় তারা তাদের ইচ্ছেমতো চলতে পছন্দ করে। সেদিন তাসের দেশের লোকেরা 'ইচ্ছা'র মর্ম বুঝতে না পারলেও ক্রমেই অনুমান করতে পারে–বিধিবিধানের মাঝেই মানুষের সকল স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তীতে সেই ইচ্ছার প্রভাবে তাসের রাজ্যের লোকেরা অল্প-অল্প প্রভাবিত হতে থাকে।

একদিন বসন্তের অপরাহ্নে রাজপুত্র সাঙাত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে তার প্রতি তাসের হরতনের বিবির মুগ্ধ নেত্রের কটাক্ষপাত। নির্বিকার মূর্তির মাঝে মানবীর উপস্থিতি তাকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। আর তাই সে সকলকে জানিয়ে দেয় এখন থেকে সেই হরতনের বিবির গোলাম। এরপর থেকে রাজ্যের সবাই কেমন পরিবর্তীত হয়ে যায়। কারো কারো মুখে হিংসা, অনুরাগ হাসি-কান্নার রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজ্যের সকলেই একে-অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করতে শেখে। এর মাঝে রাজপুত্র হরতনের বিবির স্বয়ম্বরা হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করে। সাথে সাথে সমস্ত রাজ্য উৎসবের রাজ্যে পরিণত হয়। দহলা-নহলা, দুরি-তিরি, বাঁশি তূরীভেরী নিয়ে সাহানা বাজাতে থাকে। এবং রাত্রে বিবাহ বাঁশির সংগীতে শত শত দীপের আলোয় মালার সুগন্ধে তাদের বিবাহ সুসম্পূর্ণ হয়। সকলে বরকন্যাকে অভিবাদন জানিয়ে রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যে অভিষেক করে। অবশেষে নবীন রাজার সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ নতুন রাজ্যে দুঃখিনী দুয়ারানী সোনার নৌকায় চড়ে আগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'একটি আষাঢ়ে গল্প' এ গল্পে রূপকথার আদলে জরার বিরুদ্ধে নবীনের বিদ্রোহ ও জয় দেখিয়েছেন। তবে রূপকথার মতো এ গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সামান্যতে ফুরোয়নি বরং ভিন্ন আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুপ্রাচীন কালের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে পুৎলাবাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলোর জড়ত্বের শৃঙ্খল মুক্ত করে নবযৌবনের জয়গান এ গল্পে ধ্বনিত হয়েছে। সমগ্র তাসের রাজ্যে নবীনের প্রতিনিধি রাজপুত্রের 'ইচ্ছে' চঞ্চল উন্মাদনার সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ উন্মোচিত করেছে।

'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' গল্পের প্রথমেই লেখক রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরিশ্রান্ত উল্লেখ করে গল্প বলার কর্ম থেকে ছুটি চেয়েছেন। তিনি কবে থেকে যে গল্প বলার দায়িত্ব নিয়েছেন তা বলা যেমন তাঁর পক্ষে কঠিন তেমনি পাঠকেরা কেন যে তাঁর কাছ থেকে এত বেশি প্রত্যাশা করে সেটি বলাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এবং ক্ষোভের সাথে উচ্চারণ করেছেন পাঠক প্রয়োজন মনে করলে লেখককে সম্মান দেখাতে দ্বিধা করেন না আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে লেখকের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আত্মগৌরব অনুভব করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

কিন্তু তাই বলে পালিয়ে যাওয়াকেও লেখক কর্তব্য বলে মনে করেন না। অদৃষ্ট সবসময় বিবেচনা করে কাউকে কর্মে নিয়োগ করেন না, তবুও আত্মনিষ্ঠার সাথে কর্মসম্পাদন করা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু লেখক মনে করেন অনুগ্রহের-নিগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখলে সবসময় চলে না বরং নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে না পারলে কাজের খ্যাতি থাকে না। তাই পাঠকের বা শ্রোতার যদি কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে তবে লেখক উৎসাহের অপেক্ষায় না থেকে খুবই সংক্ষেপে একটি গল্প শোনাবেন। গল্পটি এই–পৃথিবীর একটি মহানদী ও সেই নদীতীরে এক মহারণ্য ছিল। সেই নদীতীরে ছিল একটি কাদাখোঁচা পাখি এবং মহারণ্যে ছিল একটি কাঠঠোকরা। তারা নির্বিঘ্নে ক্ষুধানিবৃত্ত করে বিচরণ করত। সঙ্গীতবিদ্যা বঞ্চিত পাখি দুটি জীবনধারণের প্রয়োজনের মাঝেই আবদ্ধ। পৃথিবীতে ক্রমেই তাদের খাদ্য উপাদান যখন কমে এল তখন পৃথিবীর প্রতি তাদের অভিযোগের সীমা রইল না। এবং এই দুইপাখি মিলে তাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণ করতে কাদাখোঁচা পৃথিবীর কোমল কাদায় চঞ্চু বিধিয়ে পৃথিবীর জীর্ণতা প্রকাশ করতে ব্যস্ত হল, আর কাঠঠোকরা বৃক্ষের শক্ত শাখায় চঞ্চুর আঘাত করে অরণ্যের রিক্ততা প্রকাশে ব্যাপৃত হল। কিন্তু অন্যদিকে বসন্তের আগমনে পৃথিবীর প্রকৃতির দানে মুগ্ধ হয়ে কোকিল ও শ্যামা নব নব গানে চারদিক ভরিয়ে তুলল।

এ গল্পটিতে সুখের ও দুঃখের বিষয়টিও প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের কথা হলো পৃথিবীর উদারতার বিপরীতে পাখির অকৃতজ্ঞতা আর সুখের কথা হলো হাজার বছরের পুরনো পৃথিবী আজো শ্যামল নবীন রয়েছে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন গল্পটির যথার্থ তাৎপর্য পাঠক বুঝতে পারেনি। কিন্তু এর তাৎপর্য দুরূহ নয়, শুধুমাত্র সময়ের জন্য অপেক্ষা; সময় হলে অর্থাৎ বয়স বাড়লে বোঝা সম্ভব হবে।

লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প’ এ গল্পটিতে পাঠকের উদ্দেশ্যে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গল্পের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বক্তা হয়ে তাঁর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় নিন্দুকদের সমপর্যায়ে নেমে তাদের কটাক্ষ করার অভিপ্রায় লক্ষ করা যায় না। বরং তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আচরণে অর্থাৎ রসের রাজ্যে যারা অপরিপক্ব পরিহাসের মাধ্যমে তাদের কটাক্ষ করেছেন। বিশেষত তাঁর খুব অল্প গল্পেই এ জাতীয় অভিমান মিশ্রিত পরিহাস পরিলক্ষিত হয়। সেই সাথে লেখকের স্বঘোষিত আত্মকথক নিরপেক্ষ হয়ে কর্ম করতে না পারলে কর্মের গৌরব অর্জিত হয় না, আর সেজন্য তিনি উৎসাহের প্রত্যাশিও নন। মূলত রবীন্দ্রনাথ ছুটি চেয়েও কর্মী।

'একরাত্রি' গল্পটির শুরুতেই গল্প কথকের সাথে নায়িকা সুরবালার মায়ের উক্তিতে তাদের বিয়ের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। কিন্তু কথকের অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। তার বাবা ছিলেন জমিদার চৌধুরীদের নায়েব। ছেলেকে তিনি গোমস্তাগিরিতে নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক হলেও, ছেলে চেয়েছিলেন প্রতিবেশী নীলরতনের মতো কলিকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে কালেক্টর সাহেবের নাজির নয় তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হতে। সেই আশায় কথক পনের বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে, কলিকাতায় পালিয়ে যান। সেখানে যথানিয়মে লেখাপড়া চলতে থাকে সেই সাথে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুত ছিলেন। চাঁদা আদায় করা, বিজ্ঞাপন বিলি করা, সভাস্থলে বেঞ্চি সাজানো এমনকি দলপতির পক্ষনিয়ে মারপিট করতেও কার্পণ্য করেননি। নাজির সেরেস্তাদার হতে এসে তিনি মাটসীনি গারিবালডি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এমন সময় কথকের পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হয়ে তাদের বিয়ের উদ্‌যোগী হন। এ দিকে কথক প্রতিজ্ঞা করেছেন আজীবন বিয়ে না করে স্বদেশের সেবা করবেন। অন্যদিকে পিতাকে জানান "বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না। দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।"[৯]

হঠাৎ কথকের পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ায়, ফাস্ট্ আর্টস না দিয়ে চাকুরীর চেষ্টায় ব্যাপৃত হলে বহু কষ্টে নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট শহরে, এনট্রেন্স্ স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার পদে তিনি যুক্ত হন। এবং একসময় জানতে পারেন তার চিরপরিচিত সুরবালা এখানে তার প্রতিবেশিনী। নায়ক সৌজন্যতার খাতিরে সুরবালার স্বামী উকিল বাবুর গৃহে গিয়ে তার সাথে আলাপ করলেও সুরবালার সাথে সাক্ষাৎ করেননি। কিন্তু পাশের ঘর থেকে তার চুড়ির যে টুংটাং শব্দ, শাড়ির খসখস আওয়াজ ভেসে এসেছিল সে সব নায়কের দিবা-রাত্রির সমস্ত কর্মের মধ্যে অবসাদ মিশ্রিত করে দিয়েছিল। "সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল। [···] আমি বলিলাম তা থাক-না, সুরবালা আমার কে? উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।"[১০]

স্কুলের ছুটির পর বিশাল ঘরে তার একা মন টিকত না অথচ কোনো ভদ্রলোক তার খোঁজে এলেও তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। ঘটনাক্রমে মোকদ্দমার কাজে রামলোচনের অনুপস্থিতিতে একদিন প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়।

সেই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুরবালাকে নিয়ে আসে কথকের কাছে। বৈপরীত্যময় অনুভূতির দোলায় দোদুল্যমান কথক চেয়েছেন সুরবালা স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাক; আর এই একটি মাত্র রাত তার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

'একরাত্রি' গল্পটিতে মানব হৃদয়ের ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার উন্মোচিত হয়েছে। নায়ক প্রথম জীবনে যাকে উপেক্ষা করেছিলেন সেই পরস্ত্রী সুরবালাকেই পরবর্তী জীবনে না পাওয়ার ব্যর্থতায় বেদনার্ত হয়েছেন। গল্পে নায়িকার ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে গৌণ হলেও প্রচ্ছন্নভাবে তিনিই গল্পের সমস্ত বিষাদময়তার মূল কারণ। কথক যে সভাসমিতিকে প্রাধান্য দিয়ে সুরবালাকে এড়িয়েছিলেন সেই কর্মক্ষেত্রে যখন নিরাশ হয়েছেন তখন ব্যর্থ প্রেম তাকে দুঃসহ বিদ্রূপে আঘাত হেনেছে। পরিশেষে দেশনেতাদের ফাঁপাবুলী নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করার জন্য নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়েছেন।

'কঙ্কাল' গল্পটি অতি প্রাকৃত গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। গল্পে কঙ্কালরূপী নায়িকা বাল্যবিধবা। বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে। তারপর ধীরে ধীরে কৈশোর পেড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করে এই অপরূপা মেয়েটি ছিল নিঃসঙ্গ। কেননা তার দাদা পণ করেছিলেন কখনো বিয়ে করবেন না। মেয়েটির দাদার বন্ধু ছিল ডাক্তার শশি শেখর। এক বাদলার দিনে মেয়েটির অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে ডাক্তারের আগমন হয় বাড়িতে, তার চিকিৎসা উপলক্ষে। এবং সেদিনের পর থেকে তারা একে অপরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের জীবনের মধুর রাগিণীর তাল কাটা পড়ে অল্পদিনের মধ্যেই। যখন মেয়েটি জানতে পারে যে ডাক্তার পণের টাকার লোভে অন্য আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। মেয়েটি ডাক্তারের এই লোভী আচরণকে ক্ষমা করতে পারেনি। তাই সে বিয়ের যাত্রার পূর্বেই ডাক্তারকে বিষপান করিয়ে হত্যা করে এবং নিজেও বিষপানে আত্মাহুতি দেয়।

দৈনন্দিন জীবনে মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা থাকে যাকে সম্ভব বলে স্বীকার করা যায় না আবার অসম্ভব বলে একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। এ রকম কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অতিপ্রাকৃত গল্প। 'কঙ্কাল' গল্পটি অতিপ্রাকৃত গল্প। গল্পটিতে একটু ভৌতিক শিহরণ আছে। সুকৌশল ঘটনা সন্নিবেশে আখ্যানভাগে জীবিতের সাথে মৃতের সংঘর্ষের ট্র্যাজেডি রূপায়িত হয়েছে। সেই ছেলেবেলায় যে কঙ্কাল লেখক অস্থিবিদ্যা শিখেছেন অনেকদিন পর সেই অস্থিবিদ্যা শেখার ঘরটিতে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে গিয়ে, লেখকের মনে হয়েছে; এ কঙ্কালটি যার ছিল সে একজন যুবতী এবং এখনো সে মরেনি। জীবদ্দশায় যে প্রকৃতি ও পরিবেশে সে চলাফেরা করেছে, হৃদয়ে যে প্রেম বিরহবোধ সে লালন করেছে তার সব কিছুই যেন তেমনি অটুট আছে। তার মধ্যে

কোথাও কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি, ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। সে রাতের নির্জনতায় লেখকের মশারির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তাকে শোনায় ফেলে আসা জীবনের মধুর ও বেদনামিশ্রিত গল্প।

'করুণা' গল্পে ধনবানবৃদ্ধব্যক্তি অনূপকুমারের একমাত্র রূপসী কন্যা করুণা। ছেলেবেলা থেকে গাছ-ফুল, পশু-পাখি, ঐশ্বর্য ও অগাধ স্বাধীনতায় একাকী লালিত হওয়ায় স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ তার ছিল না।

করুণার ছেলেবেলায়, অপর এক অনাথ ব্রাহ্মণ পুত্র নরেন্দ্র অনূপের আশ্রয় গ্রহণ করায় সেই হয় করুণার সফল খেলার সাথী। ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের গাম্ভীর্য স্বভাবের দরুন সে সকলের কাছে প্রিয়পাত্র ছিল। যদিও নরেন্দ্র কলকাতা পড়াশোনার নিমিত্তে এসে সঙ্গদোষে বখে যায় তথাপি সে বিষয়টি গোপনই থাকে। এবং অনূপ মৃত্যুর পর করুণাকে এড়িয়ে পরনারীর সম্পর্ক থেকে শুরু করে হেন কুকর্ম নেই যার সাথে সে লিপ্ত না হয়। ধীরে ধীরে গ্রামে প্রতিবেশী সকলের কাছে নরেন্দ্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়। গ্রামবাসীরা তাকে জাতিচ্যুত করলে নরেন্দ্রর তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। সে কাউকে পরোয়া করত না। উল্টো করুণাকে সন্দেহ করে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এবং ঘটনাচক্রে সে নরেন্দ্রের বন্ধু কবি স্বরূপের হাতে পড়ে।

গল্পের অপর অংশে রয়েছে রজনী নামে আরেক দুঃখিনি কন্যার কাহিনি। সে দেখতে খুব সুশ্রী না হওয়ায় শুধুমাত্র টাকার লোভে তার শ্বশুর তাকে পুত্রবধূ করে নেন। ফলে যা হয় পুত্র মহেন্দ্র স্ত্রীকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এবং কলেজ ছেড়ে ধীরে ধীরে পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হতে থাকে। স্ত্রী রজনীকে সে ফেলে প্রতিবেশিনী বিধবা মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তীতে অনুতপ্তচিত্তে মহেন্দ্র সকল কিছু ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আশ্রয় নেয় লাহোরে সেখানে সে ডাক্তারি শুরু করে এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে এক সময় ফিরে আসে। ফেরার পথে স্বরূপ কর্তৃক পরিত্যক্ত করুণাকে কাশী স্টেশনে থেকে সঙ্গে নিয়ে এসে নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়।

নিজের সন্তান মৃত্যুর পর দাসী ভবি ও পণ্ডিত মহাশয় ছাড়া করুণার আর কেউ পরিচিত ছিল না। গ্রামে ফিরে ভবির খোঁজ না জানায় ও পণ্ডিত মহাশয় কাশী থাকায় করুণা ও রজনী মহেন্দ্রের আশ্রয়েই থাকে। এবং এক সময় মহেন্দ্রের কাছে করুণা আকুতি জানায় নরেন্দ্রের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন সব হারিয়ে পাওনাদার ও পুলিশের ভয়ে নরেন্দ্র ছিল তার এক রক্ষিতার আশ্রয়ে। মহেন্দ্র তাই একটি নতুন বাড়ি ভাড়া করে নরেন্দ্রকে সেখানে এনে তবে করুণাকে সে গৃহে পৌঁছে দেয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞ নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে পূর্বের ন্যায় করুণাকে রেখে স্ফূর্তিতে মেতে ওঠে। এদিকে করুণা ধীরে ধীরে ক্ষীণ দুর্বল হতে থাকে। কাশীতে

মোহিনীর কাছে পণ্ডিত মহাশয় খবর পেয়ে করুণাকে দেখতে এসে, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র ও নির্জীব করুণাকে দেখতে পান।

অবশেষে একদিন করুণার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। রজনী ও মহেন্দ্র আসে, মহেন্দ্র তার চিকিৎসা করতে থাকেন , পণ্ডিত মহাশয় শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। নরেন্দ নেই সে তার কুকর্মে ব্যস্ত, যখন বাড়িতে আসে তখন সে সজ্ঞানে নেই। সকলে তাকে করুণার কাছে নিয়ে যায়। করুণা কোনো কথা বলতে পারে না কেবল কম্পিত হাতে নরেন্দ্রের হাত ধরে মাত্র।

উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা 'করুণা' 'গল্পগুচ্ছে'-এর অন্তর্ভুক্ত বেশ বড় আকারের একটি গল্প। সাতাশটি পরিচ্ছেদে ছেচল্লিশটি পৃষ্ঠা জুড়ে প্রসারিত কাহিনি নিয়ে এ গল্প রচিত। বেশ কিছু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, যার মধ্যে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় । গল্পে বিদ্রূপ ও হাস্যপরিহাসের যোগান দেয়ার চেষ্টাও আছে। নরেন্দ্রের কাছে নারী মুক্তির বিষয়টির উত্থাপন ও রঘুনাথ পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিয়ের বিষয়টি সে পরিচয়ই বহন করে। স্বামী পরিত্যক্তা করুণা ও রজনীকে গল্পের শুরু থেকেই পাঠকের সহানুভূতি লাভের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল, পরবর্তীতে রজনীকে লেখক তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু নায়িকা করুণাকেই পাঠকের করুণা লাভের উপযোগী করে রেখেছেন। যাই হোক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করে বলা যায় 'করুণা' দোষে-গুণে মিশ্র একটি গল্প।

'কর্ম্মফল' গল্পের মূল চরিত্র বিধুমুখী ও মন্মথের একমাত্র পুত্র সতীশ। নীতিবান মন্মথ পুত্র সতীশকে তার আদর্শে মানুষ করতে চেয়েছেন। কিন্তু মা ও নিঃসন্তান মাসিমা সুকুমারী প্রশ্রয়ে বাবার দেখানো পথে না গিয়ে বিলাসপ্রবণ হয়ে ওঠে সতীশ। ফল যা হওয়ার তাই হয় বাবার আয়ের দিকে না তাকিয়ে তার মেসোর পকেটকে অবলম্বন ভেবে সে অতি ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

ধনী ভাদুড়ি সাহেবের কন্যা নলিনীর সাথে সম্পর্ক থাকায় সতীশের ব্যয়ের অতি পোক্ত একটি পথ দিনে দিনে প্রশস্ত হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ছেলের ধার শুধতে তার মায়ের হাতে বালা জোড়া ছাড়া সবই যায়। এবং দেনার দায়ে সতীশের জেলে যাওয়ার উপক্রম হলে মেসো শশধর তাকে সে যাত্রায় রক্ষা করেন। তবে সতীশকে বাবা মন্মথ ত্যাগ করেন। এবং হঠাৎ করে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালের নামে উইল করে কেবল সতীশের মায়ের জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত পঁচাত্তর টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করে যান।

বিধুমুখী চরম বিপদের সময়ে সুকুমারী জীবনে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, তিনি বেশি বয়সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সতীশকে সুকুমারী একসময় পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেও নিজ পুত্র হরেনের উপস্থিতিতে তিনি আর সতীশকে পূর্বের ন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। মেসোর দিক থেকে কোনো আঘাত না এলেও প্রতিনিয়ত মাসির তিক্তবাক্যে সে জর্জড়িত হতে থাকে। তাই মাসির খোটার মুখে তার ঋণ শোধকল্পের সতীশ 'গানি'র টাকাটা পাওয়ার আশায় অফিসের তহবিল ভাঙে। কিন্তু বড়ো সাহেবের তহবিল পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অস্থির চিত্তে শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

অবশেষে শশধর সবকিছু অবগত হওয়ার পর সতীশকে আত্মহননের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং বড়ো সাহেবের সাথে কথা বলে সমস্ত কিছু মীমাংসা করেন।

'কর্ম্মফল' গল্পটিতে নাটকের চেহারা ফুটে উঠেছে। নাটকের মতো অংক-দৃশ্যের ঘনঘটা না থাকলেও প্রবেশ প্রস্থানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এবং পাত্র পাত্রীর সংলাপ তারা নিজেরাই উপস্থাপন করেছেন লেখককে ব্যাখ্যা করার দরকার হয়নি। সমস্ত গল্পটিতে শিল্পমানের সূচারু রূপটি উপেক্ষিত হয়েছে যা বলা হয়েছে তা উচ্চকণ্ঠে, মোটাদাগে। কোনো আবরণের আভাস নেই। সাধারণত রবীন্দ্রনাথের লেখা বরাবর যেমনটি হয়ে থাকে অর্থাৎ উঁচুদরের মনস্তত্ব, এই গল্পটি সেই পর্যায়ে যেতে পারে নি। খুবই সহজ ভাষায় নৈতিকতার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পের নায়ক অশিক্ষিত রহমত সুদূর কাবুল থেকে বাংলায় এসেছে জীবন জীবিকার সন্ধানে। সে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়ায় কিন্তু তার মন পড়ে থাকে মরু কাবুলের এক পর্ণ-কুটিরে। যেখানে সে ফেলে এসেছে তার নয়নের মণি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাকে। রহমতের বাৎসল্য স্নেহের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় লেখকের পঞ্চম বর্ষিয়া কন্যা মিনির সাথে সম্পর্ক-সূত্রে। তার কর্মব্যস্ত নিঃসঙ্গ জীবনে অতি চঞ্চল মিনি এক আনন্দের ঝর্ণাধারা। আফগানিস্তানে তার ফেলে আসা মেয়েটিকে সে আবিষ্কার করে মিনির ভেতর। শ্রেণীবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য পিতা রহমতের অপত্য বোধ ও বাৎসল্য প্রীতিতে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। অপত্য বোধের কারণে মিনিকে কাবুলিওয়ালা পেস্তা, আঙুর, কিসমিস ইত্যাদি দিয়ে তার শিশু মনকে ভরে দেয়। লেখক একদিন মিনির হাতে বাদাম কিসমিস দেখে কাবুলিওয়ালাকে ওসব দিতে নিষেধ করেন এবং তার মূল্যস্বরূপ একটি আধুলি কাবুলিওয়ালার হাতে দেন। কাবুলিওয়ালা এতে মনে মনে আহত হলেও অসংকোচে আধুলিটি গ্রহণ করে পরবর্তীতে মিনির হাতে তা ফেরৎ দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিনির মা পরিবারে গোলযোগ তৈরি করেন।

তিনি কাবুলিওয়ালার আচরণে শংকিত হন, তার ধারণা কাবুলিওয়ালা অসৎ মতলবের লোক হতে পারে কিন্তু লেখক এই অসম বয়সী বন্ধুত্বকে উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন।

একদিন দেনা-পাওনার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার বশে রহমত তার এক দেনাদারকে ছুরির আঘাত করে জেলে যায়। এবং আট বছর জেল থেকে ফিরে লেখকের বাড়িতে এসে সে মিনির সাথে দেখা করতে চায়। সেদিন মিনির বিয়ে তাই লেখক অনিচ্ছা প্রকাশ করলে রহমত ক্ষুণ্ন মনে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে। নিজের জামার বুক পকেট থেকে বের করে একটি মলিন কাগজ। যার ভেতরে ছিল তার নিজ কন্যার হাতে ভুষা মাখানো একটি পাঞ্জার ছাপ। কাগজটি যেন রহমতের বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে এত দিন ধরে সুধাসঞ্চার করে রেখেছে। এ ঘটনার পর লেখক ভেতরে নারীমহলের শত আপত্তির পরও মিনিকে নিয়ে আসেন কাবুলিওয়ালার সামনে। যদিও তাদের পুরোনো আলাপ তেমনটা জমে না। মিনিকে দেখে রহমত বুঝতে পারে তার কন্যাটিও এইরূপ বড় হয়েছে, তার সঙ্গেও আবার নতুন করে আলাপ করে নিতে হবে। লেখক রহমতের পিতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা স্পষ্ট বুঝতে পেরে বিয়ের খরচ থেকে কিছুটা অর্থ সাশ্রয় করে সেই টাকাটা রহমতকে দিয়ে তাকে নিজের সন্তানের কাছে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি বাৎসল্য রসের মহিমায় উদ্ভাসিত। গল্পে ব্যক্তি রহমতের পিতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও বেদনা সকল পিতার বেদনায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের হৃদয়ের যেখানে ভালোবাসার সৃষ্টি সেখানে শিক্ষাসংস্কার কোনো পার্থক্য তৈরি করতে পারে না, তাই লেখক তার সাথে রহমতের কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি। সবদেশে সবকালে পিতৃহৃদয়ের বাৎসল্যের প্রকাশ অভিন্ন প্রকৃতির, তা সে নগর কলিকাতার বিশাল অট্টালিকারই হোক অথবা আফগানিস্তানের পর্ণকুটিরেরই হোক, সর্বত্রই পিতার হৃদয়ে সন্তানের জন্য একই রকম স্নেহ ও ভালোবাসা প্রবহমান। এই সত্যই বিধৃত হয়েছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে।

'খাতা' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র বালিকা উমা। সাত বছরের 'বালিকা' উমা লেখা শেখার পর থেকে বাড়ি যত্রতত্র প্রমাণ দিতে থাকে। বউঠাকুরাণীর গল্পের বই, বাবার হিসাবের খাতা দাদার খবরের কাগজ কোনো কিছু তার কাঁচা অক্ষরের হাত থেকে রেহায় পায় না।

এদিকে সারগর্ভবিহীন রচনার রচয়িতা উমার দাদা গোবিন্দলাল উমাকে তার লেখা নষ্ট করার জন্য শাস্তি স্বরূপ উমার লেখার উপকরণ কেড়ে নেন। পরবর্তীতে অনুতপ্ত চিত্তে উমার সকল উপকরণ ফিরিয়ে দেয়ার সময় সাথে একটি নতুন খাতা উপহার দেন। বছর দুয়ের মধ্যে খাতাটিতে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া স্বাধীন রচনা স্থান পেতে থাকে।

নয় বছর বয়সে উমার প্যারীমোহনের সাথে বিয়ে হয়। প্যারীমোহন গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক, সেই সাথে পুরাতন ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষক। তাই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। উমা বিয়ের পূর্বে দাসী যশোদার কোলে উঠে খাতাটি নিয়ে বিদ্যালয়ে যেত বলে বিয়ের পর যশোদা সেই খাতাটি উমার স্বামীর গৃহ পর্যন্ত নিজ গরজেই নিয়ে আসে। শ্বশুরবাড়ি আসার পর উমা তেমন কিছু লেখা হয়নি। ঝি যশোদা বাড়ি ফিরে গেলে নিঃসঙ্গ উমা সেই খাতা বের করে যশির মতো বাড়ি যাওয়ার বাসনার কথা খাতায় লিপিবদ্ধ করে। উমাকে তার পিতা গৃহে আমার চেষ্টা করলেও প্যারীমোহনের সাথে দাদা গোবিন্দ তাতে বাঁধা প্রদান করেছে। লোকমুখে সে কথা জানতে পেরে আবার খাতায় দাদার কাছে মার্জনা চেয়ে বাড়ি যাওয়ার বাসনার কথা খাতায় লিখে রাখে।

একদিন দরজা বন্ধ করে সে খাতায় লিখছিল তা তার তিন ননদীরা একে একে দেখে ফেলে এবং এ কথা উমার স্বামীর কানে পৌঁছায়। প্যারীমোহন ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এবং সন্ধ্যায় স্ত্রীকে ভর্ৎসনার সাথে উপহাসও করেন। লজ্জায় বহুদিন উমা আর লেখার সাহস করেনি। অনেকদিন পর এক গায়িকা ভিখারিণীর মুখে গান শুনে তাকে ডেকে এনে খাতায় গানটি তুলে নেয়ার অপরাধে তার খাতা গিয়ে পরে স্বামী প্যারীমোহনের হাতে। তার এতদিনের সঞ্চিত কথামালা সেদিন সকলের সামনে অনাবৃত হওয়ায় এবং তাদের সম্মিলিত উপহাস তাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেয়। সেদিন হতেই উমা আর খাতাটি হাতে পায়নি। কিন্তু প্যারীমোহনের শুকনোতাত্ত্বিক প্রবন্ধেপূর্ণ খাতাটি অক্ষত ছিল এবং তা নষ্ট করার কোনো মানবহিতৈষী ছিল না।

'খাতা' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র বালিকা উমা। 'খাতা' গল্পটিতে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার রূপ চিত্রায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে খুব সুচারুভাবে রক্ষণশীল সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন লেখকদেরকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করে জয়গান করেছেন অপটু সরলপ্রাণা রচয়িতা উমার। উমাকে স্বামীর গৃহে পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু সে মর্মান্তিক আহত হয়েছে স্বামীর গৃহে যখন স্নেহ মধুর স্বাধীনতার আস্বাদ খাতাটিকে তার স্বামী ও ননদীরা উপহাস করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর দেখানো পথে পাঠকদের ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়েছে তত্ত্ববাগীশ গোবিন্দলাল ও প্যারীমোহনের জন্য, আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে উমা ও তার খাতা। মূলত এর ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মমুক্তির বিষয়টি উচ্চকিত করেছেন।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে কায়স্থ বাবুদের একবছরের শিশুপুত্র অনুকূলকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহে বার বছরের কিশোর কায়স্থ রাইচরণের আবির্ভাব ঘটে। ক্রমেই সেই শিশু অনুকূল রাইচরণের কক্ষ ছেড়ে স্কুল সেখান থেকে কলেজ অবশেষে কলেজ ছেড়ে মুন্সেফিতে প্রবেশ করে কিন্তু তখনো তার ভৃত্য রাইচরণ। মাঝে অনুকূলের বিবাহের কারণে অনুকূলের উপর তার অধিকার যেমন কিছুটা হাত বদল হয়েছিল তেমনি অনুকূলের পুত্র সন্তানের দ্বারা তা আবার পূর্ণও হয়েছে। খোকাবাবুকে রাইচরণ অধিক স্নেহ করত। অতি বাৎসল্যের কারণে

রাইচরণের অন্ধ বিশ্বাস জন্মেছিল এই শিশু বড় হয়ে জজ হবে। এমনকি সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে গিন্নিমাকে জানিয়েছিল জজ হয়ে সে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে। পরবর্তীতে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জেলায় বদলি হন। সাথে ছিল রাইচরণ। অনুকূল তার শিশুর জন্য কলিকাতা থেকে ঠেলাগাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। রাইচরণ খোকাবাবুকে সাটিনের জামা জরির টুপি হাতে পায়ে সোনার অলংকার পরিয়ে নিয়ম করে গাড়িতে বসিয়ে দু' বেলা হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেত।

এদিকে বর্ষার মৌসুমে পদ্মা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র কোনো কিছুই পদ্মার গ্রাস থেকে বাদ যায় না। এমনি সময়ে রোজকার মতো খোকাবাবুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয় রাইচরণ। খোকার আবদারে কদমফুল পারতে যাওয়ার সময় বার বার নিষেধ করে যায় খোকাকে জলের ধারে না যেতে। কিন্তু ফুল নিয়ে ফিরে এসে দেখে খোকাবাবু গাড়িতে নেই। বহু ডাকাডাকি করেও রাইচরণ দুষ্টুমি ভরা কোনো শিশুকণ্ঠ শুনতে পায় না কেবল পদ্মার ছলছল খলখল করে ছুটে চলার শব্দ ছাড়া। অবশেষে ঘরে ফিরে রাইচরণ গিন্নির পায়ে যেয়ে পড়ে যতবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ততবারই সে জবাবে সে জানে না। শেষে গিন্নি তাকে সন্দেহ করে এবং অর্থের বিনিময়ে তার সন্তানকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করে। এবং শেষে কিছুতেই যখন খোকাকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তখন গিন্নি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

রাইচরণ তার নিজ গ্রামে যশোহরে ফিরে যায়। বহুকাল তার কোনো সন্তানাদি হয়নি, কিন্তু দৈবক্রমে তার স্ত্রী সে বছর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যায়। এই শিশুকে রাইচরণ স্নেহ করতে পারত না তার কেবলই মনে হতো প্রভু-পুত্রকে জলে ভাসিয়ে নিজে পুত্র সুখভোগ করা মহাপাতকের পরিচয়। তার বিধবা বোন এই সন্তানটির লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং নাম রেখেছিল ফেলনা।

রাইচরণের সংস্কারপ্রবণ মন তাকে জানায় তার হারিয়ে যাওয়া মনিবপুত্র তার মায়া কাটাতে না পেরে আবার তার ঘরে এসেছে। তখন থেকে রাইচরণ তার ভার গ্রহণ করে তাকে সাটিনের জামা জরির টুপি পরিয়ে গায়ের আর দশটা শিশু থেকে পৃথক করে তোলে। তারপর ফেলনার বিদ্যাভ্যাসের বয়স হলে রাইচরণ তার জমিজমা সব বিক্রি করে তাকে নিয়ে কলিকাতায় চলে আসে। এমনি করে বারোটি বছর কেটে যায়। ফেলনা তার বাবাকে ঠিক বাবার মতো ভাবতে পারত না। তার সংগত কারণ রাইচরণ স্নেহে পিতা হলেও সেবায় ছিল ভৃত্যের মতো। আর সে যে ফেলনার পিতা এ কথা সে সবার কাছে গোপন রেখেছিল। অবশেষে একদিন রাইচরণ কলিকাতার কাজে ইস্তফা দিয়ে বারাসতে ফেলনাকে নিয়ে চলে আসে। গিন্নি মাকে জানায় এই ছেলেই তার হারিয়ে যাওয়া খোকাবাবু। ফেলনার বেশভূষায় আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ না থাকায় গিন্নিমা বিনা বাক্যে মেনে নেয় এটিই তার হারানো পুত্র। কিন্তু অনুকূল প্রমাণ ছাড়া মানতে নারাজ হলেও শেষে মেনে নেয়। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক রাইচরণকে সে তার গৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃতি জানায়। রাইচরণ প্রভুর পায়ে পড়ে অনুনয় করে সমস্ত

কিছুর জন্য ঈশ্বর আর অদৃষ্টের দোহাই দিলে অনুকূল আরো ক্ষেপে ওঠে। অবশেষে পুত্র ফেলনা এই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় খুঁজে বের করে। তাকে গৃহে আশ্রয় না দিয়ে তার বাড়ির ঠিকানায় মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করার পরামর্শ দেয়। রাইচরণের সামনে তার পুত্র তার মনিবকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করায় তাকে সত্যি সত্যি ভৃত্য ভাবায় রাইচরণ কোনো কথা বলে না, শুধু পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করে সবাইকে প্রণাম করে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মাঝে হারিয়ে যায়। মাস শেষে অনুকূলের পাঠানো বৃত্তি ফেরত আসে সেখানে কোনো লোক না থাকায়।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটিতে বাৎসল্যপ্রীতির আতিশয্য লক্ষণীয়। সেইসাথে উপস্থাপিত হয়েছে ধর্মভীরু ভৃত্যের পুনর্জীবনের প্রতি আস্থা। গল্পে মূলত তিনটি খোকার আগমন ঘটেছে। প্রথমত, বাবুদের শিশুপুত্র অনুকূলবাবু; দ্বিতীয়ত, অনুকূলের পুত্র খোকাবাবু; তৃতীয়ত, রাইচরণের পুত্র ফেলনা। তবে গল্পে অনুকূলের পুত্র খোকাবাবুকে নিয়েই রাইচরণের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিজের সামান্য ভুলে সেই খোকাবাবুর মৃত্যু রাইচরণকে অনমনীয় করে রেখেছিল নিজের সন্তান ফেলনার প্রতি। পরবর্তীতে রাইচরণের যুক্তিহীন মন তাকে ভাবতে শিখিয়েছে তার হারানো খোকাবাবু তার মায়া ছাড়তে না পেরে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে তার ঘরে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় রাইচরণ তখন প্রভুর গৃহে শিশুকে ফিরিয়ে দেয়নি, বরং তার স্নেহ বুভুক্ষু হৃদয়য়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে বারটি বছর আগলে রেখে তারপর প্রভুর স্ত্রীর কাছে সমর্পণ করেছে ফেলনাকে। কিন্তু আশার সে অলীক স্বপ্নে বিভোর থেকে নিজের পিতৃপরিচয় গোপন করে নিজ পুত্রকে প্রভুর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল তার সেই স্বপ্ন বিশ্বাস কল্পনাপ্রবণ হৃদয় সেই মুহূর্তেই বাস্তবতার কষাঘাতে জর্জড়িত হয়েছে, প্রভুর নির্দয় ব্যবহার এবং নিজ পুত্রের কিঞ্চিৎ সহৃদয়তায়। তাই আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন রাইচরণ প্রভুর মাসিক কিছু অর্থের পরোয়া না করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

'গুপ্তধন' গল্পে শুরতেই গল্পের মূল চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় ব্যস্ত। পূজা শেষে তার তিন পুরুষের অতি যত্নে রক্ষিত একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সের তালা খুলে সে মাথায় কড়াঘাত করতে থাকেন। তার এই চরম বিপদে হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে এবং তিনি মৃত্যুঞ্জয়কে তার হারানো জিনিসের জন্য দুঃখ না করার উপদেশ দেন। মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে অন্তর্যামী জ্ঞান করে তার পা জড়িয়ে ধরেন, এবং হারানো জিনিসের সন্ধান চান। কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে কিছু না জানিয়ে বরং তার উদ্দেশ্য হাসিল করে সরে যান।

বহু বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু তখন তাদের গৃহে এমনই এক সন্ন্যাসী আগমন ঘটেছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে ধরে নিজ বংশের উন্নতি সাধন কল্পে আশীর্বাদ স্বরূপ একটি গুপ্তধনের নকশা অঙ্কিত তুলট কাগজ পেয়েছিলেন। হরিহর যদিও ছোট ভাই শংকরের কাছে সেই তুলট কাগজের বিষয়টি লুকিয়ে

ছিলেন, তথাপি শংকর সেই নকশার কাগজের সন্ধান করে কাগজের আরেকটি অবিকল অনুলিপি বানিয়ে গৃহ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এদিকে বহু বছর গত হয়, হরিহরের মৃত্যুর পর সেই কাগজের মালিক হন তার পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে সেই নকশার মালিক হন শ্যামাপদর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয় প্রতি অমাবস্যার রাত্রে পূজা সম্পন্ন করে সব সময় এই নকশা উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। কিন্তু হঠাৎ তার নকশা অঙ্কিত কাগজটি হারিয়ে যায়। আর তারপরই সেই এক জটাজুটধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান।

বস্তুত এই সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ হরিহরে ছোট ভাই শংকর। তিনি বহু বছর এই ধনের আশায় বহু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে গিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত স্বরূপানন্দ স্বামীর সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন ক্ষুদ্র লোভের মোহ থেকে মুক্ত হলেই 'বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ' আপনি এসে ধরা দেবে।

পরবর্তীতে স্বরূপানন্দের সঙ্গচ্যুত হয়ে বহুকাল এখানে সেখানে ঘুরে শংকর ধারাগোল গ্রামের বনের আশ্রয় নেন। এবং এক ভাঙা মন্দিরের ভিতে দেখতে পান নানা জায়গায় বহু চিহ্ন অঙ্কিত যা সন্ন্যাসীর পূর্ব পরিচিত। তার বাসনা আবার জেগে উঠে। তাই তিনি পৈতৃক ভিটায় ফেরত যান সেই নকশার সন্ধানে এবং তা হস্তগতও করেন।

শুরু করেন এক নতুন করে পর্যালোচনা। (এরই মাঝে) অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় তাকে অনুসরণ করে ধারাগোল বনে আশ্রয় নেন। এবং সন্ন্যাসী বহু চেষ্টার পর যখন গুপ্ত সুরঙ্গের সন্ধান পান সেখানে মৃত্যুঞ্জয়ও হাজির হন। সন্ন্যাসী তাকে স্বর্ণখনির ভেতরে রেখে সুরঙ্গের লোহার মুখ বন্ধ করে দেন এবং লুকিয়ে যান। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে খুশিতে আত্মহারা হলেও ক্রমান্বয়ে যতই সময় অতিবাহিত হতে থাকে ততই অন্ধকার স্বর্ণখনির স্বর্ণের পরিবর্তে শ্যামলা ধরিত্রীর জন্য তার হৃদয় লালায়িত হতে থাকে। তার শুধুমাত্র মনে হতে আমি আর কিছুই চাই না–শুধু এই সুরঙ্গ থেকে, অন্ধকার থেকে, গোলকধাঁধা থেকে, এই সোনার গারদ থেকে বাহির হতে চাই। সে আলো চায়, আকাশ চায়, মুক্তি চায়।"

সন্ন্যাসী তাকে এই স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়ে অধিক মূল্যবান রত্নভাণ্ডার দেখাতে চাইলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তা দেখতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সন্ন্যাসী তাকে হাত ধরে গভীর কূপের কাছে নিয়ে আসেন। এবং কাগজের নকশাটি সন্ন্যাসী তাকে দেয়া মাত্র সে তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কূপের মাঝে নিক্ষেপ করেন।

'গুপ্তধন' গল্পটিতে নীতিশিক্ষার বিষয়টি উচ্চকিত হয়েছে। গল্পে তিনটি প্রজন্মের কথা আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। ধনের প্রতি অতি লোভ সংসারী মানুষের জন্য যে ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে সেই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক নিজেস্ব অভিমত গল্পে সন্ন্যাসীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন। গল্পের মূল চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় ধনের মোহে সংসার-আত্মীয়-পরিজন সকলকে ছেড়ে এক সময় যখন ভূগর্ভে অবরুদ্ধ হয় তখনই তাকে লালায়িত হতে দেখা যায়

শ্যামল ধরিত্রীর সামান্য স্পর্শের জন্য। স্বাভাবিক জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শিখেছেন। জড় স্বর্ণখণ্ডের সত্তা অপেক্ষা জৈবিক সত্তার মূল্য যে অনেক বেশি তা মৃত্যুঞ্জয় পাতালে অবরুদ্ধ হয়ে অনুভব করেছেন। একদিকে অভাবনীয় লোভের হাতছানি যেমন তাকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল অন্যদিকে সংসার জীবনে মহিমা তাকে আবার অধীর করেছে। আর তাই শেষ পর্যন্ত পরাজয় হয়েছে তার লোভের, পেয়েছে সে মুক্তি।

'ঘাটের কথা' গল্পটিতে ঘাটকে কথক করে পূর্বের স্মৃতি লাবণ্যময় ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। ঘাটের এই স্মৃতিচারণায় নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন হলেও যার কথা প্রধানত ঘাট বলতে চেয়েছে সে গল্পের নায়িকা কুসুম। কুসুম বাল্যবিবাহের বলী আবার সেই সাথে অকাল বৈধব্যেরও। যখন সে বিধবা হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে তখন তার বয়স মাত্র আট। বিবাহিত জীবনে বিদেশে চাকুরীরত স্বামীর সাথে কুসুমের দু'একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরবর্তীকালে চিঠির মাধ্যমে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সধবার সমস্ত সাজ-পোশাক ত্যাগ করে কুসুম ফিরে আসে তার চির-চেনা পিতৃ-গৃহে। শুরু হয় তার নিরানন্দ জীবন যাপন। ক্রমান্বয়ে দশটি বছর কেটে যায়। মলিন বসন করুণ মুখ নিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে পূর্ণ হয়ে ওঠে কুসুম।

ঘটনাচক্রে ভাদ্র মাসের শেষাশেষি কুসুমদের গ্রামে এক নবীন সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে এবং সন্ন্যাসী ঘাটের নিকটস্থ শিবমন্দিরে আশ্রয় নেন। সন্ন্যাসীর আগমনের খবর গ্রামে প্রচার হওয়ায় নারী-পুরুষের ভিড় জমে শিবমন্দিরে। কেউ উপদেশ নিতে, কেউ ভগবদগীতার ব্যাখ্যা শুনতে আবার কেউবা শাস্ত্র শুনতে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হতে থাকে। কয়েক মাস পর চৈত্র মাসের সূর্য গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসীকে একনজর দেখার জন্য গ্রামে দূর-দূরান্ত থেকে লোক সমাগম হয়। এমনকি কুসুমের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম থেকে একদল মেয়ে বউরা এসেছিল। তাদের সাথে একজন সন্ন্যাসীকে দেখে সরাসরি জানিয়েছিল যে, সন্ন্যাসী তাদের কুসুমের স্বামী। অপর আরেকজনের কাছে পুরোপুরি মনে হয়েছে এই সন্ন্যাসী তাদের চাটুজ্জেদের বাড়ির ছোট দাদাবাবু। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ মন্তব্যগুলোকে সমর্থন করেছিল আবার কেউ কেউ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল। তবে চেনা অচেনার বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হয়েছিল।

গ্রামের সবাই নবীন সন্ন্যাসীর দর্শনে এলেও কুসুম কখনো সন্ন্যাসীকে দেখতে মন্দিরে আসেনি, বরং অতিরিক্ত লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম ঘাটে আসা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিল। অবশেষে গ্রামে সব কোলাহল সাঙ্গ হলে কুসুম এক পূর্ণিমার তিথিতে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঘাটে এসে বসেছিল। সন্ন্যাসী মন্দির থেকে বের হয়ে ঘাটে একাকিনী রমণীকে বসে থাকতে দেখে ফিরে যাবে ভাবছিল এমন সময় কুসুম হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাতেই তার ঘোমটা খুলে পড়ে যায় আর তখনই সন্ন্যাসীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সেই মুহূর্তে তাদের উভয়েরই মনে হয়েছিল তাদের পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল। পেঁচকের ডাকে কুসুম আত্মসংবরণ করে মাথায় কাপড় দিয়ে সন্ন্যাসীকে

প্রণাম করলে সন্ন্যাসী তার নাম জানতে চান। এবং নাম শোনার পর উভয়ের মধ্যে আর কোনো কথা হয় না। সে রাত্রে কুসুম চলে যাওয়ার পর সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ঘাটে বসেছিলেন। অবশেষে পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়লে তার পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে এলে তখন উঠে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। এর পর থেকে কুসুম মন্দির ও সন্ন্যাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। কিন্তু ক্রমেই মানসিক দুর্বলতার কারণে কুসুম নিষ্ঠার সাথে দেব-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারছিল না। তাই সে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীই তাকে ডেকে পাঠায়, এবং দেব- সেবায় তার আলস্যের কারণ তলব করেন। কুসুম জানায় সে পাপীয়সী এবং এর কারণ যে সন্ন্যাসী নিজে তা জানার পর সে কুসুমকে কঠিন শর্তে আবদ্ধ করে গ্রাম ত্যাগ করেন। তাই তখন কুসুম সন্ন্যাসীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে তার বাল্যের খেলার সাথী গঙ্গার জলেই শেষ আশ্রয় নেয়।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘাটের কথা' গল্পটিতে কঠিন পাষাণে তৈরি গঙ্গার ঘাটকে গল্পবক্তা করে তুলেছেন। শ্রোতার উদ্দেশে ঘাটের যে স্মৃতিকথন তাতে বাহুল্যতা নেই, একটি প্রসঙ্গ থেকে আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে বটে তবে তা বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। যেন গল্পের মাঝেই গল্পের জন্ম। গঙ্গার ঘাটের স্মৃতিকথার যে অংশটুকুতে নায়িকা কুসুমের উপস্থিতি সে অংশটুকুই মর্মান্তিক। মূলত এই বেদনাঘন কাহিনি শোনানোর অভিপ্রায়েই ঘাটের এই স্মৃতিচারণা। আট বছর বয়সেই বাল্যবিধবার অভিশপ্ত জীবন নিয়েও কুসুম ধীরে ধীরে প্রকৃতির আশীর্বাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশেষে নিজ গ্রামে দশ বছর পর আগত তরুণ সন্ন্যাসীর সেবা করতে গিয়ে দেব সেবায় তার ফাঁকি নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। অখণ্ড ভক্তির সাথে কুসুম দেব-সেবায় সম্পৃক্ত হলেও নিজেকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি বলেই সে সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হতে পারছিল না। অন্যদিকে সন্ন্যাসীও কুসুমকে দেখার জন্য ব্যগ্র ছিল। কেননা দেব-সেবায় আলস্যের প্রসঙ্গ তুলে কুসুমকে ডেকে পাঠিয়ে তার কৈফিয়ত চেয়েছেন। কুসুমের সমস্যার কথা জেনেছেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হিসেবে যথার্থ পদক্ষেপ নেননি। কুসুমের প্রেম ছিল তার অস্তিত্ব, যে প্রেমকে ভোলা ছিল তার কাছে মৃত্যুর শামিল। তাই প্রতিদানহীন প্রেমকে কুসুম আত্মহননের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'চিত্রকর' গল্পে প্রধান নারী চরিত্র মুকুন্দলালের স্ত্রী সত্যবতী। মুকুন্দ পেশায় ছিলেন আইনজীবী। আর সত্যবতী স্বভাবে ছিলেন শিল্পমনা। মাটি, ময়দা, কাপড়, কাগজ, ফুলের বোঁটা, ফলের রস হেন কোনো অদরকারী জিনিস ছিল না যা দিয়ে তিনি কিছু না কিছু তৈরি করতেন। সত্যবতীর অনাবশ্যক এই কাজকে তার স্বামী স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন। এবং আদালত থেকে ফেরার পথে রং, রঙিন রেশম ইত্যাদি নিয়ে এসে স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে তার ঘরে রেখে তার খেয়ালের কাজে সাহায্যে করতেন। কিন্তু সত্যবতীর কপালে এ সুখ বেশিদিন সয়নি। মুকুন্দলাল মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার সম্পত্তির পাশাপাশি তিনি কিছু ঋণ ও রেখে গিয়েছিলেন, সেইসাথে

তার স্ত্রী ও চার বছরের পুত্র চুনিলালের দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন ছোট ভাই গোবিন্দলালের উপর। গোবিন্দলাল ছিলেন অরসিক মানুষ তিনি শিল্পের মূল্য দিতে জানতেন না। তার কাছে প্রধান জিনিস ছিল পয়সা। আর এই কথাটি গোবিন্দ তাদের প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তার প্রতিদিনের কাজে কর্মে এমনকি ছোট ছোট ব্যবহারে নানা ভাবে কোনো প্রকার আব্রু ছাড়া তা প্রকাশ করেছেন। সত্যবতী গোবিন্দর এই নীচ আচরণে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হলেও মেনে নেয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল না।

স্বামী মুকুন্দ বেঁচে থাকতে সত্যবতীর কাজের যে সরঞ্জাম তিনি না চাইতেই পেয়েছেন আজ তার ঘাটতি হওয়ায় সংসারের ব্যয়ের ফর্দে তা যোগ না করে বরং নিজের খাবারের খরচ বাঁচিয়ে তা কিনিয়ে আনতেন। চুনির উপর গোবিন্দর শাসন যত বাড়তে লাগল সত্যবতীও ছেলেকে আরো বেশি করে অপ্রয়োজনের কাছে সহায়তা করতে লাগলেন। তাই মা ও ছেলের শিল্পচর্চা চলত গোপনে দরজা বন্ধ করে। কিন্তু শিশু চুনি গোপন কাজ আর গোপন রাখতে পারেনি। তার আঁকা চিত্র খাতার পাতা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল দেয়ালে, রঙের দাগ লাগিয়ে রাখত সে জামায় ও শরীরে। এজন্য খুড়োর কাছে তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল।

মাঝে গোবিন্দ আফিসের কাজে বাড়িতে না থাকায় মা ও ছেলের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। এমনি একদিনে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড় তার এক ভাগনে রঙ্গলাল বাড়িতে বেড়াতে আসেন। নামজাদা চিত্রশিল্পি ছিলেন সত্যবতীর এই ভাগনে। সেই রঙ্গলালের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে মাও ছেলের কিছু সৃষ্টিকর্ম। তিনি চুনির কিছু ছবি দেখে অবাক হয়ে সবগুলো দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে জানতে পান সে সব বিলুপ্ত হয়েছে। তাই যাবার বেলায় মামিকে মাথার দিব্যি দিয়ে যান এরপর থেকে তাদের সব ছবি যেন অক্ষত থাকে তিনি এসে নিয়ে যাবেন। একাদশীর দিন সত্যবতী ঠাকুর ঘরে বসে থাকতেন। আর চুনি সেদিন আঁকছিল নৌকো-ভাসানোর ছবি। দরজা খোলা থাকায় হঠাৎ গোবিন্দের আগমন ঘটে। ব্যাপার লক্ষ করে গোবিন্দ গর্জে ওঠেন, ঠাকুর ঘর থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সত্যবতী দেখলেন চুনি মেঝেতে লুটোচ্ছে সেই সাথে লুটোচ্ছে তার আঁকা ছবির ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো। এতদিন সত্যবতী নীরব থাকলেও সেদিন তিনি গোবিন্দর কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তিনি চুনিকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন। আর তাই পরের দিনই সত্যবতী চুনিকে অর্থের সাধনা থেকে বাঁচতে সমর্পণ করলেন রঙ্গলালের হাতে।

‘চিত্রকর’ গল্পটিতে শিল্পসাধনায় উদ্বেলিত দুটি সুকুমার চিত্তের পরিচয় বিধৃত। ছোট আকারের গল্পটিতে খুব বেশি চরিত্রের আনাগোনা দেখানো হয়নি। মূলত এ গল্পের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক মানসিকতার পরিচয় প্রস্ফুটিত। গল্পের একপ্রান্তে সংকীর্ণমনা গোবিন্দলাল আর অন্যপ্রান্তে শিল্পমনা মা ও ছেলে। সংসারে যা কিছু অপ্রয়োজনীয় অদরকারী তা লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে বলেই তাতে লুকিয়ে থাকে নিখাঁদ আনন্দ। আর এ আনন্দে বিভোর ছিলেন সত্যবতী ও চুনিলাল। কিন্তু বাস্তব সংসারে যে হৃদয়টি সবচেয়ে সুকুমার সেটিই সবচেয়ে

অরক্ষিত। এ কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে পিতার অবর্তমানে মা ও ছেলের ক্ষেত্রে। সত্যবতী যেমন করেই বাঁচুন না কেন তার ভয় ছিল ছেলেকে নিয়ে। তাই অর্থপিপাসু খুড়ো গোবিন্দর কাছ থেকে ছেলেকে বাঁচাতে মরিয়া সুবিবেচক সত্যবতী ছেলেকে তুলে দিয়েছেন ভাগনে রঙ্গলালের হাতে।

'চোরাই ধন' গল্পটি একটি স্নিগ্ধ প্রেমের গল্প। নায়িকা সুনেত্রার স্বামী গল্পের প্রধান চরিত্র যদিও নাম অনুল্লিখিত। তার ইচ্ছে ছিল ফরেস্ট বিভাগে কোথাও যোগ দেয়ার কিন্তু পৈত্রিক সূত্রে তিনি হয়েছিলেন নামজাদা ব্যাংকের অংশীদার। তাই খোলা হাওয়ায় দৌড়-ঝাঁপ করার বদলে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগেছিলেন অফিসের কাজে।

কলেজ জীবনে নায়ক ছিলেন সুনেত্রার বাবা অধ্যাপক অজিতকুমারের প্রিয় ছাত্র। কন্যাকে শিক্ষা দিতেন অধ্যাপক নিজে তাই সুনেত্রার সাথে মেশার বহু সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে দেব-দেবীর প্রতি বিমুখ অধ্যাপক গ্রহ-নক্ষত্রের কড়া পাহাড়ার কথা তুলে তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। বাপের আদর্শে কন্যাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি চিরকাল কুমারী থেকে বিদ্যার সাধনা করবেন। কিন্তু সুনেত্রার মা বিভাবতী একদিন নায়কের হাতে সুনেত্রার ঠিকুজি তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দুঃখ সইতে পারব না।"[১১] এরপর চলে গিয়েছে একুশটি বছর। সুনেত্রা বা তার বাবা নকল ঠিকুজির কথা কেউ জানতেও পারেননি। কিন্তু এতদিন পর সুনেত্রা যখন নিজের কন্যা অরুণা ও শৈলেনের জন্মগ্রহে অমিলের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন তখন নায়ক নিজের সেই মিথ্যা ঠিকুজির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন।

জ্যোতিষবিদ্যা, কোষ্ঠিগণনা ইত্যাদি নিয়ে যে নানান মতবাদ সমাজে প্রচলিত আছে তার বিরুদ্ধে লেখকের অস্বীকৃতিই গল্পের মূল সুর। অরুণা ও শৈলেনের প্রেমের ক্ষেত্রে অরুণাার মা সুনেত্রার আপত্তি দিয়েই গল্পের সূত্রপাত। কিন্তু দীর্ঘ একুশ বছর পর স্বামীর মুখ থেকে তার জাল ঠিকুজির ঘটনা শুনে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সংসার জীবনে মানব-মানবীর মনের মিলনটাই বড় কথা গ্রহ-নক্ষেত্রের অমিল নয়।

ছোটোগল্প 'শেষকথা' গল্পটি নায়কের জবানিতে ছোট নাগপুরের অরণ্যের গল্প। নায়ক নবীণমাধব সেনগুপ্ত এই স্টেটে জিয়লজিকাল সার্ভের কাজ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এখানেই পরিচয় হয় অধ্যাপক অনিলকুমার সরকার ও তাঁর নাতনি অচিরার সাথে। যদিও অচিরা নামটি নায়কের দেয়া।

একদিন নবীন তার বাংলোঘরের পথে যেতে দুই টুকরায় ছিন্ন করা একখানা চিঠির খাম পেয়েছিলেন, খামের উপরে লেখা ছিল ভবতোষ মজুমদার আই.সি.এস. ছাপরার ঠিকানা। সেই ছিন্ন খামের সূত্র ধরে নবীন

জেনেছিলেন এই ভবতোষ অচিরার প্রাক্তন প্রেমিক। যার সাথে বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু অপেক্ষা ছিল বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে আসার। এমনকি ভবতোষের সমস্ত খরচ জুগিয়েছিলেন অচিরার দাদু। কিন্তু বিলেত-ফেরত ভবতোষ বিয়ে করেন ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের উচ্চপদস্থ একজন মুরুব্বির কন্যাকে। সেই থেকে লজ্জা ঢাকতে এই অরণ্যের নির্জনে দাদু-নাতনির আগমন। তারপর নবীনমাধবের সাথে অচিরার পরিচয়, এক পর্যায়ে অচিরা নবীনের কাছে স্বীকার করেছেন–ভবতোষকে সে আর ভালোবাসেন না তবে ভবতোষ আর তার প্রথম ভালোবাসা এক নয়। ক্রমান্বয়ে অচিরা নবীনের প্রতিও দুর্বল হয়ে পড়েন কিন্তু সে দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে নবীনকে বিদায় জানিয়ে দাদুকে নিয়ে লোকালয়ে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূর্ত প্রতীক অচিরা। প্রথম প্রেমে প্রতারিত মর্মাহত অচিরা দাদুর সাথে লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন অরণ্যে। সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে আড়াল করেছেন ঠিকই কিন্তু অচিরা পালাতে পারেননি নিজের কাছ থেকে। ভবতোষকে চিঠিও লিখেছিলেন, পোস্ট করা হয়নি, হয়তো তার মনে হয়েছে, যে মানুষটি তার ব্যক্তিসত্তাকে মূল্যায়ন করেনি তার সাথে আর নয়। তবে অচিরা নবীনকেও সহজভাবে নিতে পারেননি। যদিও সে নবীনের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অচিরা ভবতোষকে শ্রদ্ধা করেন না, তার কাছে ফিরেও যেতে পারেন না। এমনকি তার কাছে ভবতোষ আর সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা এক নয়। মূলত অচিরা ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতায় উদ্ভাসিত। কেননা অচিরা অরণ্যের এই মোহ থেকে মুক্ত হয়ে লোকালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নারীর মনুষ্যত্বের জয়গান করেছেন।

ইতিহাসের কল্পনার আশ্রয়ে রচিত ‘জয়পরাজয়’ গল্পটি। রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার নাম অপরাজিতা। রাজার সভাকবি শেখর কখনো তাকে দেখেননি। কিন্তু কোনো নতুন কাব্য রচনা করলে তিনি সভায় রাজাকে শোনানোর ছলে গৃহের উপরিতলে নারীগণকে শোনানোর লোভ সংবরণ করতে পারতেন না।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরীর সাথে কবির মাঝে মাঝে আলাপ হতো। তাই নিয়ে লোকে কানাকানি করত, হাসাহাসি করত তাতে কবির বা দাসীর কোনো ক্ষোভ ছিল না।

কবি কাব্য রচনা করতেন, চিরন্তন নর কৃষ্ণ চিরন্তন নারী রাধাকে নিয়ে গান রচনা করতেন। সেই কাব্য ও গান অমরাপুরে রাজা থেকে প্রজা সকলের মুখে মুখেই ফিরত। কবির খ্যাতি ছিল রাজ্যের সর্বত্র।

মাঝে হঠাৎ একদিন দাক্ষিণাত্য থেকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীকের আগমন ঘটে অমরাপুর রাজ্যে। শুরু হয় কবিতে পণ্ডিতে অসম দ্বন্দ্ব। রাজ সভাগৃহে উপস্থিত পণ্ডিত, সভাসদ ও সভাসুদ্ধ সমস্ত লোকের সামনে পর পর

তিনবার পাণ্ডিত্যাভিমানী পুণ্ডরীক সৌকুমার্য শেখরকে বাক্যবাণে আক্রমণ করে কবিকে অসহায় ও নিরুত্তর করে ফেলেন। রাজার চোখের ইঙ্গিত ও কবি শেখর যখন কোনো বাণী উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকেন তখন রাজা তার উপর রুষ্ট হয়ে জয়ের মালা পণ্ডিত পুণ্ডরীকের গলায় পরিয়ে দেন।

পরিশেষে লজ্জিত কবি তার সকল সৃষ্টিকর্ম অগ্নিতে নিক্ষেপ করে বিষপান করলে মরণাহত কবিকে অপরাজিতা স্বহস্তরচিত জয়মাল্য পরিয়ে দিয়ে জানান রাজা তার প্রতি সুবিচার করেননি। জয়ী তিনিই। অবশেষে কবি প্রাণপণে নিজেকে ধরে রাখতে চেয়েও শয্যার উপর লুটিয়ে পড়েন।

'জয়পরাজয়' গল্পটি নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত না হলেও ইতিহাসের আমেজ পুরো মাত্রায় রয়েছে। কাব্যের মাধুর্য যে পাণ্ডিত্যের বর্বরতায় পিষ্ট সে চিত্রই লেখক এ গল্পে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। রাজা উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর ও দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত পুণ্ডরীকের বাক্যযুদ্ধ শেষে সাধারণ জনমণ্ডলীর উন্মত্ততায় রাজা পুণ্ডরীককে জয়ের মালা পরিয়ে দেওয়ায় মূলত কবিত্বেরই অপমৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু রাজকন্যা অপরাজিতা অভিমানী মরণাহত কবিকে নিরাশ করেননি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত দেবীর হাত থেকে চরম পুরস্কার লাভ করেছেন কবি শেখর।

'জীবিত ও মৃত' গল্পের মূল চরিত্র রানীহাটের জমিদার গৃহের বধূ কাদম্বিনী। তার পিতৃকুলে কেউ ছিল না এমনকি প্রতিকূলেও নিজের বলতে কেউ ছিল না। কাদম্বিনী ছিলেন বিধবা নিঃসন্তান। তার ভাশুর শারদাশংকরের ছোট পুত্রটি জন্মের পর বড় জা গুরুতর অসুস্থ থাকায় কাদম্বিনী সে পুত্রটিকে মায়ের দ্বিগুণ স্নেহ দিয়েই নিজের শূন্যতাকে পূরণ করতেন।

কিন্তু কাদম্বিনীর হঠাৎ এক শ্রাবণের রাত্রে মৃত্যু হয়। জমিদার শারদাশংকর পুলিশি হাঙ্গামা এড়াতে তার অধিনস্থ চারজন ব্রাহ্মণকে মৃতদেহ তাড়াতাড়ি দাহ করার নির্দেশ দেন। কাদম্বিনীর হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে মারা যাননি। তাই কাদম্বিনীর জ্ঞান ফেরার পরই ভয়ে দাহকার্য সম্পাদনের জন্য আসা ব্রাহ্মণগণ পালিয়ে যান। একাকী কাদম্বিনীর প্রথমেই শ্মশানের চিরনির্জনতা ও চিরান্ধকার হতে বাড়ি ফেরার কথা মনে হয় কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় "আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীব রাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি- আমি যে আমার প্রেতাত্মা। [···] আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি–আমি অতি ভীষণ অকল্যাণকারিণী,"[১২]

এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে কাদম্বিনী আশ্রয় নেন বাল্যসখী যোগমায়ার গৃহে। যোগমায়া প্রথমে তাকে সহজভাবে বরণ করে নিলেও ক্রমান্বয়ে কাদম্বিনীর অসঙ্গত কথা ও অস্বাভাবিক আচরণে বিরক্ত হন। এবং স্বামী

শ্রীপতিকে প্রেরণ করেন কাদম্বিনীর শ্বশুর গৃহের খোঁজ নেয়ার জন্য। শ্রীপতি ফিরে এসে যোগমায়াকে কাদম্বিনীর মৃত্যুর খবর জানালে সেই কথা কাদম্বিনী শুনতে পান এবং সেই রাত্রেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো যোগমায়াকে তার নিজের বেঁচে না থাকার খবর জানিয়ে, ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও স্থান না হওয়ায় এখন কোথায় স্থান হবে এমন মর্মঘাতী প্রশ্ন উত্থাপন করে যোগমায়ার সংসার ত্যাগ করেন।

কাদম্বিনী ফিরে আসেন রাণীহাটে। সারাদিন অনাহারে থেকে। মন্দিরে গা ঢাকা দিয়ে রাত্রে সে জমিদার বাড়ির দ্বারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অন্দরে খোকার ঘরে প্রবেশ করেন। গিন্নি বিধবা ননদের সাথে খেলায় ব্যস্ত থাকায় দাসী অসুস্থ সতীশের জন্য খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে কাদম্বিনীকে দেখতে পেয়ে অশুভ কিছু ভেবে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। একে একে গিন্নি ননদ শারদাশংকর ঘটনা জানতে পারেন। শারদাশংকর পুত্রের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে প্রেতাত্মারূপী কাদম্বিনীর কাছে জোড়হাতে মিনতি করেন সংসার হতে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে। এমনকি তার যথার্থ সৎকার করা হবে বলে জানান। কাদম্বিনী আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে সে যে জীবিত তা জানান এবং প্রমাণস্বরূপ মাটিতে পড়ে থাকা কাঁসার বাটি দিয়ে নিজের কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন। এই ঘটনায় শারদাশংকর মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে যান, খোকা ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। কাদম্বিনী হৃদয় বিদারক হাহাকারে সে যে জীবিত এই কথাটি জানাতে জানাতে ঘর থেকে বেড়িয়ে অন্তঃপুরের পুকুরে ঝাঁপ দেন। কাদম্বিনী আত্মহননের মাধ্যমে প্রমাণ করেন তিনি জীবিত ছিলেন।

এক বিধবা নিঃসঙ্গ নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পটির মূল উপজীব্য বিষয়। স্বামী পুত্রহীনা কাদম্বিনীর মানসিক স্তরের যে পরিবর্তন লেখক ঘটিয়েছেন অর্থাৎ জীবিতের মাঝে যে মৃতের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। শ্মশানের ভয়ংকর নির্জনতা থেকে কাদম্বিনী ছেলেবেলার সই যোগমায়ার গৃহে উপস্থিত হওয়ায় সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করলেও তিনি নিজেকে মৃত ভাবতেন। নিজেই নিজেকে ভয় করতেন, তিনি নিজের কাছ থেকে নিজে কিছুতেই পালাতে পারেননি। কিন্তু সই এর সংসারে অবস্থান করে আপন সত্তার গভীর পরিচয় অনুভবের পর কাদম্বিনী ফিরে আসেন নিজ গৃহে। যেখানে সবাই তাকে মৃত বলে জানে সেখানে তিনি দাবি করেন তিনি জীবিত। কাদম্বিনীর পিতৃকুলে কেউ ছিল না, তাই নিঃসন্তান বিধবার ভাশুরপোর প্রতি দুর্বলতা, তাকে আবার সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু ভালোবাসার বদলে সকলের- ভয় অবিশ্বাস তাকে সত্যি সত্যি দ্বিতীয় বারের মতো সংসার থেকে শেকড় উৎপাটনে প্ররোচিত করে।

‘ঠাকুরদা’ গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। গল্পের প্রধান ব্যক্তি কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী নয়নজোড়ের বিখ্যাত জমিদার বংশের শেষ প্রতিনিধি। শোনা যায় নয়নজোড়ের জমিদাররা বিড়াল

শাবকের বিয়েতে লক্ষ টাকা খরচ করতেন, তবে কৈলাসচন্দ্র নির্বাপিত জমিদার। কেননা তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তাদের অবস্থা মন্দের দিকে। এমনকি কৈলাসচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর পর নয়নজোড়ের জমিদারদের বাবুয়ানা কয়েকটি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে নিঃশেষিত হয়। ঋণের দায়ে সমস্ত বিষয়-আশয় বিক্রি হওয়ায় ও সামান্য অবশিষ্ট অংশে পূর্বপুরুষের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ায় কৈলাসচন্দ্র তাই তাঁর পুত্রকে নিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। সেই পুত্রও তার একটি কন্যাকে রেখে পরলোকগমন করেন। কৈলাসচন্দ্রের নাতনি কুসুম ও পুরাতন ভৃত্য গণেশকে নিয়েই তাঁর সংসার কলিকাতায় তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে অতিশয় বিনয়ী ও শিষ্টাচারী বলে পরিচিত ছিলেন। কেবলমাত্র গল্পের নায়ক অর্থাৎ গল্প কথক তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। কেননা কৈলাসচন্দ্রের পূর্বপুরুষের গৌবরময় ইতিহাস থেকে গল্প কথকের ইতিহাসটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নায়কের বাবা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু প্রাপ্ত হননি তিনি নিজের চেষ্টায় অর্থোপার্জন করেছিলেন। এমনকি পোশাক আশাকে তার কোন বাবুয়ানা ছিল না, এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য বাবু উপাধি লাভের কোনো চেষ্টাও ছিল না। আর সেজন্য নায়ক তার বাবার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ফাঁকা বাবুয়ানার ইতিহাসের চেয়ে লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈত্রিক কোম্পানীর কাগজ অনেক বেশি মূল্যবান। আর এ কারণেই কৈলাসবাবুর দম্ভ সে সহ্য করতে পারতেন না। তার কেবলই মনে হত তার বাবা ব্যবসা করে নিজে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন বলে বোধহয় কৈলাসবাবু তাদের বড় মানুষ মনে করেন না। কিন্তু এটি ছিল তার মনগড়া ধারণা। কারণ দেখা যেত কৈলাসবাবুর নিরীহ ভালোমানুষী স্বভাবের জন্য নায়ক ছাড়া আর কেউ তাঁর উপর রাগ করতে পারতেন না। পাড়ার সকলে তাঁকে ঠাকুরদা বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর কথাবার্তাতে সবর্দা সায় দিয়ে চলতেন। ঠাকুরদা সব সময় আচারে ও পোশাকে পরিপাটী থাকতে পছন্দ করতেন অনেক সময় ভৃত্যের অভাব নিজের কাজ নিজে করতেন। কালের আবর্তে কৈলাসবাবুর জমিদারি না থাকলেও তিনি দারিদ্র্যের হাত থেকে অনেক কষ্টে সে আমলের কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষণ করেছিলেন। নানা উপলক্ষে সেই সোনার রেকাবি রূপার আলবোলা জনসম্মুখে উপস্থিত করে পূর্বের গৌরব রক্ষা করতেন। তাঁর অহংকারে ঘা দেয়ার জন্য পাড়ার কেউ তাঁকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল নায়ক। একবার নায়ক ঠাকুরদার মিথ্যা অহংকারকে ধূলিস্যাৎ করার জন্য নিজ বন্ধুকে ছোটলাট সাজিয়ে এনে তাঁর পূর্বপুরুষের স্মৃতিবহনকারী গোলাপপাশ সহ যাবতীয় বহুমূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়ে যান। ঠাকুরদাও এ ব্যাপারটিকে ছোটলাটের প্রথা জ্ঞান করেন। এই ঘটনায় ঠাকুরদাকে যথোচিত জব্দ করার আনন্দে নায়ক যখন উচ্ছ্বসিত তখন খেয়াল করেন ঠাকুরদার নাতনি দাদুর চরম অপমানে ব্যথিত হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। আর সম্মুখে নায়ককে দেখতে পেয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে ওঠে। মুহূর্তেই নায়কের সকল কৌতুক বালিকার অশ্রুসজল চোখের সামনে নিষ্ঠুরতার রূপ নেয়। আত্মগ্লানিতে পীড়িত নায়ক উপলব্ধি করতে পারেন সবচেয়ে নরম জায়গায় সবচেয়ে শক্ত আঘাতটি তিনি করেছেন। তাই প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পরের দিন ঠাকুরদার সকল জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে

ঠাকুরদার কাছে তার নাতনিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। ঠাকুরদাও তাঁর পূর্বপুরষদের প্রতি কর্তব্য হিসেবে সকল অহংকার ভুলে নায়ককে সাদরে গ্রহণ করে নেন।

'ঠাকুরদা' গল্পটিতে জমিদার শ্রেণীর পতন ও নব্য বণিক শ্রেণীর উত্থানের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নয়নজোড়ের বিখ্যাত রায়চৌধুরী বংশের উত্তরাধিকারী কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী গল্পের মূল চরিত্র। লেখক তাঁকে নির্বাপিত জমিদার বলেছেন, সেই সাথে তিনি কলিকাতার নির্বাসিত। এই বিনয়ী ব্যক্তিটির কল্পনা ও বাস্তব উভয় জগতেই বিচরণ ছিল অবাধে। একদিকে ভৃত্যের অভাবে (ভৃত্যাভাবে) নিজের কাজ যেমন নিজে করতেন অন্যদিকে তেমনি নানা প্রসঙ্গে পূর্বপুরুষদের গৌরবময় স্মৃতি মন্থন করে অহংকার করতে ছাড়তেন না। অনেকটা যেন পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্যবোধেই মিথ্যাকে সত্য জেনে তাকে আশ্রয় করে সত্যের বাস্তবতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ভালোবাসতেন। আর বণিক শ্রেণীর প্রতিভূ অর্থাৎ গল্পের নায়ক বৃদ্ধের প্রতি ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে সেই মুহূর্তেই আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত হয়েছেন। এমনকি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন বৃদ্ধের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে।

'ডিটেক্‌টিভ' গল্পটি ছন্দহীন পারিবারিক জীবনের চিত্র। গল্প কথক মহিমচন্দ্র ছিলেন পুলিশের একজন ডিটেক্‌টিভ কর্মচারী। তার জীবনের দুটি মাত্র লক্ষ্য বলে তিনি দাবী করতেন। প্রথমটি স্ত্রী, দ্বিতীয়টি ব্যবসা। যদিও তিনি দ্বিতীয়টিকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। মহিমচন্দ্র পুলিশ বিভাগে মোটামুটিভাবে প্রবেশ করে পরবর্তীতে নিজ দক্ষতায় ডিটেক্‌টিভ পদে জায়গা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কাজে তিনি সুখ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কারণ তার দেশের অপরাধীগুলোকে তিনি ভীরু কাপুরুষ মনে করতেন আবার অপরাধগুলোও হতো সরল। এর মাঝে কোনো দুরূহতা, দুর্গমতা না থাকায় তিনি ডিটেক্‌টিভের কাজে কোনো সুখ বা গৌরব অর্জন করতে পারছিলেন না। তিনি বহু পথিককে সন্দেহ, অনুসরণ করে শেষে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন তারা নির্ভেজাল ভালো মানুষ। অবশেষে একদিন মহিমচন্দ্র তারই গৃহের সামনের রাস্তায় এক তরুণকে দেখে সন্দেহ করতে শুরু করেন। নাম তার মন্মথ। মহিমচন্দ্র এমন একজনের উপর নজর রাখতে থাকেন যে কিনা উল্টো তারই উপর গোয়েন্দাগিরি করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। মন্মথ তার পূর্ব প্রেমিকা মহিমের স্ত্রীকে নিজ গৃহে ডেকে এনে তার স্বামীর চারিত্রিক দিকটি উল্লেখ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। অপরদিকে সেই সময়ই মহিমচন্দ্র কৌশলে অন্যকে জব্দ করতে গিয়ে স্ত্রীর সামনে নিজেই জব্দ হয়েছেন।

'ডিটেক্‌টিভ' গল্পটিতে বৈচিত্র্যহীন জীবনে রহস্যের অন্বেষণ করার পাশাপাশি বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রতিও কটাক্ষ লক্ষ করা যায়। মহিমচন্দ্র ছিলেন পুলিশের ডিটেক্‌টিভ কর্মচারী। অসাধু ব্যক্তিকে খুঁজে বের করাই ছিল তার কাজ। তাই নিরীহ ভালোমানুষকে তিনি অপরাধীচক্রের সদস্য বলে সন্দেহ করে বারবার নিরাশ হয়েছেন। এভাবেই মূলত নানা ভুল-ভ্রান্তি ও সন্দেহের উপর নির্ভর করে গল্প এগিয়েছে। অন্যের মনের ঘরে সিঁধকাটিতে মহিমচন্দ্র এতটাই মগ্ন ছিলেন যে নিজের ঘরের এত বড় একটি চুরি তার দৃষ্টি এড়িয়েছে।

'তপস্বিনী' গল্পটি হাস্যরসের গল্প। নায়ক বরদাকে নিয়ে গল্পের শুরু হলেও প্রধান চরিত্র বরদার স্ত্রী ষোড়শী। গল্পে নব বিবাহিত দম্পতির মাঝে বিপত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নায়কের পিতা মাখনবাবু। পুত্রের প্রতি তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষায় কৃতকার্যতা তারপর সংসারধর্ম। আর সেই অভিপ্রায়ে তিনি বখে যাওয়া অমনোযোগী পুত্রের জন্য বছর বছর নামজাদা সব শিক্ষক নিয়োগ করেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে পুত্রের সৌখিনতার অংশ তার যে ঘোড়ার গাড়িটি ছিল তা বিক্রি করে দেন। স্কুলে হেঁটে যাওয়ার অপমান সইতে না পেরে বরদা পড়াশোনার হাত থেকে বাঁচার আশায় অবশেষে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণে মনস্থির করে একটি চিরকুট লিখে গৃহত্যাগ করেন।

বরদার এই নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় সে সকলের হাসি-তামাশার পাত্র হলেও কেবল তার স্ত্রী সেই দলে যোগ দেয়নি। বরং তাকে বিশ্বাস করেছে। সময় ক্রমেই যখন দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর গড়িয়ে যেতে লাগল তখন সকলেই বরদার ভুল-ত্রুটিগুলো ঘুচিয়ে তার প্রশংসায় উৎসাহী হতে লাগলেন। এমনকি কঠিন হৃদয়ের পিতা মাখনবাবু নিজের প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নে পুত্রবধূর সন্ন্যাসী সেবার ইচ্ছায় তিনি বাড়িতে অতিথিশালা খুললেন–সেই অতিথিশালায় ক্রমাগত ভণ্ড সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হতে লাগল। যদিও মাখনবাবু বিষয় বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে এই ভণ্ড সন্ন্যাসীদের আহার ও আরামের সামান্য ত্রুটি হলে পায়ে ধরে তাদের কাছে মার্জনা চাইতেন। এটাই ছিল তার বড় প্রায়শ্চিত্ত। এভাবে বছরের পর বছর ষোড়শী ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী, গুরু, যোগীদের নিয়ে এতটাই আত্মবঞ্চনায় ডুবে ছিল যে শ্বশুরের তহবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন মনে করেনি। এমতাবস্থায় বাধ্যহয়ে মাখনবাবু পুত্রবধূর কাছে শূন্য ভাণ্ডারের কথা ব্যক্ত করলে ষোড়শী হাসিমুখে সংসারের দৈন্যকে স্বামীর আশীর্বাদ হিসেবে জ্ঞান করেছে। অবশেষে ষোড়শীর সাথে বৃথালোচনা না করে বৃদ্ধ মাখনবাবু যখন একাকী তামাককে সঙ্গী করে চিন্তায় ব্যাপৃত তখন তার বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। এবং একটি যুবক তার ঘরে ঢুকে তাকে অসম্পূর্ণভাবে নমস্কারের চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যে যুবকটির কথা শুনে তিনি ধাতস্থ হয়ে বুঝতে পারেন বার বছর পর তার পুত্র বরদা আমেরিকা থেকে কাপড়-কাচা কলের এজেন্ট হয়ে তার কাছে কল বিক্রির অভিপ্রায়ে এসেছে।

'তপস্বিনী' গল্পটিতে মূলত ষোড়শীর ট্র্যাজেডির অন্তরালে কৌতুক মিশ্রিত হয়েছে। নববিবাহিত বরদার শিক্ষা অর্জনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গল্পে জটিলতার সূত্রপাত হলেও গল্পে মূল চরিত্র বরদার স্ত্রী ষোড়শী। লেখাপড়ার ভয়ে নিরুদ্দেশ মিথ্যা চিঠিকে সত্য ভেবে সে ভণ্ড যোগী-গুরু-সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে আত্মছলনায় নিমজ্জিত হয়েছে। লেখক পতিপ্রাণা ষোড়শীর কঠোর তপস্যার সুচারু ব্যঙ্গ করেছেন আমেরিকা থেকে কাপড়-কাচা কলের এজেন্ট হিসেবে বরদার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে।

তারাপ্রসন্নের কীর্তি গল্পের মূল চরিত্র তারাপ্রসন্ন । সামাজিকতায় ছিলেন তিনি অপটু, এছাড়া লৌকিকতার ধরাবাঁধা বুলিও তিনি আওড়াতে পারতেন না প্রতিবেশি বা পরিচিত কারো কোনো কথার পরিপ্রেক্ষিতে। অথচ গৃহে তার এই স্বভাবের উল্টোটি পরিলক্ষিত হয়, তার স্ত্রী দাক্ষায়ণী তার সাথে কথায় পেরে উঠতেন না। কিন্তু দাক্ষায়ণীর অগাধ বিশ্বাস ছিল লেখক স্বামীর যোগ্যতার উপর। একে একে চারটি কন্যা সন্তানের পিতা হওয়ার পর তারাপ্রসন্ন কন্যাদের সম্প্রদায়ের চিন্তায় চিন্তিত হলে তিনি স্বামীকে পরামর্শ দেন কলিকাতায় গিয়ে তার এ যাবৎ যত লেখা লিখেছেন তা বই আকারে প্রকাশ করতে। এবং দাক্ষায়ণী তার সযত্নপালিত স্বামীটিকে একা কলিকাতায় না ছেড়ে সাথে একজন চতুর লোক নিয়োগ করেন। তারাপ্রসন্ন বিধুভূষণের সাহায্যে কলিকাতায় গিয়ে 'বেদান্তপ্রভাকর' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ প্রকাশের পর একে একে বিভিন্ন কাগজে সমালোচনা প্রকাশ হতে থাকে। গ্রন্থের এক বর্ণও বুঝতে না পেরে দেশযুদ্ধ সমালোচকগণ একেবারে বিহ্বল হয়ে ওঠেন। প্রশংসা জুটে বটে তবে বই একটিও বিক্রি হয় না। আবার দাক্ষায়ণী পঞ্চম সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে তারাপ্রসন্ন বিধুভূষণের কাজ থেকে পাঁচ টাকা ধার করে তাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। দাক্ষায়ণী মূলত মনে মনে স্বামীর সাফল্যের কথা চিন্তা করে তার আগমনে আনন্দিত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু যখন বুঝতে পারেন কিছু সংবাদপত্রের সাময়িকীতে সামান্য প্রশংসা ছাড়া তার স্বামী কোনো অর্থ উপার্জন করেননি তখন সকল দোকানদার ও ক্রেতাদের উপর ক্ষেপে ওঠেন। সন্দেহ করেন বিধুভূষণ সহ গ্রাম্য প্রতিবেশি বিশ্বম্ভর ও কানাই পালকে। সবশেষে দাক্ষায়ণী নিজের ভাগ্যের উপরই ক্ষেপে ওঠেন, এবং তার কন্যাদের অংশীদার করে নেন।

দাক্ষায়ণী ক্রমান্বয়ে মানসিক ও দৈহিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং আসন্ন প্রসবকালে স্বামীকে ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে ছোটখাটো সহস্র বিষয়ে সাবধান করে তার নবজাতক কন্যার নাম স্বামীকে জানিয়ে তার পায়ের ধুলা মাথায় নেন। সবশেষে নবজাত কন্যাটিকে জন্মদানের পর একবার শুধু চেয়ে কন্যার নাম উচ্চারণ করে ইহজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

গল্পটিতে তারাপ্রসন্নের হতাশার হাহাকার ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক তারাপ্রসন্নের দ্বিমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গল্পে সুচারুরূপে তুলে এনেছেন। তারাপ্রসন্নের প্রতিভা সম্পর্কে তার স্ত্রী দাক্ষায়ণী দৃঢ়বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাসে নির্ভর করেই তারাপ্রসন্ন নিজেও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তাই সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সর্বস্ব ফুরিয়ে পুস্তক প্রকাশ করে যশের পরিবর্তে চরম বাস্তবতায় সম্মুখীন হন। সমস্ত গল্পটিতে মূলত কৌতুক ও ব্যর্থতা পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে কাহিনি মিশ্রণজাত হয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

'ত্যাগ' গল্পটির আবর্তন গল্পের ভেতরে গল্পের বিন্যাস দিয়ে। তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনায় হেমন্ত মুখুজ্জে না জেনে এক বাল্যবিধবা কায়স্থকন্যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই হেমন্তের পিতা হরিহর মুখুজ্জে পুত্রকে তীব্র আদেশ করেন, হেমন্ত যেন তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেন; কারণ অনুসন্ধানে হেমন্ত বাবার কাছ থেকে শুনেছেন তার স্ত্রী শ্রীপতি চাটুজ্জের সাজানো কন্যা। এবং ঘটনা সব সত্য সেই সম্মতি স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান।

উদ্‌ভ্রান্ত হেমন্ত যখন তাদের বিবাহে সহায়তাকারী প্যারিশংকর ঘোষালের দ্বারস্থ হয়ে কৈফিয়ত চান তখন জানতে পারেন প্যারিশংকর প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেছেন। কেননা বহুবছর আগে তার বাবা হরিহর গ্রামের সমাজপতি হয়ে প্যারিশংকরের বিলেত-ফেরত জামাতা নবকান্তের জন্য তাদের একঘরে করেছিলেন। এমনকি নবকান্তের প্রায়শ্চিত্তের- প্রসঙ্গেও তিনি অটল ছিলেন। তাই প্যারিশংকর দেশ ছেড়ে, জাত ছেড়ে কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন।

এতদিন পরও প্যারিশংকর ভোলেননি তার অপমানের কথা। তাই কলিকাতায় কলেজে পড়তে এসে যখন হেমন্ত কুসুমের সন্ধান পেয়েছিলেন তখন তিনি প্রতিবেশী বিপ্রদাসের সহায়তায় তাদের বিয়ে সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা করেন। শুধু তাই নয় হরিহরের ছোট কন্যার বিয়ে স্থির হলে প্যারিশংকর কর্তব্যবোধে পাত্রপক্ষের জাত রক্ষার্থে কুসুমের পূর্ব ইতিহাস তাদের জানাতে কার্পণ্য করেননি।

অবশেষে ঘটনার পঞ্চম দিনে হেমন্ত যখন নিজ শয়নগৃহে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন বাইরে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে হরিহর আবারও ছেলেকে আদেশ দেন কুসুমকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু হেমন্ত বাবার আদেশ অগ্রাহ্য করে তাকে জানান তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবেন কারণ তিনি জাত মানেন না।

'ত্যাগ' গল্পের মূল বিষয় অসবর্ণ বিয়ে। যে সময়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিলেত-ফেরত ব্যক্তিদের জাত খোয়ানোর গুজব তুলে প্রায়শ্চিত্তের পরও সমাজে ঠাঁই দেয়া হতো না এই গল্প সেই সময়ের। দোষ না করেও

জাতিচ্যুত একঘরে হয়ে প্যারিশংকর বহুবছর পুষে রেখেছিলেন তার অপমানের জ্বালা। প্যারিশংকর সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করে অবশেষে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন–হরিহরের পুত্র হেমন্তের সাথে কায়স্থ কন্যার বিয়ে ঘটিয়ে, এবং ছোট কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে। এমনকি শেষ পর্যন্ত হরিহরকে তার অনাচারের চরম মূল্য দিতে হয়েছে, কেননা হেমন্ত তার স্ত্রীর জন্য সব ছেড়ে মানবতার জয়গান করেছেন জাত বা সংস্কারের নয়। পিতার আদেশে প্রথমে উদ্‌ভ্রান্ত হলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিচার বিবেচনা করে তবে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার এ সিদ্ধান্ত কোনো অস্থির যুবকের ক্ষণিকের উন্মাদনা নয়। হেমন্ত জাত বা সংস্কারে পরোয়া না করে মানবতার জয়গান করেছেন।

'দর্পহরণ' গল্পটি একটি কৌতুক রচনা। সংসারে গিন্নীর অনুপস্থিতিতে কর্তা সংসারে লক্ষ্মীস্থাপনের জন্য আঠার বছর বয়সী পুত্র হরিশকে বিয়ে দিয়ে বার বছরের কন্যা নির্ঝরিণীকে ঘরে আনেন। হরিশচন্দ্রের পড়াশোনা সম্পূর্ণ না হওয়াতে কর্তা তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে পুত্রবধূকে পাঠদানে প্রবৃত্ত হন। তাই বাধ্য হয়ে নবদম্পতিদের মাঝে চিঠি আদান-প্রদান শুরু হয়। হরিশচন্দ্র তার বাবাকে লুকিয়ে স্ত্রীকে চিঠি দিতেন এবং সেসব চিঠিতে নবীন কবিদের কাব্যের লাইন কোটেশন মার্কা না দিয়েই তুলে দিতেন। কিন্তু স্ত্রীর চিঠির উত্তর পাওয়ার পর বুঝতে পেরেছেন নিজের স্ত্রীকে যতটুকু স্বল্পশিক্ষিতা ভেবেছিলেন সে আসলে ততটুকু নয়। এবং এরপর থেকে হরিশচন্দ্র সচেতন হয়েছেন।

এমন সময় নির্ঝরিণীর জাঠতুত বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে তার কাব্যপ্রতিভার কথা শ্বশুরমহাশয় থেকে শুরু করে হরিশের বন্ধুমহলেও প্রচার হয়ে যায়। যা হরিশের কাছে প্রীতিকর কোনো ব্যাপার ছিল না। তাই শ্বশুরমহাশয় যতই পুত্রবধূকে নির্বিচারে উৎসাহ জুগিয়েছেন স্বামী হরিশ ততই সতর্কতার সাথে ত্রুটি নির্দেশ করে স্ত্রীকে সংযত করার চেষ্টা করেছেন। এবং ইংরেজি বড় বড় কবি লেখকদের লেখা দেখিয়ে স্ত্রীকে অভিভূত করেছেন। যখন নির্ঝরিণীর লেখা হরিশের বাবা কাগজে ছাপাতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন হরিশ নিজে উদ্যোগী হয়ে তা বন্ধ করেছেন।

এমন অবস্থায় মাসিক 'উদ্দীপনা' পত্রে গল্প চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হলে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই গল্প পাঠিয়ে, বিজয়ী হন নির্ঝরিণী। কিন্তু দেখা গেল নির্ঝর স্বামীকে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়ে, সংসারে বিঘ্ন ঘটাতে চাননি। তাই সে অশ্রুসিক্ত হয়ে তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি দাহ করেছেন। আর হরিশ তার স্ত্রীর এই মহৎ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে সকল দম্ভ ত্যাগ করে স্ত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

'দর্পহরণ' গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা নিজ সহধর্মিণীকে নিয়ে এক হাস্য-রসের রচনা। গল্পটিতে পারিবারিক জীবনের বাইরে অন্যকোনো বিষয়ের পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না। হরিশচন্দ্রের চরিত্রে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের কাছে নিজেকে বড়, এবং স্ত্রীকে সামান্য-ক্ষুদ্র ভাবার একটি প্রবণতা প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু সত্যিই যখন নির্ঝরিণী নিজের সুখ্যাতিকে ঢেকে সংসারে শান্তি রক্ষার্থে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন তখন হরিশচন্দ্র নিজের দম্ভ পরিত্যাগ করে দৈন্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

পারিবারিক জটিলতা 'দানপ্রতিদান' গল্পটির উপজীব্য বিষয়। শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দ সহোদর ভাই নয় প্রায় গ্রাম সম্পর্কিত হলেও তাদের ঘনিষ্ঠতা সহোদরের চেয়ে কম ছিল না। তাদের দুজনের মধ্যে কেবল তফাৎ ছিল শশিভূষণের সম্পত্তি ছিল, বিষয়ীবুদ্ধি ছিল কম অন্যদিকে রাধামুকুন্দ দরিদ্র কিন্তু কর্মঠ। আর তাই গৃহের অভ্যন্তরে শশিভূষণের স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দাপটের সীমা ছিল না। সুযোগ পেলেই তিনি রাধামুকুন্দ ও তার স্ত্রী রাসমাণিকে কথা শোনাতে ছাড়তেন না। এমনি এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাধামুকুন্দ দাদাকে বৌদিদির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সমস্ত শুনে শশিভূষণ তাকে স্ত্রীলোকের সামান্যে কথায় উদ্বিগ্ন হতে বারণ করেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরীর তীব্র আক্রমণ দিন-দিন বাড়তে থাকে।

এরি মাঝে একদিন শুনতে পাওয়া যায় শশিভূষণের জমিদারি পরগনা এনাৎশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গিয়েছে। রাধামুকুন্দ যে খাজনা চালান দিয়েছিলেন পথে ডাকাত পড়ে তা লুট হয়ে যায়। তাই সমগ্র সম্পত্তি নিলামে ওঠে। এ রকম বিপদের দিনে রাধামুকুন্দ খুব কৌশলে তার স্ত্রীর সমস্ত গহনা বন্ধক রেখে সংসারের হাল ধরেন। এতে করে পুরো সংসারে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে বড় গিন্নির ব্যবহারে। যাদের তিনি দূর-দূর করেছিলেন আজ তারাই তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হয়ে দেখা দিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন রাধামুকুন্দ নিকটবর্তী শহরে মোক্তারি কাজে যোগ দিলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পসার জমিয়ে তুললেন। এখন তার অর্থে সমস্ত পরিবার প্রতিপালিত হওয়ায় রাসমণি বড় গিন্নির মতো কৌশল অবলম্বন করতে চাইলে তাকে রাধা কঠোরভাবে দমন করে গৃহে বড় গিন্নির কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। বড় গিন্নি সময় ঠিকই যাচ্ছিল কিন্তু ঝিমিয়ে পড়ছিলেন শশিভূষণ। যা রাধার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি অনেক সময় দাদাকে আশ্বাস দিতেন যে তিনি শশিভূষণের পৈত্রিক জমিদারি ফিরিয়ে আনবেনই। বাস্তবিকই রাধামুকুন্দ দশ বছরের মাথায় সেই জমিদারি পুনরায় ক্রয় করেছিলেন। সেই উপলক্ষে গ্রামে এই ভোজের আয়োজন করা হয়। এই সময়ে শশিভূষণের উপরে একটি বড় রকমের চাপ যায় তিনি সইতে না পেরে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৈদ্য জানায় অসুখ ভালো নয় এমনি অবস্থায় শশিভূষণকে একলা পেয়ে রাধামুকুন্দ বিষয় সম্পত্তির প্রসঙ্গ তোলেন। এবং তার

বহুবছর পূর্বে শশিভূষণের খাজনা ডাকাতির সাথে তিনি যে যুক্ত থেকে মহাপাপীর কাজ করেছেন তা স্বীকার করেন। উত্তরে শশিভূষণ কেবল জানান যে এই খবর তিনি অনেক আগেই জানতেন। আজ এতদিন পর রাধামুকুন্দ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি জানান অনেক আগেই তিনি ক্ষমা করেছেন। তাই ক্ষমার স্বীকৃতি স্বরূপ রাধা তাকে অনুরোধ করেন জমিদারি ফিরিয়ে নিতে কিন্তু তখন তা শশিভূষণের বাকরোধ হয়েছে।

পারিবারিক জীবনের নানা ঘটনা 'দানপ্রতিদান' গল্পটির কাহিনি ফেনিয়ে তুলেছে। আর দশটা যৌথ পরিবারে যেমনটি হয়ে থাকে এখানেও তাই হয়েছে। তবে রাধামুকুন্দ চরিত্রটিকে একটু বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে। পরিবারে তিনি নিজের সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং বড় গিন্নির কটুবাক্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটি কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে মৃত্যুর পথযাত্রী দাদা শশিভূষণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সেজন্য চরিত্রটিকে খল চরিত্র বলে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। অন্যদিকে 'শশিভূষণ' চরিত্রটি একেবারে নির্ভেজাল করে সৃষ্টি করেছেন লেখক। শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দের বাস্তবিক কোনো পার্থক্য ছিল না, শুধু শশিভূষণ ধনী রাধামুকুন্দ দরিদ্র। আর এ পার্থক্য ঘোচানোর অভিপ্রায়ে রাধামুকুন্দ যে জালিয়াতি করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা শশিভূষণ নিজগুণে ক্ষমা করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

'দালিয়া' একটি প্রেমের গল্প। পরাজিত শা সুজা ভাই ঔরঙ্গীবের ভয়ে তিনি তার তিন সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে আরাকান রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। আরাকান রাজা তার পুত্রদের সাথে শা সুজার কন্যাদের বিবাহের প্রস্তাব করে ব্যর্থ হয়ে, শা সুজাকেসহ রাজকন্যাদের নৌকায় করে মাঝনদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারার কৌশল করেন। এ সময় বড় কন্যা আত্মহত্যা করে, সর্ব ছোটটিকে বাবা নিজে পানিতে ফেলে দেন, মেজোটাকে নিয়ে সুজার বিশ্বস্ত কর্মচারী রহমত সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়। সবশেষে সুজা একা লড়াই করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এবং ছোট কন্যা আমিনাকে এক ধীবর পায়। পরবর্তীতে সেই ধীবরের আশ্রয়েই আরাকানে লালিত পালিত হতে থাকে সে। ক্রমান্বয়ে দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। এরি মাঝে জুলিখার আশ্রয়দাতা রহমত শেখ ছদ্মবেশে আরাকান রাজসভায় কাজ নেন। অন্যদিকে জুলিখা ছদ্মবেশে আমেনাকে দ্বারে দ্বারে খুঁজে অবশেষে ধীবরের গৃহে তার সন্ধান পেয়ে এখানেই থেকে যান। এবং ছোট বোন আমিনাকে বহুদিন আগের পিতার হত্যার প্রতিশোধের কথা জানান। কিন্তু আমেনা তাতে নিজের অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করে। এই সুন্দর পৃথিবীতে তার বাঁচার বাসনার কথা ব্যক্ত করে। দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে ধীবরের এই কুটীরই যে তার বেশি প্রিয় সে কথাটিও জানিয়ে দেয়। আমিনার প্রস্থানের পর জুলিখা যখন তার এই ব্যবহারে আহত হয়ে চিন্তায় মগ্ন তখন এক অপরিচিত যুবক এসে পেছন থেকে তার চোখ টিপে ধরে। এই অমার্জনীয় অপরাধে জুলিখা রাগান্বিত হয়ে তার পরিচয় জানতে চায়। যুবক জানায় যে তিন্নি (আমিনা) তাকে চেনে। এবং দুজনের গোলযোগ শুনতে পেয়ে তিন্নি এসে বোনকে দালিয়ার

পরিচয় জানায়। এবং জুলিখা এ ঘটনার পরই বুঝতে পারে তার বোন কেন প্রতিশোধ গ্রহণে বিমুখ। আস্তে আস্তে জুলিখার সাথেও দালিয়ার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এমন সময় জুলিখা রহমতের পত্রের মাধ্যমে জানতে পারে যে আরাকান রাজা তাদের দুই বোনের পরিচয় ও ঠিকানা সবই অবগত আছেন এবং ছোট কন্যাকে শীঘ্রই বিয়ে করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন। জুলিখা এই ঘটনাকে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধের মোক্ষম সুযোগ বলে ধরে নেয়। এবং যথাসময়ে কথা অনুযায়ী আরাকান রাজ্যের অশ্বারোহী, পদাতিক, নিশান, হস্তী, বাদ্য, দুই স্বর্ণখচিত শিবিকা এসে উপস্থিত হয় ধীবরের কুটিরে। আমিনা জুলিখার নিকট হতে ছুরি নিয়ে নিজের পরিধান বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখে। যাবার অন্তিম মুহূর্তে তার একান্ত ইচ্ছা হয় একবার দালিয়াকে দেখতে। এবং দালিয়ার দেয়া আংটি ধীবরকে দিয়ে যায় তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। চোখের জলে ধীবর বিদায় জানায় তার তিন্নিকে।

অবশেষে দুই শিবিকা গিয়ে পৌঁছয় রাজ অন্তঃপুরে। এবং মাহেন্দ্রক্ষণে বাসর ঘরে জুলিখা ও আমিনা জানতে পারে তাদের চিরপরিচিত দালিয়াই আরাকান রাজাপুত্র। তাই আমিনার হাতের ছুরি খাপ থেকে মুখ বের করে কেবল, দালিয়াকে আঘাত করতে পারে না।

'দালিয়া' গল্পটি সামান্য ঐতিহাসিক আমেজে মূলত প্রেমের গল্প। বেশ কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র নামে মাত্র উল্লিখিত হয়েছে। যেমন–ঔরঙ্গীব, শা সুজা, আরাকান রাজা প্রভৃতি। তবে বিকশিত হয়েছে তিনটি মাত্র চরিত্র শা সুজার দুই কন্যা জুলিখা, আমিনা ও আরাকান রাজপুত্র দালিয়া। গল্পে মোট সাত পৃষ্ঠায় ছয়টি পরিচ্ছেদে অতি অল্প রাজনৈতিক মহিমা ও আরাকানের প্রাকৃতিক শোভায় দুটি সরল প্রাণের রোমান্সের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়াই জুলিখার একমাত্র লক্ষ্য হলেও লেখক কৌশলে রোমান্সের শক্তির সাহায্যে জুলিখার কর্তব্যকে দায়ে রূপান্তরিত করেছেন। অর্থাৎ জুলিখাকে প্রথমে প্রতিহিংসাপরায়ণরূপে অঙ্কিত করা হলেও পরবর্তীতে আমিনা ও দালিয়ার প্রেমের স্পর্শে তার হৃদয় হয়েছে পুলকিত, পরাজয় ঘটেছে জুলিখার প্রতিহিংসা বাসনার।

'দিদি' গল্পটি বাৎসল্য রসের গল্প। গল্পের মূল চরিত্র শশিকলা। শশী তার পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা ছিল। পিতার যথেষ্ট সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অংশীদার সেই হবে বলে তার স্বামী জয়গোপাল নামমাত্র একটি চাকরি করত। কিন্তু প্রায় বৃদ্ধ বয়সে শশীর পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ায় শশী যেমন মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়েছিল তেমনি তার স্বামীও ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিতে পারেননি। তাই অনেকটা রাগ করেই জয়গোপাল সন্তানসহ স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে চা-বাগানের চাকরি নিয়ে আসামে চলে যান।

এদিকে মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে প্রথমে শশীর মা, পরে বাবা মৃত্যুবরণ করেন। কালীপ্রসন্নের অবস্থা যখন গুরুতর ছিল তখন তিনি তার সম্পত্তির সিকি অংশ কন্যাকে, বাকি সব পুত্রকে দিয়ে যান। পিতৃ-মাতৃহীন নীলমণিকে শশী মায়ের স্নেহে লালন করলেও সে প্রথম থেকেই বুঝতে পারে তার ভাইটি তার স্বামীর কাছে আপদস্বরূপ। এমনকি অসুস্থ নীলমনির জন্য জয়গোপাল ভালোভাবে চিকিৎসার উদ্যোগেও অনীহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে একে একে তার সকল সম্পত্তি জয়গোপাল বিভিন্ন কৌশলে নিজের নামে খারিজ করে নেয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে কোনো ফল না পেয়ে, সরাসরি মফস্বল-পর্যবেক্ষণে আগত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। সাহেব শশীকে অভয় দান করেন যে, তিনি যা কর্তব্য তাই করবেন। সেই ভরসায় শশী ভাইটিকে সাহেবের তত্ত্বাবধানে রেখে গৃহে ফিরে আসে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর একদিন সকালে প্রতিবেশীরা জানতে পারে যে, শশী রাত্রে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে এবং রাত্রেই তার দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে। এ ঘটনায় কোনো গ্রামবাসী মুখ না খুললেও কেবল মাঝে-মাঝে স্পষ্টভাষিণী তারা ক্ষেপে উঠত এবং সকলে মিলে তাকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত।

'দিদি' গল্পটি বাৎসল্য রসের মহিমায় উদ্ভাসিত। গল্পে ব্যক্তি শশিকলার মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও বেদনা ছোটভাই নীলমণিকে ঘিরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও শুরুতে সম্পত্তি বিভাজনের সংবাদে ভাইটির উপর রাগান্বিত ছিলেন, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর নীলমনির দায়িত্ব যখন তারই উপর পড়ে তখন শশীর মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বে তার হৃদয় ছিল স্বামী-সংসারের চিন্তায় আচ্ছন্ন, স্বামীর প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। কিন্তু ক্রমান্বয়ে নীলমণির প্রতি স্বামীর হিংসাত্মক মনোভাবই তাকে স্বামীর বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস পতিব্রতা শশীকে বিদ্রোহী করে তোলে। এর মধ্য দিয়েই মূলত শশীকলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়েছে।

'দুরাশা' গল্পটি কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনে বিবৃত হয়েছে। কলকাতার বাবু দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে কাকতালীয়ভাবে বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর সাক্ষাৎ পান সেখান থেকে গল্পের সূত্রপাত। গল্পের মাঝে কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আভাস লক্ষ্যগোচর নয়। লেখক গল্পে নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যার প্রেমাবেগপূর্ণ হৃদয়রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন।

পিতৃকুলের দিক থেকে দিল্লির সম্রাট বংশের রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় কুলগর্ব রক্ষা করতে গিয়ে নবাবপুত্রীর উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সাথে তার সম্বন্ধের প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু সিপাহিলোকের সাথে সরকার বাহাদুরের দাঙ্গায় সে বিয়েও সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে নবাবের ফৌজের অধিনায়ক ছিল নিয়ত সংযত শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ কেশরলাল। যাকে নবাব কন্যা প্রত্যহ আপন অন্তঃপুরের গবাক্ষ থেকে লক্ষ করতেন।

এই মুসলমান বালিকা অন্তঃপুরে কখনো স্বধর্মের কথা শোনেননি এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিতও ছিলেন না। যার ফলে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে তার অন্তর ভক্তিমাধুর্যে আপ্লুত হয়ে ওঠে। এমন সময় কোম্পানী বাহাদুর ও সিপাহিলোকের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে নবাবের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশপ্রেমিক কেশরলাল ব্যথিত চিত্তে বদ্রাওন ত্যাগ করেন। সেইদিন থেকেই নবাবপুত্রী নিজেকে অন্তঃপুরের বিলাস বৈভবের জীবন থেকে বহিঃসংসারে নিক্ষেপ করেছেন কেশরলালের সাধনায়। এর মধ্যে প্রায়ই তিনি কেশরলালের সংবাদ পেতেন কিন্তু কখনোই তার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। ক্রমেই ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্থানের বিদ্রোহের আগুন ফু দিয়ে নিবিয়ে দেয়। তখন আর নবাব কন্যা থাকতে পারলেন না।

এরপর নবাবপুত্রী কাশীর শিবানন্দ স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে ভালোবাসার টানে ভালোবাসার মানুষকে দেশ হতে দেশান্তরে অন্বেষণ করেছেন। অবশেষে দেখা পেলেন বহুবছর পর বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত নাতি নাতনি নিয়ে ম্লান পোশাকে অপরিচ্ছন্ন অঙ্গনে বসে ভুট্টা থেকে শস্য সংগ্রহ করছেন। সেদিন নবাব কন্যার মোহ ছুটে যায়। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন কেশরলালের ধর্মাচার শুধুমাত্রই তার অভ্যাস এবং সংস্কার ।

'দুরাশা' গল্পটিতে লেখক অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন। বদ্রাওনের নবাবপুত্রী নিজজীবনের আটত্রিশ বছরের পুরোনো ইতিহাস কোলকাতার বাবুর কাছে ব্যক্ত করেছেন। এই ইতিহাস যে আদর্শ, ত্যাগ সংযত শুদ্ধাচারে সৃষ্টি হয়েছিল সে তুলনায় তার পরিসমাপ্তি একেবারেই তিক্ত। সুমহান শুদ্ধাচার ব্যক্তিত্ব কেশরলালকে ভালোবেসে নবাবপুত্রী গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, কেশরলালের যোগ্য সহচরী হতে নিজে শাস্ত্রাজ্ঞা ব্রাহ্মণীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সেই কেশরলালের জীবন রক্ষার তাগিদে ব্রাহ্মণীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সেই কেশরলালের জীবন রক্ষার তাগিদে ব্রাহ্মণত্বের হেন চরম অধগতি দর্শনে তিনি মুহূর্তেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন কেশরলালের ধর্ম, ব্রাহ্মণত্ব অনাদি অনন্ত নয় কেবলি সংস্কার, অভ্যাস মাত্র। তাই এতদিনের পূজার্চনায় অর্জিত হিন্দুত্ব নবাবপুত্রী এক লহমায় বিসর্জন দিয়েছেন। তার ভগ্নহৃদয়ের হাহাকার জীবনাচরণের চরম ব্যর্থতা তাকে ও পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

'দৃষ্টিদান' গল্পের শুরুতেই গল্পের নায়িকা কুমুদিনীর স্বামীর আকাঙ্ক্ষায় শিবপূজার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। আট বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মেডিক্যালের ছাত্র অবিনাশের সাথে তার বিয়ে হয়। কুমুদিনী চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। শরীরের নানা দুর্বলতায় মনের খেদে চোখের রোগে আক্রান্ত হন। অবিনাশ নতুন নতুন ডাক্তারি বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহবশত স্ত্রীকে ভালো চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে নিজেই

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসার শুরু করেন। কুমুর দাদা অবিনাশের সমবয়সী তিনি আইনের ছাত্র ছিলেন। ভগ্নিপতির এহেন গোঁড়ামির তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু অবিনাশ তার কোনো কথাই কানে তোলেননি। তিনি অবশেষে বোনের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন কিন্তু কুমু সংসারে শান্তির জন্য দাদা দেয়া ঔষধ ফেলে দিয়ে স্বামীর চিকিৎসা মতো চলেন। অবিনাশ অভিজ্ঞ না হওয়ায় তার চিকিৎসায় কুমুর দুটো চোখই নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে আত্মঅনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে অবিনাশ স্ত্রীর সব সময় কাছে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। কুমু স্বামীর আরেকটি বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে অবিনাশ উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন না করতে পেরে জানান তিনি মূঢ় তিনি অহংকারী কিন্তু তিনি তো পাষণ্ড নন। যাকে নিজে হাতে অন্ধ করেছেন আজ তাকে রেখে অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করবেন। আর তা যদি করেন তবে যেন ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হন।

কিন্তু অবিনাশ তার প্রতিজ্ঞা বেশি দিন স্থায়ী রাখতে পারেননি। তার আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে তার মানসিকতার অবনতি ঘটতে থাকে। একসময় সে পিসিমার ভাসুরের কন্যা হেমাঙ্গিনীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। এমনকি কুমুর কাছে মিথ্যা বলে সে হেমাঙ্গিনীকে বিয়েও করতে যান। কিন্তু ঘটনাচক্রে হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হয়ে যায় কুমুর বড় দাদার সাথে। অবশেষে অবিনাশ তার নিজের ভুল বুঝতে পারেন। যে স্ত্রীকে দেবী বলে দূরে সরিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন কুমুকে ছেড়ে তার সুখ নেই। তাই আবার ফিরে এসেছেন কুমুদিনীর কাছে।

'দৃষ্টিদান' গল্পটিতে লেখক এক মানবী আবার দেবী-প্রতিমার চিত্র অংকনের চেষ্টা করেছেন। যার জন্ম এ যুগে কিন্তু তার চিন্তা-চেতনার মূল কেন্দ্রিভূত ছিল ভারতীয় জীবনাদর্শের মাঝে। গল্পের নায়িকা কুমুদিনী অন্ধ হলেও তাকে লেখক একেবারে পরনির্ভরশীল না করে এবং ব্যক্তিত্বময়ী করে উপস্থাপিত করেছেন। অধিক ব্যক্তিত্বময়ী হওয়ার কারণে স্বামীর সহজ প্রেম স্ত্রীর প্রতি বিকশিত হতে দেখা যায়নি। সাধারণ মানবীর পরিবর্তে দেবী হিসেবেই কুমুদিনী স্বামীর কাছে প্রতিভাত হয়েছেন। কুমুর স্বামী আত্মঅহমিকার বশবর্তী হয়ে কুমুর প্রতি অবিচার করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্ত্রীকে দেবী মহিমায় মণ্ডিত করে নিজে এক ভুলের আবর্তে আচ্ছন্ন থেকেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা তাদের হয়েছে ফিরে পেয়েছেন একে অন্যেকে।

একেবারেই সহজ-সরল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের চিরপরিচিত কাহিনি নিয়ে 'দেনাপাওনা' গল্পটি রচিত। পাঁচটি পুত্র সন্তানের পর যখন একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল তখন পিতা-মাতা শখ করে নাম রেখেছিলেন নিরুপমা। আর নিরুপমার বিয়েকে কেন্দ্র করেই কাহিনির আবর্তন। পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক যাচাই-বাছাই করে বহু টাকার পণে রাজি হয়ে জমিদার রায়বাহাদুরের ঘরে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত টাকা শোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বেহাই বাড়িতে রামসুন্দরের যেমন কুটুমের মর্যাদা ছিল না তেমনি নিরুপমাকেও সইতে হতো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। কন্যার অপমান সইতে না পেরে বহু দেনায় জর্জরিত রামসুন্দর

Dhaka University Institutional Repository

শেষপর্যন্ত নিজ পুত্রদের জলে ভাসিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু নিরুপমার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে বেহাইয়ের হাতে সেই টাকা পৌঁছানো আর হয় না।

এদিকে রোগাক্রান্ত নিরুর নিজের প্রতি নিজের অযত্ন এবং পরিবারের সকলের অবহেলা তাকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেয়। সম্পন্ন হয় মহা ধুমধামে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অন্যদিকে অন্যত্র বসবাসরত ম্যাজিস্ট্রেট পুত্র তার স্ত্রী নিরুপমাকে তার কাছে পাঠানোর তাগিদ দিলে মা রায়বাহাদুর মহিষী পুত্রকে উল্টো তাগিদ করেন দ্বিতীয় বিয়ের জন্য এবং সেই সাথে এবারে পণের টাকা হাতে-হাতে আদায়ের বাসনা।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বনেদী ঘরের অন্দর-বাহিরের সামগ্রিক চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'দেনাপাওনা' গল্পে। যে গৃহে পুত্রবধূর গুরুতর অসুখেও সমান্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না, সেই গৃহেই আবার পুত্রবধূ মৃত্যুর পর ঘটা করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অন্যের গৃহে অন্যের চাওয়া-পাওয়ার সাথে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেয়া যে কত কঠিন এবং তা যে তিলে-তিলে একটি প্রাণকে নিঃশেষ করে দেয় তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিরুপমা। নিরুপমা তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের মহিমায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে নীরবে ধিক্কার জানিয়েছে সমস্ত অনাচারের।

'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক প্রেমের গল্প। ধনীর গৃহের বধূ চারুলতা। স্বামী ভূপতি সর্বক্ষণ নিজ কর্মে ব্যস্ত স্ত্রীকে সময় দেয়ার মতো সময় তার নেই, এমতাবস্থায় ভূপতির পিস্‌তুতো ভাই কলেজে (থার্ড ইয়্যারে) পড়ুয়া অমল হয়ে ওঠেন চারুর সবচেয়ে কাজের মানুষ। চারুকে সংসারের কোনো কাজ করতে হতো না, তিনি দেওরের শখের বেগার খাটতেন। বৌঠানকে সামান্য পড়া দেখিয়ে দিয়ে অমল তার কাছ থেকে কার্পেটের জুতো, রেশমের গলাবন্ধ, কেদারার আবরণ, এমনি আরো হাজারো আবদার করে বসতেন। আর এই স্নেহের উপদ্রব চারুর কাছে অবশ্য পালনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মাঝে পত্রিকাতে সামান্য লেখা ছাপানোকে কেন্দ্র করে দেওর-ভাজের মনোমালিন্য শুরু এবং তা আরো ঘনীভূত করে তোলেন চারুর বৌঠান মন্দাকিনী। ভূপতিকে সর্বশান্ত করে চারুর দাদা উমাপদ স্ত্রী মন্দাকে নিয়ে বাড়ি থেকে উৎখাত হলেও চারু আর অমলের দূরত্ব কমে না। এদিকে অমল দাদাকে সাহায্যে করার জন্য বিয়ে করে বিলেত চলে যান ব্যারিস্টারী পড়তে। অমলের অনুপস্থিতিতে চারু নতুন করে তার অন্তরের অজানা জগতের খোঁজ পান যা ক্রমেই ভূপতির কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর তাই মৈশুর থেকে ভূপতিকে কাগজের সম্পাদক করা হলে ভূপতি সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। যাত্রাকালে চারু তার সঙ্গে যেতে চাইলে সরাসরি চারুকে প্রত্যাখ্যান করেন, পরক্ষণেই আবার মত পাল্টে চারুকে সঙ্গে নিতে ইচেছ প্রকাশ করলে চারু নিজেই তা প্রত্যাখ্যান করেন, নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

'নষ্টনীড়' ছোট গল্প হিসেবে যথেষ্ট বড় তবে উপন্যাস হিসেবেও এটিকে ধরা যায় না। গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে সমবয়সী দেওর-ভাজের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ, আবার সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য কালক্রমে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্বামীর সাথে দূরত্ব সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। চারু ও ভূপতির মাঝে যে শূন্যতাটুকু ছিল দেওর অমল তা পূর্ণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু অমল যে চারুর কতটুকু জুড়ে ছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে অমলের অনুপস্থিতিতে সেই শূন্যতার জগৎ ছিল চারুর সম্পূর্ণ অজানা। হঠাৎ চারু হতবুদ্ধি হয়ে যান অমলের প্রতি তার এই দুর্বলতার কারণে। "এবার শুরু হয়েছে চারুর অন্তর্দ্বন্দ্ব। এর আগে চারুর মধ্যে যে ভাবনার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তাতে ছিল কেবল অমলের প্রতি একধরনের অভিমান। কেন অমল যেতে চায়, আবার আগে কেন অমল সেকথা চারুর কাছে আলোচনা করেনি-ইত্যাদি নিয়ে অভিমান জন্ম নিয়েছিল। অমল চলে যাবার পর চারু নিজেকে চিনেছে আরও বেশি করে। কিন্তু সে উপলব্ধিও হঠাৎ করে আসেনি। [...] চারু সাময়িকভাবে চেয়েছে হৃদয় আর দাম্পত্য-কর্তব্যকে আলাদা করে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে। চারু ভূপতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। ঠিক এই সময়ে ভূপতির সাহিত্যচর্চা চারুকে তার গোপন আশ্রয় থেকে বের করে নিয়ে এসে সত্যের আলোয় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।"[১৩] চারুর এই মানসিক অবস্থা ভূপতির কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ায় নিদারুণ কষ্টে ভূপতি সম্পাদকের কাজ নিয়ে মৈশুরে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। অবশেষে স্বামী দেওরের উপেক্ষায় চারুর শূন্য হৃদয় এক বোবা হাহাকারে বিদীর্ণ হয়েছে।

'নামঞ্জুর গল্প' গল্পটি রাজনৈতিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত। বঙ্গভঙ্গের পর যে রাজনৈতিক আবহ দেশে বিরাজ করছিল তারই বরপুত্র গল্পের নায়ক। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেছেন আর সে কারণেই তিনি ছিলেন শারীরিকভাবে অসুস্থ। বিপ্লবীর সহযোগীদের মধ্যে অনেকেরই শাস্তি হয়েছিল আন্দামানের সমুদ্রকূলে আবার অনেকের ফাঁসি পর্যন্ত। কিন্তু ভাগ্যের জোড়ে এ পারেই তা কারাভোগের সমাপ্তি হয়েছে। এবং পরবর্তীতে তিনি পশ্চিমের এক শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন।

হাজতে থাকা অবস্থাতেই মায়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং বাবার সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকায় তাঁর আর কলকাতায় যাওয়া হয়নি। তাই তিনি পশ্চিমের এক শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। সেখানে তাঁর দূরসম্পর্কের পিসি এবং পিসির স্বামীর অন্যপক্ষের কন্যা অমিয়াই ছিল তাঁর নিকটাত্মীয়। পরবর্তীতে তাঁর ধনী উকিল বাবার মৃত্যুর পর যখন জানতে পারেন তিনি বিষয়-সম্পত্তি থেকে পুত্রকে বঞ্চিত করেননি তখন নায়ক তাঁর পিসি ও অমিয়াকে নিয়ে পশ্চিম থেকে কলকাতায় চলে আসেন, পিসিমার ইচ্ছে ছিল তাঁর কন্যাটিকে বিয়ে দিয়ে তিনি তীর্থে চলে যাবেন কিন্তু পরে মায়ার বন্ধন আরেকটি বেড়ে যাওয়ায় নায়কের বিয়ের বিষয়টিও তিনি মাথায়

রেখে কলকাতায় আসেন। কিন্তু পিসিমার ইচ্ছের সাথে বিপ্লবীর ইচ্ছের মিল হয়নি। স্বদেশ সেবার সংকল্পে বিয়ে করবেন না এ সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরবর্তীতে রাজনৈতিক মাঠে নতুন যুগের নতুন হাওয়ার নায়ক সক্রিয়কর্মী না হলেও একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাই পুজোর বাজারে খদ্দরপ্রচারকারিণী এক বাঙ্গালী নারীকে পুলিস সার্জন ধাক্কা দেওয়ায় তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। আর তাই তাঁর স্থান হয় জেলে। জেলের কঠিন নিয়মের সাথে আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তবে তাঁর সাজার মেয়াদ পুরো হওয়ার আগেই তিনি ছাড়া পেয়েছেন সেই সাথে পেয়েছিলেন বহু জনতার হাততালি।

বিপ্লবী বাড়ি ফিরে আসার পর মাঝে একদিন তাঁর এক সম্পাদক বন্ধু বাড়িতে এসে হাজির। আবদার হল তাঁকে একটি 'লেখা' দিতে হবে। বিপ্লবীর জীবনের সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতার কথা থাকবে সেই লেখায়। বন্ধুর যুক্তি তাঁর সম্পর্কে লোকে জানতে চায়। কিন্তু তিনি বুঝতেন তাঁর যেখানে সবচেয়ে কষ্ট লোকের সেখানেই সবচেয়ে আনন্দ ও কৌতূহল। অসুস্থ শরীরে নিষ্কর্ম অবস্থায় খেয়াল করলেন তাঁর অবর্তমানে অসহোযোগের প্রবল হাওয়ায় অমিয়া হয়েছে কলেজ ত্যাগিনী। হাজারো মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে অপরিচিত লোকের কাছে অনাথসদনের জন্য চাঁদা তুলতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে সে তার অসুস্থ দাদাকেই একটু দেখার সময় পেত না। তার দলের ছেলেরা তাকে 'যুগলক্ষ্মী' সম্ভাষণ করত। তাই নিজেকে অমিয়া সেই পদবীর উপযুক্ত করতে সদাই থাকত অস্থির। অমিয়া অনাথসদনের জন্য লোকের বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে বেড়াত অথচ নিজগৃহে পিসিমার গ্রামের আশ্রিত অনাথাদের সে মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। যে হরিমতির একটু সেবা বিপ্লবীর কাছে অন্য সকল প্রাপ্তির চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা সেই হরিমতি অমিয়ার কাছে ছিল আপত্তিকর। তাই সে দাদার সেবায় হরিমতির জায়গায় অন্য মেয়ে প্রসন্নকে স্থলাভিষিক্ত করেছিল। অমিয়ার এই নীরব ভর্ৎসনা হরিমতি সইতে না পেরে সে তার পাড়াগায়ে চলে গিয়েছিল। এদিকে শেষ পর্যন্ত অমিয়া ও অনিল বিয়ের ব্যাপারে অনিল উদ্যাগী হলে বিপ্লবী আর নীরব না থেকে অমিয়ার জন্মের সত্য ঘটনা অর্থাৎ অমিয়ার মা ছিলেন জাতিতে কাহার তা প্রকাশ করেন। এতে করে তাদের নবীন স্বদেশীদের ভাইফোঁটা আর জমল না। অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ প্রচারের কাজ নিয়ে চলে যায় আর দেবী অমিয়া দেবীর মুখোশ খুলে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে কলেজে ভর্তির চেষ্টা করে। এরি মাঝে পিসিমা ফিরে আসায় বিপ্লবী স্বস্তি ফিরে পান।

'নামঞ্জুর গল্প' গল্পটি রাজনৈতিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ। ভাষার তীক্ষ্ণতা গল্পটিকে অনন্যতা দান করেছে। গল্প কথক জেলখাটা সাবেক বিপ্লবীই গল্পের প্রধান চরিত্র এমনকি তিনি একজন লেখকও। তিনি ক্ষুরধার ভাষায় নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে বিদ্রূপ করেছেন সাময়িকভাবে উত্তেজনার মোহে মোহগ্রস্ত

প্রকৃত বিপ্লবীর নিষ্ঠা বিবর্জিত স্বদেশীদের। লক্ষ করলে দেখা যায় গল্পটিতে স্বদেশসেবীদের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একই ছাদের তলায় একদিকে রোগজীর্ণ নির্মোহ অনুশোচনাহীন প্রাক্তন রাজবন্দী অন্যদিকে উন্মাদনার বশে উদ্বুদ্ধ বাহবা লোভী অমিয়া। অসহযোগ আন্দোলনের কালে দীর্ঘদিন জেলখাটা বিপ্লবীর চরিত্রে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত অমিয়ার ত্যাগের পেছনে দেবী সাজার চেষ্টা তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাই সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে হুজুগপ্রিয় স্বদেশীদের স্বদেশের প্রতি কর্তব্যের আড়ালে মূলত নিজেকে জাহির করার যে বাসনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল লেখক রবীন্দ্রনাথ নিঃস্বার্থ প্রাক্তন বিপ্লবীর মাধ্যমে সেই মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াশ পেয়েছেন।

'নিশীথে' গল্পটিতে 'অতিপ্রাকৃত' অনুভূতির শিহরণ আছে। জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর নিজ জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে গল্পের আবর্তন। জমিদারবাবু চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। যদিও তার রোগ উপশমের জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ তথাপি তিনি ডাক্তারের কথা আমলে নেন না। আবার মাঝরাতে ডাক্তারের বাড়ি চড়াও হয়ে অভিযোগ করেন তার ঔষধ কাজে দেয় না তখন ডাক্তারের আপত্তিতে তিনি নিজেই তার অসুস্থতার মূল কারণ হিসেবে শনাক্ত করেন তার পূর্ব জীবনকে। যে জীবনের কথা রাত্রি আড়াইটার সময় ডাক্তারকে শুনতে বাধ্য করেন।

দক্ষিণাচরণ জানিয়েছেন তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। জমিদারবাবু বয়সে ছিলেন তরুণ সহজেই রসাধিক্য ছিল তার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করে অধ্যয়ন করেছিলেন তাই স্ত্রীর গৃহিণীপনায় তার মন উঠত না। কিন্তু জমিদারবাবুর ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ তার গৃহিণীর কাছে খাটত না বরং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করতে গেলে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন।

একসময় জমিদারবাবু সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। বাঁচার আশা ছিল না তার। ডাক্তার জবাব দিয়ে হাল ছেড়েছিলেন সেসময় হাল ধরেছিলেন তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। একজন অবলা স্ত্রীলোক মানুষের সামান্য শক্তি নিয়ে, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সাথে যমদূতগুলোর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তার নিজের আহার নিদ্রা এমনকি জগতের কোনো কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না। সে যাত্রায় জমিদারবাবু যমের হাত থেকে রেহায় পেলেও তার স্ত্রীর অতি অনিয়ম ও অমানুষিক পরিশ্রমের কারণে অসুস্থ হলেন। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন কিছুদিন পর একটি মৃত সন্তান প্রসব করে নানা প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত হন । বহু চিকিৎসায় সুস্থ না হওয়ায় ডাক্তার পরামর্শ দেন বায়ু পরিবর্তনের। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণাচরণ আসেন এলাহাবাদে। সেখানে চিকিৎসা শুরু করেন হারান ডাক্তার। অবশেষে বহুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ডাক্তার জানালেন ও তারাও বুঝতে পারলেন এ রোগ ভালো হওয়ার

নয়। রোগীকে সারাজীবন চিররুগ্ন হয়েই কাটাতে হবে। তখন তার স্ত্রী তাকে আরেকবার বিয়ে করার পরামর্শ দেন।

যদিও দক্ষিণাচরণবাবু স্ত্রীর প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ক্রমান্বয়ে হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমার সাথে পরিচয় ও আলাপে জমিদারের কাছে রোগীর ঘর তার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দের হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে। আস্তে আস্তে দেখা যায় প্রায়ই হারান ডাক্তারের বাড়ি হতে বিলম্বে বাড়ি ফেরাতে স্ত্রীর ঔষধ খাওয়ার সময় উতরে যেতে থাকে। এবং একদিন মনোরোমা রোগীকে দেখতে এলে জমিদারবাবুর স্ত্রী চমকে ওঠে স্বামীর কাছে জানতে চান মেয়েটির পরিচয় উত্তর শুনে অনুধাবন করতে পারেন তার স্বামীর বিলম্বে বাড়ি ফেরার হেতু, কিন্তু কখনো এ নিয়ে তার কোনো অভিযোগ ছিল না। উল্টো তিনি অভিমান চেপে স্বামীকে অনুরোধ জানিয়েছেন ক্ষুধা সঞ্চারের জন্য ডাক্তারের বাড়িতে বেড়াতে যেতে। সে রাত্রেই ডাক্তারের দেয়া ব্যথা উপশমের মালিশ করার বিষাক্ত ঔষধ সেবন করে আত্মহত্যা করেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হারান ডাক্তারের সম্মতিক্রমে দক্ষিণাচরণ তার কন্যা মনোরোমাকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন। জমিদারবাবু একদিন দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রণয়সম্ভাষণ করে নিজেই নিজের কথায় চমকে ওঠেন কেননা ঠিক এমনিভাবে তিনি তার প্রথমা স্ত্রীকে ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে কখনো ভুলবেন না। ঠিক সেই মুহূর্তেই রাতের একঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়ার শব্দ, তার কাছে প্রথম স্ত্রীর সুতীক্ষ্ণ হাসি হয়ে তাকে আঘাত করে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে দিনের বেলায় বুঝতে পারেন পাখির ডানার শব্দই বটে কিন্তু সন্ধ্যা হলে সে বিশ্বাস আর রাখতে পারতেন না। অবশেষে বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে বোটে করে বেড়াতে বের হয়ে নির্জন পদ্মার চরে স্ত্রীর সাথে প্রণয়ের মুহূর্তেই আবারও গম্ভীর করে শুনতে পান 'ওকে' 'ওকে'। পরক্ষণেই দু'জনেই আবিষ্কার করেন এ শব্দ চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। তাদের নিরাপদ নির্ভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাচরণবাবু মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমা স্ত্রীর সুতীক্ষ্ণ হাসি এবং সেই আতঙ্কিত প্রশ্ন ওকে মস্তিষ্কের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, তার বুকের রক্তের সাথে ঠিক সমান তালে আর ঘরের গোলাকার ঘড়ির কাঁটা তাকে তালে তালে মনোরোমাকে দেখিয়ে বলতে থাকে 'ওকে' 'ওকে'।

গল্প শেষে দক্ষিণাচরণবাবুর কণ্ঠ এমন সময় রুদ্ধ হয়ে আসে তার ডাক্তারের ঘরের শিখাটা দপদপ করে নিভে যায় বাইরে আলো হওয়ার সাথে। পাখির ডাকে মহিষের গাড়ির শব্দে তিনি একেবারে সচেতন হয়ে উঠেন তার মুখের ভাব বদলে এতক্ষণ নিজের পূর্ব জীবনকাহিনি ডাক্তারের কাছে প্রকাশের লজ্জায় কোনো প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন না করে দ্রুত চলে যান। কিন্তু রাত্রে আবার তার সেই পুরনো রোগের সূত্রপাত হয়।

'নিশীথে' গল্পটি ভয় পার্থিব-অপার্থিব অনুভূতির সংমিশ্রণে রচিত। গল্প বক্তা নায়ক দক্ষিণাচরণবাবু নিজেই। অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধনে গল্পের প্রসারণ। গল্পে বক্তার দুটি সত্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দিনের আলোতে তিনি স্বাভাবিক আর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তিনি যেন এক গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে স্বকল্পরচিত 'অতিপ্রাকৃত' অনুভূতির বিভীষিকা তাকে দগ্ধ করতে থাকে। দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথমা স্ত্রী যদিও নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন তথাপি দক্ষিণাচরণের ভেতর এক গভীর অনুশোচনাবোধ তাকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মতো আঘাত করত। তিনি ভাবতেন হয়ত তিনিই স্ত্রীকে সে পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছেন। মূলত তার মানসিকতা তার নিজের কাছেই অস্পষ্ট। প্রথমা স্ত্রীর সুতীক্ষ্ণ হাসি এবং আতঙ্কিত প্রশ্ন দক্ষিণাচরণকে তাড়িয়ে বেড়াত।

'পয়লা নম্বর' গল্পে পাণ্ডিত্যের অহংকারে আত্মকেন্দ্রিক অদ্বৈতচরণ তার স্ত্রী অনিলার প্রতি ছিলেন একেবারে উদাসীন। বই পড়া ছিল তার একমাত্র নেশা। তার আয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো উপায়ের কথা উল্লিখিত হয়নি। তথাপি তিনি যা আয় করতেন খরচের একটি মাত্র খোলা ড্রেন ছিল সেটা বই কেনার দিকে। সংসারে আরো যাবতীয় খরচগুলো তার এই শখের বাইরে কেমন করে মিটত সেই রহস্য তার চেয়ে তার স্ত্রী বেশি জানতেন।

অদ্বৈতচরণের দ্বিতীয় নেশা ছিল বকুনি। প্রথম দিকে তা একা তার স্ত্রীকে শুনতে হলেও ক্রমেই অদ্বৈতচরণের দল ভারী হতে থাকে এবং দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায় নাম ধারণ করে। এই সম্প্রদায়ের কোনো সময় জ্ঞান ছিল না এমনকি রাজ্যের সব অনিয়মই তাদের নিয়ম। অদ্বৈতচরণ মাঝে মাঝেই এদের খেতে বলতেন এবং যার ভরসায় বলতেন তার সব রকম অবস্থাকে বরাবর তুচ্ছ জ্ঞান করেই বলতেন। আর তাই তার স্ত্রী অনিলাও মুখ বুজে নীরবে সব সম্পূর্ণ করে যেতেন।

স্বামী সন্তান নিয়ে সুখের সংসার অনিলার ছিল না। অনিলার পিতা মৃত্যুর পূর্বে তার ছোট ছেলেটিকে বিমাতার বা অদ্বৈতচরণের হাতে তুলে না দিয়ে নিজের কন্যার হাতে সমর্পণ করে যান। এতে করে অদ্বৈতচরণ খানিকটা বিরক্ত হয়ে কখনো অনিলার ছোট ভাই সরোজের খোঁজও নিতেন না। তিনি তার সম্প্রদায় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে হঠাৎ পাশের পয়লা নম্বর বাড়িতে রাজা সিতাংশুমৌলি নামে এক জনের আগমন ঘটে। তিনি নানা গুণে গুণী। এক সময় তিনি তার গুণের পসার দিয়ে দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়ের দ্বৈতগুলোকে খসিয়ে তার কাছে টেনে নেন। এমনকি তিনি অনিলাকেও প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু অনিলার এসবের প্রতি মোহ ছিল না তার একমাত্র ভাবনা ও দরদের স্থান ছিল পিতৃ-মাতৃহীন ছোট ভাই সরোজ। কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় বিমাতার কাছ থেকে লাঞ্ছনা সইতে না পেরে সরোজ আত্মহত্যা করে। সংসারের সাথে অনিলার যেটুকু বাঁধন ছিল সরোজের মৃত্যুতে তাও যেন আলগা হয়ে যায়। অনিলা তাই আর এ সংসারের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখার

প্রয়োজন মনে করেন না। স্বামী ও সিতাংশুর জন্য একটি কাগজে দুটো টুকরোয় তার নিরুদ্দেশের খবর জানিয়ে অসীম পৃথিবীতে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেন।

অদ্বৈতচরণের পাণ্ডিত্যের অন্তরালে যে অহংকার ছিল সেই অহংকারের কারণে সে কখনো নিজ স্ত্রীর ব্যক্তিসত্তাকে আমলে আনেননি। কখনো স্ত্রীকে বুঝার প্রয়োজনবোধ করেননি। অনিলা রহস্যের আবরণে ঘেরা এক প্রতিবাদী নারী। সে স্পষ্ট করে কখনো কিছু বলেননি বটে তবে তার চারিত্রিক স্তব্ধতার গভীরতা থেকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হয়েছে স্বামী-সংসারের প্রতি তাচ্ছিল্য। ভাইয়ের অপঘাতে মৃত্যু তাকে সংসারের প্রতি বিরূপ করেছে। সিতাংশুর যৌবনের উদ্দামতা এবং সুকুমার মানসিকতার অনুনয় তাকে কতটুকু আকর্ষণ করেছিল তা গল্পে সুস্পষ্ট নয়। তবে সিতাংশুর চিঠিগুলো অনিলার ভেতরের এক বিশেষ নারীসত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। স্বামীর সংসারের একঘেয়ে নিয়মের মধ্যে নিজেকে যেভাবে তিনি ডুবিয়ে রেখেছিলেন তা থেকে উত্তোরণের পথ খুঁজে নিতে আগ্রহী হয়েছেন। ছুটি নিয়েছেন এই নির্লিপ্ত জীবন থেকে। তবে আর কোনো মানুষের সংস্পর্শে নয় অসীম জগতে নিজেকে মেলে দিয়েছেন।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পের প্রধান চরিত্র কথক বা নায়ক সনৎকুমার। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র সনৎকুমারের ষোলো বছর বয়সেই তার মা পণ্ডিত মহাশয়ের শিশু কন্যা কাশীশ্বরীর সাথে বিয়ে ঠিক করেন। সনৎকুমারের মা স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করায় বিশেষত পণ্ডিত মহাশয়ের বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ডে রাগান্বিত হয়ে তিনি বিয়ে পণ্ড করে দেন। কৈশোরেই সনৎকুমারের হৃদয় স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়বার বাবা পুত্রের বিয়ে ঠিক করেন ব্রাহ্মণ কন্ট্রাক্টরের কন্যার সাথে। তখন সনৎকুমার বিশ বছরের এম.এ. পাশ করা শিক্ষিত যুবক। কাজেই বাবার পছন্দের সাথে তার পছন্দের মিল না হওয়ায় নিজের বিয়ে নিজেই ভেঙে দেন।

এ ঘটনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় পিতা পুত্রের মাঝে কলহ তর্ক। পিতা পুত্রকে স্বাবলম্বী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন। শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। মায়ের পাঠানো মানি-অর্ডারের মাত্র ঊনআশি টাকা দিয়ে কারবার শুরু করে পরবর্তীতে কারবারের মূলধন প্রায় বিশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। আর তাই ঘটকেরা তার পেছন ঘুরতে থাকে। পরের পাত্রী সমাজের আধুনিকা। এসময় সনৎকুমার সফল ব্যবসায়ী এ বিয়েতে তিনি নিজেই অগ্রণী থেকে আবার পিছিয়ে আসেন।

এরি মাঝে অভ্রের খনির খোঁজে ছোটোনাগপুরে গিয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের সাথে দেখা। পণ্ডিতমশাইয়ের সংসার নাতনিতে পরিপূর্ণ। সেখানে গিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন এ বৃদ্ধের তুলনায় তিনি কত নিঃসঙ্গ।

কাজেরই তাগিদে সনৎকুমারকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হয়। সেখানে ধনী বাঙালি মহাজন বিশ্বপতিবাবুর বরাত দিয়ে খোঁজ পান আরেক পাত্রীর। নাম তার দীপালি। বিধবা মায়ের একমাত্র কন্যা। সনৎ তাকে বিয়ে করার মনোস্থির করলে জানতে পারেন দীপালির পূর্বপ্রণয়ী বিশ্বপতিবাবুর মেজোছেলে শ্রীপতি। তাই সনৎকুমার নিজের ইচ্ছে ভেতরে চেপে তার গৃহে দীপালির সাথে শ্রীপতির বিয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে ধন-জনে সনৎকুমারের গৃহ ভরে ওঠে তবে বিশ্বপতির সাথে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

গল্পটি এগারো পৃষ্ঠা জুড়ে। নায়ক বা প্রধান চরিত্র সনৎকুমারের ষোলো বছর বয়স থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অংশের সাথে পরবর্তী অংশের একেবারে অবিচ্ছেদ্য সাদৃশ্য রক্ষিত হয়নি। প্রথম যৌবনে সঙ্গিনী নির্বাচনে সনৎকুমারের ইচ্ছে থাকলেও পিতার কারণে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে তাকে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত হতে দেখা গিয়েছে। পকেটের বোঝা ভারী করতে গিয়ে নিজের জীবনকেই তিনি মরুভূমিতে পরিণত করে ফেলেছেন। ভাগ্যের পরিহাসে প্রৌঢ়ে সনৎকুমারের সংসার না হলেও জীবন বিষণ্নতার ভারে ক্লান্ত হননি। বরং মিল ও অমিলের মাঝখানে পড়ে একরকম জীবনকে মেনে নিতে তাকে দেখা গেছে গল্পে।

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের আলোকিত চরিত্র বৈদ্যনাথ। গ্রামের মাঝে বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন বৈদ্যনাথ। বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের প্রতিই তার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। তাই যখন বিয়ে করেন তখন বিয়ের নববধূর মুখ অপেক্ষা ভবিষ্যৎ নবকুমারের মুখই তার সামনে ভেসে উঠেছিল। অতি পাকা লোক ছিলেন বলেই প্রেমের পরিবর্তে পিণ্ডটাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু পাকা লোকও ঠকে। কেননা সংসার জীবনের শুরুতেই বিনোদিনী সন্তান জন্ম দিতে পারলেন না। বৈদ্যনাথ বিমর্ষবোধ করতে লাগলেন। তার বিশাল সম্পদ ভোগ কে করবে সেই চিন্তায় তিনি জীবিত অবস্থায় তার সম্পদ ভোগ করা থেকে এক প্রকার বিরত রইলেন।

অন্যদিকে তরুণী স্ত্রী বিনোদিনী স্বামীর স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবলই পরিবারের গুরুজনদের দ্বারা লাঞ্ছনার শিকার হতে লাগলেন। সকলেই তাকে বন্ধ্যা বলে সাব্যস্ত করলেন। তাই বিনোদার একটুখানি আনন্দের একটু অবকাশের জায়গা ছিল তার প্রতিবেশিনী সখী কুসুমের বাড়ি। সে প্রায়ই কুসুমের সাথে তাস খেলার জন্য সেখানে যেতেন। একসময় কুসুমের যুবক দেবর নগেন্দ্রর সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে যায়। কিন্তু একদিন কুসুমের অনুপস্থিতিতে বিনোদার সাথে নগেন্দ্র অসংযতপূর্ণ আচরণ করে ফেলেন। আর সেইখানে সেই মুহূর্তেই বিনোদার বাড়ি দাসীর আগমন ঘটে। এরপর ঘটনা যা নয় তাও সকলের কানে ওঠে। বিনোদার স্বামী তাকে কলঙ্কিনী সাব্যস্ত করে গৃহ থেকে বেড়িয়ে যেতে বলেন। বিনোদিনী সেই রাত্রেই বৈদ্যনাথের গৃহ ছেড়ে বেড়িয়ে যান কিন্তু তিনি তখন জানতেন না যে তার গর্ভে বৈদ্যনাথের সন্তান ধারণ করেছেন।

দেখতে দেখতে দশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। বৈদ্যনাথের অবস্থার আরো উন্নতি দিকে ধাবিত হয়। তিনি কলিকাতায় বিশাল বাড়ি কিনেছেন। একে একে তিনি আরো তিনটি বিয়ে করেছেন। কিন্তু তার বাড়ি শূন্য। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে বৈদ্যনাথ একটি প্রচুরব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তাতে বহুদিন যাবৎ বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলতে লাগল। এদিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হয়ে উঠেছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসে ভাবছিলেন তার অন্ন কে খাবে তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থলীর দিকে চেয়ে ভাবছিল তারা কী খাবে। এমন সময় একটি অতি শীর্ণকায়া নারী বৈদ্যনাথের গৃহে প্রবেশ করে তার ছেলের জন্য কিছু খাদ্য চাইলেন। আর তখনই বৈদ্যনাথের নির্দেশে গুরুদয়াল এসে 'বালক' ও তার মাকে তাড়িয়ে দিল। মূলত সেই নিরন্ন ক্ষুধার্ত বালকটিই ছিল বৈদ্যনাথের পুত্র। অন্যদিকে একশত স্বাস্থ্যবান ব্রাহ্মণ ও তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির মিথ্যা ছলনায় প্রলুব্ধ করে তার অন্ন খেতে লাগলেন।

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমাজ ও ধর্মকে এমনভাবে নাড়া দেয়া সংকীর্ণতা বিরোধী রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষুদ্রতা একজন মানুষকে কতখানি মূঢ়তায় আবদ্ধ করে রাখতে পারে বৈদ্যনাথ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গল্পে উল্লিখিত হয়েছে বৈদ্যনাথ বিজ্ঞ ব্যক্তি। তবে তার বিজ্ঞতা মনুর বিধানের বিজ্ঞতা। যা মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে শ্রদ্ধাশীল নয় শুধু শাস্ত্রের নিয়মে আবদ্ধ । আর সে কারণে বিনোদিনীকে একজন সজীব মানুষের পরিবর্তে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া তার পক্ষে আর কিছু ভাবা সম্ভব হয়নি। সেই জন্য বিনোদিনীর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তার কোনো ভূমিকা ছিল না, কেননা তার মনুর বিধানে সে সবের স্থান নেই। তাই পরিশেষে বলা যায় প্রাচীন সমাজ জীবনের বহু সঞ্চিত হীনতা ও ক্ষুদ্রতাকে আঁকড়ে বৈদ্যনাথ হয়ে উঠেছে আত্মঘাতী মূঢ় চরিত্র।

'পোস্টমাস্টার' গল্পের নায়ক উলাপুর গ্রামের দরিদ্র পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। কিন্তু পল্লীতে এসে ঠিক পল্লীর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য হওয়ায় তিনি নিজে রেঁধে খান। এবং গ্রামের একটি বার-তের বছরের অনাথা বালিকা পেট-ভাতের বিনিময়ে তার কাজ-কর্ম করে দেয়। সে সূত্রেই ধীরে-ধীরে বালিকা রতনের সাথে তার একটা অপত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টার অবসরে রতনকে ডেকে তার পরিবারের পরিজনদের গল্প শুনিয়েছেন এবং রতনকে পড়তে শিখিয়েছেন। এক বাদলার দিনে পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়লে রতন তাকে জননীর মতো সেবা করেছে। যেন বালিকা রতন আর বালিকা থাকল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করে নিল।

অসুখ সেরে যাবার পর পোস্টমাস্টার কলিকাতায় বদলি হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় চাকুরি ছেড়ে কলিকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে রতন তার সাথে যেতে চায়। কিন্তু পোস্টমাস্টার অস্বীকৃতি জানালে রতন

একেবারে ভেঙে পড়ে। পোস্টমাস্টার বার-বার সান্ত্বনা দিয়ে নতুন পোস্টমাস্টারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে অভিমানী রতন কেঁদে বুক ভাসায়। এমনকি যাত্রাকালে পোস্টমাস্টারের কিছু অর্থ সাহায্য ও সে প্রত্যাখান করে। তখন এক মুহূর্তের জন্য পোস্টমাস্টারের মনে রতনকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা উদয় হলেও পরমুহূর্তেই আবার তার মনে হয় পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হয়নি সে বার-বার আশা করেছে হয় তো দাদাবাবু আবার ফিরে আসবে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটি বাৎসল্যরসে মণ্ডিত ক্ষুদ্র কাহিনিসম্পন্ন একটি গল্প। নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলেই পোস্টমাস্টার গ্রামে এসে কারো সাথে ঠিক ভালোভাবে মিশতে পারতেন না। অপরিচিত স্থানে তার ভেতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতাবোধ এবং আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্য লাভের বাসনা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই স্নেহাকর্ষণে সে নির্জন পল্লীতে রতনকে আপন করে নিয়েছিলেন। রতনের সাথে তার আর্থিক ও সামাজিক পার্থক্য ছিল যদিও তবু বাৎসল্য প্রীতির ক্ষেত্রে পোস্টমাস্টারের দিক থেকে সে পার্থক্য কোনো বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু বার-তের বছর বয়সী রতনের মানসিকতার দিক থেকে একটি সূক্ষ্ম বাঁধা ছিল যা রতন নিজেও সুস্পষ্ট জানত না। পোস্টমাস্টারের সন্ধ্যাগুলো কাটত রতনকে পড়িয়ে ও নিজের পরিবার-পরিজনদের গল্প রতনকে শুনিয়ে। তাই প্রতিদিন রতন দ্বারে বসে অপেক্ষা করত, পোস্টমাস্টার না ডাকলে সে ঘরে আসত না এমনকি এক ডাকেও আসত না। এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রতনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল আদিম নারীসত্তা। যা পরিণতিতে অবর্ণনীয় দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। পোস্টমাস্টারের বাৎসল্যপ্রীতি এবং রতনের ভালোবাসা গল্পে একটি উদাস সকরুণ পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। অবোধ বালিকার অশ্রুসজল আর্তি ও অব্যক্ত মর্মব্যথা পাঠক হৃদয়কে বেদনার্ত করে তুলেছে।

'প্রগতিসংহার' গল্পটি ঘর-সংসারের ছোঁয়াচ বর্জিত। গল্পের শুরুতেই কলেজের ছাত্রী সুরীতির যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা অনমনীয়। পুরুষের মন ভোলানোর জন্য শুধু নারীরা সাজবে, সালংকারা হবে এ যেন সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই সে ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'নারী প্রগতিসংঘ'। ছাত্ররা শুরু থেকে এ সংঘের বিরোধীতা করেছিলেন এবং এ দলের পাণ্ডা যে ছিলেন তার নাম নীহাররঞ্জন। সুরীতিকে প্রতি পদে-পদে হেনস্থা করাই ছিল তার প্রধান কর্ম। তাই ছেলেতে-মেয়েতে সম্পর্ক একেবারে অহি-নকুল পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এরি মাঝে একবার নীহার বান্ধবী সলিলার পরামর্শে সলিলার টাকায় এখানে পড়ায় বিরতি দিয়ে দার্জিলিং-এ চলে যান পড়াশোনার জন্য। সেখানে সলিলার মৃত্যুর পর সুবিধা করতে না পেরে আবার চলে আসেন কলকাতায় পড়াশোনার জন্য। এমন সময় সরবন ইউনিভার্সিটির এজন ভারত প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ আসে। এই সুযোগে নীহারের

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রী সকলেই তার অনুগত হয়ে যান, এমনকি অনুরক্ত হয়ে পড়েন সুরীতি নিজেও। এরপর থেকে নীহারকে অবজ্ঞা করার সাহস আর কারো হয়না। এমনকি রক্ষা হয় না প্রগতি সংঘের নিয়ম-কানুন। সবার আগে সে নিয়ম ভাঙেন সুরীতি, রঙ লাগে তার আঁচলে। অন্যান্য মেয়েরা নীহারকে বই, টেবিল ঢাকা, নানা উপহার দিয়ে সামাজিকতা করতে থাকেন, এদিকে আফসোস হয় সুরীতির কেননা এত সহজে নীহারের সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না বলে।

একদিন নীহারের ফাউনটেনপেনটি মেঝেতে পড়ে যাওয়ায় এবং সবার আগে সেটা তুলে দিয়ে সুরীতি নীহারের সাথে সম্পর্কটাকে সহজ করার চেষ্টা করেন। এর থেকে বড় অবনতি সুরীতির আর কোনো দিন হয়নি। এরপর থেকে নীহারের মতামতকে সমর্থন করা, তার কাছে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করা সুরীতির পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে সুরীতি মনের টান নীহারের প্রতি দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকে। একবার কোনো রকমে তাদের বিয়ের ইঙ্গিত দেয়ায় নীহারের দিক থেকে সেটা নাকচ হয়ে যাওয়ার পরও সুরীতি নীহারের প্রতি দুর্বলতা কমাতে পারেননি। নীহারের পড়বার বই, নতুন খদ্দরের থান, নানান শখের জিনিস কিনে নিজের ক্ষতিতেই সুরীতি আনন্দ পেতেন। তিনি জানতেন নীহারের মন ভোলানোর কোনো বিদ্যা তার জানা নেই। তাই অন্য মেয়েদের পেছনে ফেলতে এই ত্যাগ স্বীকার মেনে নেন তিনি।

প্রতিদিনের কৃচ্ছ সাধনায় সুরীতি স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ধরা পড়ে তাকে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়রোগে পেয়েছে। আত্মীয়রা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। আর এতসব নীহারের জন্য হওয়া সত্ত্বেও নীহার কখনো সুরীতিকে একটু চোখের দেখা দেখতে যান না। সুরীতি উৎসুক হয়ে থাকতেন আর নিরাশ হতেন। তার গোপন গচ্ছিত টাকা থেকে নীহারের জন্য বরাদ্দ টাকা মাঝে মাঝে পৌঁছে যেত। অবশেষে সুরীতির টাকা থলি শূন্য হওয়ার সাথে সাথে তার আত্মনিবেদন ও নিঃশেষে শেষ হয়ে যায়।

‘প্রগতিসংহার’ গল্পটিতে কলেজ পড়ুয়া অল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের ছেলেমানুষি স্থান পেলেও তাতে প্রধান হয়ে উঠেছে একটি মেয়ের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। নায়িকা সুরীতিকে প্রথমদিকে খানিক নারীবাদী হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও গল্পের শেষে হঠাৎ নীহারকে কেন্দ্র করে তার ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সুরীতি হাজারো জিনিস উপহার দিয়ে নীহারের মাঝে নিজের জন্য একটু ভালোবাসা জাগানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ জ্ঞানদাম্ভিক নীহারের কাছে এসবের কোনো মূল্যই ছিল না নিজের সুবিধাটুকু ছাড়া। নিষ্ঠুর নিরেট নীহারকে যথোপযুক্ত ঘুষ দিয়ে নিজের সাথে বেঁধে রাখতে পারেননি সুরীতি। তাই আত্মপীড়নের ভেতর দিয়েই

সুরীতির আত্মসমর্পণ নিঃশেষিত হয়েছে। লেখক তাঁর লেখনী জীবনের বহু দিনের অভিজ্ঞতায় বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। নীহার তাঁর আরেক অদ্ভুত সৃষ্ট চরিত্র, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

'প্রতিবেশিনী' গল্পের নায়ক গল্পের বক্তা। নায়কের প্রতিবেশিনী ছিলেন এক বাল্যবিধবা নারী। নায়কের মনের ভাবনা সেই মেয়েটি প্রতি প্রেমময় হলেও তিনি পূজা ছাড়া অন্য কোনো সহজ ভাষায় তা প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। নায়ক তার এই ভালোবাসাকে ভেতরে গোপন করে বাহিরে নিজের কাছে ও অন্যের কাছে নির্মল হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই তীব্র আবেগ আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, তার বন্ধু নবীনমাধবের প্রেমের কবিতাকে কেন্দ্র করে তা অবিরাম গতিতে বেড়িয়ে এসেছে। বন্ধুর নতুন নতুন রচনার সহায়তাকাজে তিনি অনেক স্বস্তি পেতেন। নবীনমাধবের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি তার রুদ্ধ আবেগ ভালোবাসা প্রয়োগ করতে লাগলেন। আনাড়ি নবীনের লেখা এমন ভাবে সংশোধন করতে লাগলেন যে প্রায় পনের আনা লেখাই তার হয়ে দাঁড়াল। বন্ধু নবীন যখন কবিতাগুলো নিজের নামে প্রকাশ না করে তার নামে প্রকাশের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তখন নায়ক তাকে বাধা দিয়েছিলেন। বরং এই কবিতাগুলোর রচয়িতা যে নবীন তিনি যে কেবল সংশোধন করেছেন সেই ধারণাটি নবীনের মনে দৃঢ় করে তুলেছিলেন। কাজেই নবীনের মাঝেও সেই বোধটি দানা বেঁধে উঠেছিল। অন্যের জিনিসকে সে একান্ত নিজের বলে ভাবতে পেরেছিলেন।

নায়ক তার অভ্যাসবসত পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে লক্ষ রাখতেন তার সেই ব্রহ্মচারিণীর একটুখানি দর্শনলাভের আশায়। কিন্তু সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে প্রতিবেশিনীর দৃষ্টিতে যে ব্যাকুলতা দেখতে পেলেন সেই ব্যাকুলতা স্বর্গের দিকে নয় মানবহৃদয়নীড়ের দিকে। সেদিন থেকেই নায়ক বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলেন। নবীন তার এই সংকল্পের কথা শুনে প্রথমে তর্ক জুড়ে দিলেও পরবর্তীতে বিধবাবিবাহের পক্ষে সকল যুক্তি মেনে নেন। এবং নায়কের প্রতিবেশিনীর ভাইয়ের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশিনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সপ্তাহখানেক পরে নবীন কথককে জানান যে যদি সে অর্থসাহায্য করতে রাজি থাকেন তাহলে একজন বিধবাকে সে নিজে বিয়ে করতে প্রস্তুত। নায়ক আনন্দিত চিত্তে নবীনকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে তারই লেখা কবিতা দিয়ে, তারই দেয়া যুক্তি দিয়ে তারই প্রতিবেশিনীকে নবীন বিয়ে করতে যাচ্ছে।

'প্রতিবেশিনী' গল্পে দুই বন্ধুর বিধবাকেন্দ্রিক প্রেম চিত্র অংকিত হয়েছে। গল্প কথক তার প্রতিবেশিনীকে নিজের অজান্তেই ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই গভীর আবেগকে নির্মলতার আবরণে ঢেকে তাকে পুজো করে গর্ববোধ করতেন। যার কারণে সেই বিধবাকে বিয়ে করার চিন্তা তার ভেতরে জন্ম নেয়নি, যদিও তিনি বিধবা

বিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন। অপরদিকে তার বন্ধু নবীন ছিলেন অধিক বাস্তববাদী, তাই সে বিধবা মেয়েটির দাদার সাথে সম্পর্ক করে মেয়েটির কাছে পৌঁছানোর উপায় উদ্ভাবন করে, অবশেষে তাকে নানা যুক্তি দেখিয়ে বিয়েতে সম্মতি দানে বাধ্য করেছেন।

'প্রতিহিংসা' নিরব,সুগম্ভীর ও অভিজাত প্রতিশোধের গল্প। একসময় মুকুন্দবাবু তার অল্প কিছু বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার ভার উচ্চকুলমর্যাদাসম্পন্ন পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। গৌরীকান্তের অতি যত্নে মুকুন্দবাবুর অল্পসম্পত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি নিজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি অল্পমূল্যে বাঁকাগাড়ি পরগনা ক্রয় না করে মুকুন্দবাবুকে ক্রয় করে দিয়েছিলেন, মুকুন্দবাবুকে জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। মুকুন্দবাবু ছিলেন নিঃসন্তান, বিনোদ তার পোষ্যপুত্র। মুকুন্দবাবুর পোষ্যপুত্র বিনোদবিহারী জমিদারি দেখাশোনা করেন না। এদিকে দেওয়ান গৌরীকান্ত মৃত্যুর পূর্বে মনিবের জমিদারি দেখাশোনার জন্য নিজপুত্র রামকান্তকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি কুলীন অনাথ অম্বিকাচরণকে নিজ অর্থে লেখাপড়া শিখিয়ে লালন-পালন করে তাকে জমিদারি দেখাশোনার ভার অর্পণ করেন।

মাঝে মুকুন্দবাবু তার পোষ্যপুত্র বিনোদের সাথে গৌরীকান্তের পৌত্রী ইন্দ্রাণীর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুকুন্দবাবুরা কুলে গৌরীকান্তের সমান না হওয়ায় কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও গৌরীকান্ত এ বিয়েতে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। ফলে জমিদার মুকুন্দবাবু মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন গৌরীকান্তের এ স্পর্ধায়। কিন্তু পরবর্তীতে গৌরীকান্তের চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সাথে নয়নতারার বিবাহ হয়। এবং গৌরীকান্ত তার নাতনি ইন্দ্রাণীর বিয়ে দিয়েছিলেন কুলীন অনাথ অম্বিকাচরণের সাথে।

বর্তমানে মুকুন্দবাবু ও গৌরীকান্ত কেউ বেঁচে নেই। জমিদারদের বাড়ির এক বিয়ের অনুষ্ঠানে অসময়ে ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী উপস্থিত হন। তার দেরিতে বৌভাতের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কারণ জমিদাররা কুলে তাদের চেয়ে নিচু। কিন্তু জমিদার গৃহিণী নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে গৃহকাজের চাপ, শারীরিক অস্বাস্থ্য নানান কথা বলেন। মূল কারণ ইন্দ্রাণী গোপন করলেও তা বোঝার কারো বাকি ছিল না। নয়নতারার কাছে ইন্দ্রাণীর সব কিছু অসহনীয় মনে হতে থাকে প্রথমত ইন্দ্রাণী বহুঅলংকার পরে সুসজ্জিত হয়ে এসেছিলেন, দ্বিতীয়ত তার রূপ, তৃতীয়ত তার স্থির অবিচলতা সবকিছু মিলিয়ে ইন্দ্রানীর উপর শুরু থেকে নারীসুলভ অবজ্ঞা করতে থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী অটল গাম্ভীর্যে তার একটিও গায়ে বিঁধতে দিলেন না।

এরপর ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে সব জানালেন বটে তবে অম্বিকা যখন কাজে ইস্তফা দিতে মনোস্থির করলেন তখন নিজ পিতামহের কথা স্মরণে রেখে ইন্দ্রাণী অম্বিকাকে কাজে ইস্তফা দিতে দিলেন না। অন্যদিকে নয়নতারা স্বামী বিনোদের কান ভারী করে তুললেন ইন্দ্রাণী এত অলংকারের উৎস কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে অম্বিকাকে

অনেকটা চোর সাব্যস্ত করলেন। এদিকে বিনোদ দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় সবার কথাই বিশ্বাস করতেন। তাই অম্বিকাচরণকে তিনিও সন্দেহ করতে লাগলেন। এ বিষয়ে গৌরীকান্তের দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে বামাচরণ অম্বিকাচরণের নামে সবচেয়ে বেশি কথা বিনোদের কানে দিতে লাগলেন। এছাড়াও অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে সকল কর্মচারী তার উপর ক্ষেপে ছিলেন।

যাই হোক বিনোদ বিষয়সম্পত্তির কখনো খোঁজখবর নিতেন না। কেবল হঠাৎ হঠাৎ নতুন নতুন ব্যবসার চিন্তা মাথায় উদয় হলে খাজাঞ্চিকে ডেকে তহবিলে কতটাকা আছে তা জেনে, এমন ভাবে খাজাঞ্চির কাছে সই দিয়ে টাকা নিতেন যেন তিনি অন্যের টাকা নিচ্ছেন। এরপর অম্বিকাচরণ বিপদে পড়তেন আমানতি সদর-খাজনা, আমলাবর্গের বেতন দিতে গিয়ে। কিন্তু বিনোদকে এ বিষয়ে কথা বলা কোনো উপায় ছিল না কেননা টাকা নিয়ে তিনি কেবল চক্ষুলজ্জার কারণে অম্বিকার মুখোমুখি হতেন না। মাঝে অম্বিকা ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। এ সময়ে তার অবর্তমানে বামাচরণের প্রেরণায় বিনোদ নতুন চাবি বানিয়ে অম্বিকার প্রাইভেট ডেস্ক খুলে তার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে নিয়ে যান। এ ঘটনায় চরম অপমানে অম্বিকা কাজে ইস্তফা দিতে যাবেন এমন সময় আরেক অঘটন ঘটে। বিনোদ একটার পর একটা ব্যবসা করতে গিয়ে গোপনে নানা স্থান থেকে টাকা নিয়ে আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত। অন্যদিকে বাঁকাগাড়ি পরগনা অনেকদিন থেকে পার্শ্ববর্তী জমিদারের কাছে রেহেনে আবদ্ধ ছিল। সে জমিদার টাকার জন্য তাগাদা না দিয়ে সুদ জমতে দিয়েছেন। আর এখন সুযোগ বুঝে হঠাৎ ডিক্রি করে নিতে উদ্যত হয়েছেন। এ বিপদের কথা শুনে অম্বিকার আর চাকুরি ছাড়া হলো না। বিনা তহবিলে কোনো অর্থ ছিল না বিনোদ আগেই খরচ করেছিলেন। তাই শেষে বিনোদ এই মহাবিপদে নয়নতারার দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু নয়নতারা স্বামীকে কোনোরূপ সাহায্য করলেন না, তার সমস্ত অলংকারকে তিনি শেষ অবলম্বন জ্ঞান করে স্বামীকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তার পিতামহের দানের কথা স্মরণে রেখে তার সকল অলংকার দিয়ে বাঁকাগাড়ি পরগনা আবার ক্রয় করলেন। এবং উন্নত শিরে গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন।

নীরব সুগম্ভীর অভিজাত প্রতিশোধের গল্প ‘প্রতিহিংসা’। যদিও জমিদার ও দেওয়ানের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তথাপি পারিবারিক জীবনভিত্তিক হওয়ায় নারী প্রাধান্য পেয়েছে। তাই গল্পটি আবর্তিত হয়েছে নায়িকা ইন্দ্রাণীকে বিন্দুতে রেখে। ইন্দ্রাণী কুলমর্যাদায় উচ্চ, রূপসী, ব্যক্তিত্বময়ী, এবং তার আচরণে এমন একটি অবিচলতা ছিল যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই সংকীর্ণমনা নয়নতারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যতবারই তাকে হেয় করার চেষ্টা করেছে স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণী তাকে কৌশলে পরাজিত করেছে। নয়নতারা আচরণে সে কষ্ট পায়নি বিষয়টি তা নয় তবে তার গাম্ভীর্যতা থেকে প্রতি মুহূর্তে যা ধ্বনিত হয়েছে তা যেন এই নয়নতারার তাচ্ছিল্য এতটুকু স্পর্শ করতে পারে না তাকে। এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীকে নয়নতারার উপর আরো

চরম প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। জমিদারদের ভিক্ষুক করে দাঁড় করিয়েছেন ইন্দ্রাণীর স্বামী অম্বিকাচরণ ও ইন্দ্রাণীর সামনে। স্বামীর জন্য যে ত্যাগ নয়নতারা করতে পারেনি সে ত্যাগ ইন্দ্রাণী করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে বাঙালি ঘরের নির্যাতিতা নারীর ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বিন্ধ্যবাসিনী ধনী ঘরের কন্যা। এবং বিয়ের পর অলস কর্মবিমুখ স্বামী অনাথবন্ধুকে নিয়ে পিতার আশ্রয়েই থাকতেন। অনাথ তার স্ত্রীকে রূপে গুণে তার যোগ্য মনে না করলেও স্বামীর প্রতি বিন্ধ্যর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। ঘরজামাই স্বামী গর্বে তিনি ছিলেন গর্বিত। সকল স্ত্রীর স্বামীদের চেয়ে তার স্বামী সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা অনাথের ও বিন্ধ্যর যেমন বদ্ধমূল ছিল তেমনি অন্য সাধারণ লোকেরও তাই ধারণা ছিল। যদিও অনাথ কলেজে পড়া অবস্থায় পরীক্ষা না দিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে পরীক্ষায় দেশের গো-গর্দভ পাস করে সে পরীক্ষায় তিনি আর অংশগ্রহণ করে কি মর্যাদা বাড়াবেন–বিন্ধ্য তাই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মানতে পারেননি পিতৃনিন্দা। অনাথ শ্বশুরগৃহে থেকেও আবার তারই নিন্দা করতেন। এ অবস্থায় লজ্জিত বিন্ধ্য নিজের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু অনাথ তার গৃহের দরিদ্রতার মধ্যে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিলেন না তথাপি স্ত্রীর দৃঢ়তায় বাধ্য হয়ে গৃহে ফিরে যান। সেখানে বিন্ধ্য ও অনাথ ক্রমান্বয়ে অনাথের বৌদি শ্যামাশঙ্করীর বিষবাক্যের লক্ষ্য হন। এ অবস্থায় অনাথ আবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরতে চান কিন্তু বিন্ধ্য রাজি হন না। তখন অনাথ তার বিলেতে যাওয়ার বাসনার কথা ব্যক্ত করে স্ত্রীকে বলেন তার পিতার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে। এতেও বিন্ধ্য রাজি হন না। পরবর্তীতে পূজা উপলক্ষে কন্যা-জামাতা শ্বশুরগৃহে আমন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার পর অনাথ তার শ্বশুরের টাকা এবং শাশুড়ির অলংকার চুরি করে বিলেত চলে যান। সেখানে গিয়ে অনাথ বহু ইংরেজকন্যার পাল্লায় পড়ে নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করলেও অর্থের অভাবে বিন্ধ্যকে স্মরণ করতে কখনো লজ্জিত হতেন না।

অবশেষে বিন্ধ্যর ব্যারিস্টার স্বামী দেশে ফিরে পল্লীর গৃহে আশ্রয় না নিয়ে হোটেলে আশ্রয় নিলেও বিন্ধ্য তার স্বামীর উপর বিরক্ত না হয়ে তার বাহ্যিকরূপে বিমোহিত হন। অনাথের ক্রমান্বয়ে পকেটের ও চেহারার জৌলুসতার ঘাটতি হতে থাকে। এমন সময়ে বিন্ধ্যর ভাতৃবিয়োগে রাজকুমারবাবু গভীর শোকে অনাথকে প্রায়শ্চিত্ত করার অনুরোধ করেন। এবং নির্দিষ্ট দিনে প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে বিন্ধ্যর গৃহে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর দ্বারবান রাজকুমারবাবুর হাতে একটি কার্ড দিয়ে একজন ইংরেজ মহিলার আগমন বার্তা জানান। রাজকুমারবাবু কার্ড পড়ে চমকিত হয়ে অর্থ উদ্ধার করা আগেই হঠাৎ মেমের উপস্থিতিতে সভা নীরব হয়ে যায়। এমন সময় অনাথ অন্তঃপুর থেকে সভায় প্রবেশ করলে তার মেম স্ত্রী দাম্পত্যের অভ্যাসবশত তকে আলিঙ্গন করে ওষ্ঠাধর চুম্বন করেন। সেদিন সভাগৃহ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আর কোনো তর্ক ওঠে না।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটিতে নারী লাঞ্ছনার কাহিনি বর্ণনার সাথে সাথে লেখক সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীনিগ্রহের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে এবং বিন্ধ্যবাসিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি নারীর নির্বিচার পতিভক্তি মূলত আত্মঅবমাননার শামিল। নারীনিগ্রহে শুধু যে পুরুষেরাই এগিয়ে আছে তা নয়, নারীরাও যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রণী সে বিষয়টিও উঠে এসেছে। বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মমর্যাদাবোধ তাকে মাঝে মাঝে সক্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আবার কখনো কখনো স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসার কারণে তাকে নিঃষ্পেষিত হতে হয়েছে। লেখক হঠাৎ হঠাৎ তাকেও ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন। গল্পের একদিকে নারীর প্রতি অবহেলা অন্যদিকে পুরুষের আত্মম্ভরিতা। অনাথবন্ধু চরিত্রটি অকৃতজ্ঞ হলেও ইতর থেকে আলাদা। সংসারের সকল বিষয়কে তুচ্ছ, অন্যের প্রতি অবহেলা এবং শুধুমাত্র নিজ অভিমতের মূল্যায়ন তাকে মূলত এক সংকীর্ণ গণ্ডির মাঝে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর এ কারণেই অনাথবন্ধু পাঠকের কাছে বিরক্তির কারণ না হয়ে বিদ্রূপের পাত্র হয়েছেন। প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গে তিনি যেন তার সমাজকে অনেকটা অনুগ্রহ করেছেন। এবং সবশেষে তার মেম স্ত্রীর উপস্থিতির মাধ্যমে গল্পকার চরম বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

'বদনাম' গল্পটি স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে লেখা রবিঠাকুরের সর্বশেষ গল্প। গল্পে যে বিপ্লবী অনিলকে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর বিজয়বাবু কারাগারে পাঠানোর জন্য জোর তদারকি করছিলেন, সেই স্বদেশীকে গোপনে সাহায্য করছিলেন তারই স্ত্রী সৌদামিনী। অনিলের সাথে ভাই বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে ভাই-ফোঁটা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে অনিলের আদর্শে রূপান্তরিত করেছিলেন। অনিলকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিসী সকল কূট-কৌশলের কথা সময়মতো তাকে জানিয়ে গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি গৃহে বিজয়বাবুর উপস্থিতিতেও কুকুরকে খাবার দেবার নাম করে অনিলকে তিনি খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু স্ত্রীকে জানান সম্প্রতি নিতাই নামক এক চর মারফত জানা গেছে মোচকাঠি জঙ্গলে তাদের সভার কথা। সেই মোতাবেক জঙ্গল ঘেরাও করে সারারাত অপেক্ষা করে শুধুমাত্র তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হন একটি চিরকুট। সেই সাথে তিনি স্ত্রীকে আরো জানান যে, অনিল তার দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে ভোর রাত্রিতে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে, গ্রামের অনেকেই তা স্বচক্ষে দেখেছে। সেই থেকে অনিল গ্রামের লোকের কাছে সিদ্ধপুরুষ। ওর গা স্পর্শ করে হিন্দুর ঘরে এমন কেউ নেই। একবার এক দারোগা হিজলাকান্দির দাঙ্গার পর অনিলকে গ্রেপ্তার করেছিল, সপ্তাহ না ঘুরতেই ওর স্ত্রী বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকে অনিলের প্রতি গ্রামের লোকের ভক্তি আরো বেড়ে যায়। পুলিসের গুপ্তচরেরা বিজয়বাবুকে জানিয়ে ছিলেন কোনো এক নারী অনিলকে তাদের সব গতিবিধির কথা ফাঁস করে থাকেন। বিজয়বাবু বুঝে উঠতে পারেননি কে সেই মানবী। একবার তার স্ত্রী কেবলমাত্র কথা প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে জানিয়েছিলেন দেশের কত লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে আর যারা সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ তাদের হাতে হাতকড়ি

পড়ানো হচ্ছে। নারীরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছে সতীসাধ্বীগিরি। তার চেয়ে অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারে তাহলেই নারীদের রক্ষা।

অবশেষে শিবরাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অনিলের তল্লাশিতে গিয়ে যখন ইন্‌স্‌পেক্টর নিজের স্ত্রীকে দেখেছিলেন তখন বিস্ময়াভূত হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন সৌদামিনীর কণ্ঠে কোন কৌতুক নয় ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করে স্বামীকে জানিয়েছেন।

দৃশ্যের শেষের দিকে নায়ক অনিল মুখ খুলেছেন। তিনি বিজয়বাবুকে জানিয়েছেন বটে আজ ধরা দিতেই তিনি এই মন্দিরে এসেছেন সেই সাথে এটি জানাতে ভোলেননি যে কোনো কারাগার তাকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারবে না। জোর দিয়ে বলেছেন আর পনের দিন বাদেই এই বিপ্লবীর পালিয়ে যাওয়ার খবর সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হবে। আর তাই মন্দিরের ভিত থরথর করে কাঁপিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন রবি ঠাকুরের বাঁধন ভাঙার সেই বিখ্যাত গান।

স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ গল্প 'বদনাম'। এ গল্পে ব্রিটিশ বিদ্রোহী মনোভাব রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে নারী চরিত্রেও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, গল্পে সৌদামিনী চরিত্রটি সেই সাক্ষ্য বহন করছে। কৌতুকের আবরণে ঢেকে অনিল ও সৌদামিনী চরিত্র দুটো উপস্থাপিত হলেও দুটো চরিত্রই বিপ্লবী কর্মতৎপরতায় ভরপুর। গল্পে বিপ্লবী নায়ক অনিলকে জনমনের জনপ্রিয় করে তুলতে ধর্মীয় ভঙ্গিতে ধার্মিক করে তোলা হয়েছে। যার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরকারী পুলিশেরাও অনিলের ভক্তবৃন্দে পরিণত হয়েছে। সৌদামিনী ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর স্ত্রী হয়েও দেশ বিদ্রোহীকে সাহায্য করেছেন কোনো সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ভীত না হয়ে। এবং দেশমাতৃকার সেবায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অনিল ও সৌদামিনী নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেননি।

'বিচারক' গল্পটি শুরু হয়েছে বিগত যৌবনা এক পতিতা ক্ষীরোদার লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে। ক্ষীরোদার অনেক গ্লানিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অবশেষে গতযৌবনা অবস্থায় যে পুরুষের আশ্রয় পেয়েছিলেন তাকে সেও জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে চলে যান। ক্ষীরোদা তখন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে মেঝের উপর মাথা খুঁড়তে থাকেন। সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়ে থাকেন। যখন ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় মা মা করে কাঁদিতে শুরু করে তখন ক্ষীরোদ রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপ্রণে বক্ষে চেপে ধরে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রতিবেশীগণ ক্ষীরোদাকে রক্ষা করলেও তার পুত্রটিকে বাঁচাতে পারেননি। তাই হত্যার অপরাধে তাকে সেসনে চালান করে দিলে পরবর্তীতে তার ফাঁসির হুকুম হয়।

মূলত ক্ষীরোদা ছিলেন ভদ্রঘরের কন্যা, বাল্যবিধবা। নাম ছিল তার হেমশশী। পিতা-মাতা ছোটো ভাইদের নিয়ে তাদের সংসার। বিধবা বলেই অধিক উৎসুক ছিলেন সাংসারিক জীবনের প্রতি। কোমলমতি এই বিধবার উপর লালায়িত দৃষ্টি পড়ে ভণ্ড মোহিতের। তিনি বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামে হেমশশীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। একদিন গভীর রাতে হেমশশী ঘরছাড়েন তার সাথে, কিন্তু অল্পক্ষণেই বিনোদের আসল রূপ প্রকাশিত হয়। হেমশশী বারংবার তাকে তার গৃহে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েও নিরাশ হন। অবশেষে কিছুদিন পর হেমশশীকে একলা ফেলে বিনোদ পালিয়ে যান। পাপের আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে হেমশশী হয়ে ওঠেন ক্ষীরোদা। কিন্তু পাল্টে যায় বিনোদ। তিনি দিনে-দিনে হয়ে ওঠেন শুদ্ধচারী মোহিত মোহন। আহ্নিকতর্পণ, শাস্ত্রালোচনা এই তার কাজ। পরবর্তীতে এই জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্যুটরি সিভিলিয়ানই ক্ষীরোদার বিচারক।

ফাঁসির হুকুমের দু'একদিন পর কৌতূহলবশত জজ মোহিতমোহন বন্দিনীশালায় প্রবেশ করেন। প্রহরীর সাথে ক্ষীরোদকে কলহ করতে দেখে কারণ জানতে চাইলে, ক্ষীরোদা প্রহরীকে তার আংটি চোর সাব্যস্ত করে জজের কাছে অনুরোধ জানান তার আংটি ফিরিয়ে দেয়ার। আংটির অস্তিত্ব সত্য জেনে, জজ প্রহরীর কাছ থেকে আংটি উদ্ধার করে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিলেন এমনিভাবে চমকে ওঠে। কারণ ঔ আংটিটি ছিল তার, আর যাকে তিনি চব্বিশ বৎসর পূর্বে দিয়েছিলেন সেছিল তার প্রেমিকা। আর তাই মুহূর্তেই ক্ষুদ্র আংটির উজ্জ্বল প্রভায় পতিতা নারী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয় তার কাছে।

'বিচারক' গল্পটি এক কুলনারীর পতিতায় পরিণত হওয়ার গল্প। তবে গল্পটি একটু ব্যতিক্রম পতিতা ক্ষীরোদা গ্লানিময় জীবন থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন। তার বিকৃত অতীত ক্লান্ত বর্তমান আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করেছে। তাই একমাত্র আপনজন শিশুপুত্রটিকে বক্ষে চেপে কুয়োতে ঝাঁপ দিলেও মৃত্যুও তাকে আলিঙ্গন করেনি। কিন্তু পুত্র হত্যার অপরাধে সে হয়েছে অপরাধী। আর সে লম্পট চব্বিশ বছর পূর্বে কুলনারীকে বারবণিতায় পরিণত হতে বাধ্য করেছেন সেই সমাজ রক্ষার তাগিদে উদ্বিগ্ন হয়ে পুত্র হত্যাকারী পতিতাকে ফাঁসির হুকুম করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তেই বিচারক বুঝতে পেরেছেন এই পতিতা চব্বিশ বছরের পূর্বের প্রেমের ছলনাকে হৃদয়ে লালন করে এসেছেন পরম মমতায়, সেই মুহূর্তেই এই পতিতা তার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন দেবী প্রতিমার ন্যায়।

'বোষ্টমী' গল্পের প্রথমদিকে লেখকের নিজের কথা রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে বোষ্টমীর সাথে আলাপচারিতা, এবং দ্বিতীয়াংশে লেখকের কাছে বোষ্টমীর অত্মোকথনের মাধ্যমে গল্পটি দানা বেঁধে উঠেছে। আনন্দী বোষ্টমীর একসময় স্বামী-সন্তান সংসার সবই ছিল। কিন্তু নিজের অসাবধানতার কারণে সন্তানকে হারিয়ে বোষ্টমী পাগল প্রায় হয়ে ওঠেন। এমন সময় তার স্বামীর গুরুঠাকুর দেশে ফিরে এলে স্বামী আনন্দীকে সান্ত্বনা

দেয়ার জন্য গুরুকে অনুরোধ করেন। গুরুর প্রতি বোষ্টমীর স্বামীর অফুরন্ত ভক্তি তাদের সংসারকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। বোষ্টমীও তাই দেবতাকে তার গুরুর রূপেই দেখতে পান। কিন্তু গোপনে গোপনে কোথায় একটা চুরি চলছিল যা অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়েছে। সহজিয়া আনন্দী যে গুরুর মাঝে দেবতাকে দেখেছেন সেই গুরুঠাকুরের কামনাকাতর বাণী আনন্দীর নিজের অজানা মনটাকে নিজের কাছে স্পষ্ট করে হাজির করেছে।

ভেতরে ভেতরে গুরু ও আনন্দী একে অন্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যা ক্রমেই আনন্দীর স্বামীও জানতে পারেন। ভক্তির অন্তরালে গুরুর প্রতি তার ভোগের বীভৎসতার রূপ আনন্দীকে ধিক্কার দিয়েছে। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার একাগ্রতা না থাকায় আনন্দী নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংসার ত্যাগের। এই সংসার ত্যাগী ভিখারিনী প্রোঢ়ত্বে পৌঁছে দেখা পেয়েছেন আরেক সত্য অনুসন্ধানকারীর। যিনি এই গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ। যার কাছে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন তার বোষ্টমীতে পরিণত হওয়ায় সমস্ত ঘটনা।

'বোষ্টমী' গল্পটিকে যৌথ আত্মবিশ্লেষণমূলক গল্প বলা যায়। গল্পে লেখক রবিঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত। মূলত লেখক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাঁর ধর্মপালন আচারে নয় বিচারে পরিলক্ষিত হয়। তাই যিনি সমগ্র জীবন সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তিনি ভোগী নন আবার যোগীও নন, তিনি ধনবান কিন্তু বিলাসিতা নেই শুধু সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করাই তাঁর লক্ষ্য। লেখকের এই নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে বোষ্টমী তাঁকে গৌর বলে পূজা নিবেদন করেছেন। তাই সত্যকে খোঁজা ও রবি ঠাকুরের মাঝে সেই সত্যের উপস্থিতি লক্ষ করে বোষ্টমীর আত্মার মুক্তি হয়েছে।

'ভিখারিনী' গল্পটি করুণ রসের গল্প। কাশ্মীরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন গল্পের নায়িকা কমল দেবীর পিতা। এবং রাজ্যের সেনাপতি অজিত সিংহ ছিলেন নায়ক অমর সিংহের পিতা। সেনাপতির অর্থবিত্ত ছিল না তবে উচ্চবংশীয় আর সেজন্যই কমল দেবীর সাথে অমর সিংহের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। কাশ্মীরের এক ধনীর পুত্র মোহনলালের সাথে কমলের বিবাহের প্রস্তাব হলে কমলের পিতা অসৎচরিত্রের মোহনের সাথে বিয়েতে সম্মতি দেননি।

হঠাৎ কমলের পিতা মৃত্যুবরণ করায় তার অনুপস্থিতিতে ক্রমেই তাদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বিধবার বিষয়সম্পত্তি ও পারিবারিক সম্ভ্রম আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। কমলের মা একাকী কন্যাকে নিয়ে একটি কুটিরে আশ্রয় নেন। এবং বহুকষ্টে দিনযাপন করতে থাকেন।

কিছুদিন পর রাজধানী থেকে সংবাদ আসে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেনানায়ক যুদ্ধে যাবেন সেই সাথে নিয়ে যাবেন পুত্র অমর সিংহকে, তার যুদ্ধশিক্ষার নিমিত্তে। এ ঘটনায় অশ্রুতে সিক্ত হয়ে দুটি বালক-বালিকা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

একদিন কমলের বিধবা মা অসুস্থ থাকার দরুন এক শীতের সকালে কমল ভিক্ষা করতে বেড়িয়ে সারাদিন কোথা থেকে কিছু সংগ্রহ করতে না পেরে অভুক্ত অবস্থায় অবসন্ন দেহে তুষারশয্যায় লুটিয়ে পড়ে। চৈতন্যহীন অবস্থায় সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে কমল ডাকাত দলের হস্তগত হয়। এবং ডাকাত দলের একজন কমলের গৃহে উপস্থিত হয়ে বিধবার কাছে কমলের মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচশত মুদ্রা দাবি করে যদি না দেয়া হয় তবে কমলকে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। বিধবা গচ্ছিত সমস্ত অলংকার এবং স্বামীর শেষ চিহ্ন আংটি বিক্রি করেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে অর্থের জন্য মোহনের শরণাপন্ন হন। একদিকে ডাকাত দলের দলপতির পুত্র কমলকে বিয়ের প্রস্তাব দেন অন্যদিকে মোহনও তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে কমলের বিনিময়ে বিধবাকে অর্থ দান করেন। কমল এক দস্যুর হাত থেকে রেহায় পেয়ে আরেক দস্যুর কবলে পড়ে। এবং বিবাহের পর মোহনের প্রতিহিংসাবৃত্তি আরো দৃঢ় হয় কমলের প্রতি।

ক্রমেই যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হয়, অমর কারারুদ্ধ থেকে অবশেষে বহু স্বপ্ন নিয়ে গ্রামের ফিরে আসেন কিন্তু কমলের বিবাহের সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে যান। এদিকে মোহন কমলকে মায়ের কাছে রেখে বিদেশে চলে যান। কিন্তু মোহনের অনুপস্থিতিতে কমল ও অমরের সাক্ষাৎ হলেও তাদের সেই পূর্বের সখ্যতা গড়ে ওঠে না। অমরের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার ও এবং হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া কমলকে ব্যথিত করে। আস্তে আস্তে কমল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অবশেষে একেবারে অন্তিম মুহূর্তে অমর কমলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অমরের সাক্ষাতের পরই কমলের প্রাণপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে যায়। এবং অশ্রুহীন চোখে অন্ধকার হৃদয়ে অমর কমলের গৃহ থেকে আবার নিরুদ্দেশ হন। আর কমলের মা সন্তানের মৃত্যুর পর পাগল হয়ে যান।

কাশ্মীরের শৈলমালায় আচ্ছন্ন এক ক্ষুদ্র রাজ্যের বাসিন্দা অমর সিংহ ও কমল দেবীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ‘ভিখারিনী’ গল্পটিতে। এ গল্পে বঙ্কিমী আমেজ পরিলক্ষিত হয়। ‘ভিখারিনী’ যথার্থ ছোটগল্প কিনা তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে মনে রাখা যৌক্তিক ‘ভিখারিনী’ রচিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। ছোটগল্পে যথার্থ সংজ্ঞায় ‘ভিখারিনী’কে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার অন্যতম কারণ এ সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাস্তবজীবন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় অপটু। কিন্তু তবুও প্রথম

গদ্যরচনা হিসেবে এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী মার্জিত অন্তর্ভাবনা আভাসিত হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র্যের কারণে শুরু থেকেই শিল্পচেতনার সামগ্রিকতায় তিনি স্বতন্ত্র।

'মণিহারা' গল্পের শুরুতেই গল্পের প্রধান চরিত্র ফণিভূষণ সাহাকে অন্যমনষ্ক অবস্থায় ঘাটে বাঁধা একটি বোটের ছাদে বসে থাকতে দেখা যায়। তার সম্মুখে একটি জরাগ্রস্ত বিশাল অট্টালিকা। এই অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফণিভূষণ ডুবে যান অতীতের স্মৃতিতে। তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তার ভেতরের 'আমি'কে স্কুল মাস্টার হিসেবে উপস্থাপন করে তার সাথে আলাপচারিতায় প্ররোচিত করে।

স্কুলমাস্টার মারফত তিনি জানতে পারেন এক সময় এই অট্টালিকায় বাস করতেন এক ধনী ব্যবসায়ী। নাম ছিল তার ফণিভূষণ। ফণিভূষণ তার অপুত্রক খুড়ার সকল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। ঘরে ছিল তার সুন্দরী স্ত্রী মণিমালিকা। তবে স্ত্রীর সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। নিঃসন্তান মণিমালিকা সর্বদা নিজের কাজে ডুবে থাকতেন। পাড়াপ্রতিবেশিদের সাথে তার মেলামেশা ছিল না। এমনকি বৈষ্ণবীদের সামান্য ভিক্ষা দেওয়া বা ব্রাহ্মণ খাওয়ানো তাকে দিয়ে হতো না। গৃহে কোনো দাস-দাসীর উপস্থিতি ছিল না, সব কাজ তিনি একাই করতেন। মণি কোনো অবস্থাতেই অর্থের বাড়তি খরচ পছন্দ করতেন না। স্বামীর ভালোবাসা ছাড়া সবই জমা করতেন। এমনকি তার নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী থেকেও একটুকু তিনি ক্ষয় হতে দেননি। কথিত আছে তার চব্বিশ বছর বয়সের ও তাকে চৌদ্দ বছরের মতো কাঁচা মনে হতো। মণির কোনো দোষ ছিল না। কোনো অন্য চিন্তা ছিল না। কিন্তু তবুও তার স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। তিনি কেবল স্ত্রীর শূন্য হৃদয় লক্ষ্য করে হীরা-মুক্তার গহনা এনে দিতেন আর সেগুলো গিয়ে জমা হতো লোহার সিন্ধুকে, হৃদয় শূন্য থাকত।

মাঝে ফণিভূষণের বহুবিস্তৃত ব্যবসায় ঝামেলা উপস্থিত হয়। বাজারে তার ক্রেডিট রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। হঠাৎ করেই একসাথে অনেকগুলো টাকার দরকার হয়ে পড়ে। কোথা থেকেও সেই টাকার সংস্থান না হওয়ায় ফণিভূষণ দুর্বলভাবে স্ত্রীর দ্বারস্থ হন। কিন্তু মণিমালিকার কঠিন নীরবতায় সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপরই মণি তার দূর-সম্পর্কের ভাই মধুসূদনের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। নিজের সমস্ত অলংকার রক্ষাকল্পে গৃহ ছেড়ে মধুর সাথে নৌকাযোগে পিত্রালয়ে চলে যাওয়া মনোস্থির করেন।

পরবর্তীতে ফণিভূষণের গোমস্তা খোঁজ নিজে জানতে পারেন মণির পিত্রালয়ে মধু এবং মণি কেউ পৌঁছাননি। এরপর চারদিকে খোঁজ পড়ে যায়। মধুর তল্লাসে পুলিস খবর দেয়া হয়। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এরপর থেকে সকল প্রকার আশা ছেড়ে ফণিভূষণ তার পরিত্যক্ত শয়নগৃহে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কল্পনার আশ্রয় নেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রে সমস্ত গ্রাম যখন উৎসবে ব্যস্ত সেই রাতে ঘুমের মধ্যে ফণিভূষণ প্রথম তার স্ত্রীকে

স্বপ্ন দেখেন। এরপর পরপর দু'রাত কাজের লোক দারোয়ান সকলকে ছুটি দিয়ে গৃহে একা মণির আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। এবং প্রতিবারই বাস্তবতার আঘাতে তার ঘুম ভেঙে যেত। জেগে দেখতেন মণি নেই তিনি একা। গল্প শেষে যদিও স্কুলমাস্টার মণিমালিকার সাথে ফণিভূষণকেও পানিতে ডুবিয়েছেন। কিন্তু ফণিভূষণ বেঁচে ছিলেন। তার কল্পনার মায়ালোকের স্কুলমাস্টার তাকে গল্প শুনিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনেছেন তার স্ত্রীর নাম জানার মধ্য দিয়ে।

'মণিহারা' গল্পটি 'অতিপ্রাকৃত' গল্প। এর পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের আরোও কিছু অতিপ্রাকৃত গল্পের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তবে 'মণিহারা' গল্পটি ঘটনার আকস্মিকতায় যুক্তি মননশীলতা উচ্চ শিল্পের মর্যাদা দাবি করে। গল্পটি মূলত নায়িকা মণিমালিকার অনুপস্থিতিতে নায়ক ফণিভূষণের মানসবিকারজনিত বিবৃতি। ফণিভূষণ সাহার বাস্তব জীবনযাত্রা সেভাবে কিছু উল্লিখিত হয়নি। তাই ধরে নেয়া যায় নায়কের এই মনোবিকৃতি সুস্থ বাস্তব চেতনার আবরণে আবৃত হয়ে প্রকাশিত হতে চেয়েছে। আর সেজন্যই একজন স্কুলমাস্টার নায়কেরই মনের কল্পনাজাত সৃষ্ট চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং গল্পের সমাপ্তিতে যিনি নিজের সৃষ্ট গল্পের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। সেই সাথে মাস্টার এটিও জানাতে ভোলেননি যে প্রকৃতিঠাকুরাণী উপন্যাস লেখিকা নন।

নিঃসন্তান দম্পতি হরসুন্দরী ও নিবারণের ছন্দহীন জীবনের কাহিনি নিয়ে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের আবর্তন। নিবারণের চিরাভ্যস্ত জীবনে হঠাৎ সংকট উপস্থিত হয় স্ত্রী হরসুন্দরীর অসুস্থতার কারণে। স্ত্রীর পীড়ায় নিবারণ ব্যস্ত হয়ে অফিস, প্রতিবেশির গৃহে সন্ধ্যা উদ্‌যাপন সব কিছু পরিহার করেন। দুইবেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্তন করে নিজেকে স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত রাখেন। অবশেষে চল্লিশ দিনের মাথায় জ্বর ছেড়ে গেলেও হরসুন্দরী একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েন।

এ সময় স্বামীর ভালোবাসায় হরসুন্দরীর উচ্ছ্বসিত হৃদয়, তাকে স্বামীর জন্য এক বৃহৎ ত্যাগ স্বীকারে ব্যাপৃত করে। তিনি নিবারণকে অনুরোধ জানান আরেকটি বিয়ে করার জন্য, নিবারণ যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন আনন্দিত চিত্তে হরসুন্দরীর প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ়রূপ লাভ করে।

তারপর সত্যি সত্যি নিবারণ অশ্রুভরা নোলকপরা শৈলবালা নামক এক কিশোরী কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে আনেন। শৈলবালার প্রতি নিবারণের আগ্রহের সীমা ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবখানা এমন করতেন যেন কচি মেয়ে বিয়ে করে তিনি বিপদে পড়েছেন। এহেন অবস্থায় হরসুন্দরী মাঝে পড়ে তাদের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেন। শেষে দুঃখিত না হয়ে হাল ছেড়ে দেন, তখন হাল ধরেন স্বয়ং নিবারণ। নিবারণ যখন শৈলবালাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন হঠাৎ হরসুন্দরীর মনে হয় কেউ যেন একটি জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়ে তার চোখ খুলে দিল। আর সেই

চোখের জল শুকিয়ে কাঠ। হরসুন্দরী যখন গৃহে তার অবস্থান বুঝতে পারেন তখন নিজ শয়ন কক্ষ ছেড়ে অন্য কক্ষে আশ্রয় নেন। হরসুন্দরী নতুন করে এক অজানা ব্যথার দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর হতে থাকেন। এবং আফসোস করেন তার জীবনের সাতাশটি বছর কেবল ঘরকন্যার দাসীবৃত্তির কাজে বৃথা ব্যয় করার জন্য। আর এখন উপলব্ধি করছেন একটি ক্ষুদ্র বালিকা তার সংসারে রাজরাজেশ্বরী হয়ে বসেছে।

শৈলবালার মোহে নিবারণ এতটাই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন যে সাধারণ বোধবুদ্ধিও তার লোপ হয়। তাই সে শৈলবালার জন্য ছল করে পাওনাদারদের দোহাই দেখিয়ে হরসুন্দরীর কাছে গহনা চেয়ে তা বন্ধক রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এমনকি শৈলবালার কারণে ম্যাকমোরান কোম্পানীর ক্যাশ তহবিলেও নিবারণ গোপনে হাত দেন। শেষে নিবারণ ধরা পড়েন, অফিস থেকে তহবিল পূরণের জন্য মাত্র দু'দিন সময় বেঁধে দিলে, আবার গহনার জন্য সাহায্য চান হরসুন্দরীর কাছে। হরসুন্দরী জানান তার সকল গহনা শৈলবালার কাছে, কিন্তু নিবারণ লোহার সিন্দুকের চেয়েও কঠিন শৈলবালার কাছ থেকে একটি গহনাও উদ্ধার করতে পারেন না।

শেষে নিবারণ নিজেকে বাঁচাতে বাড়ি বিক্রি করেন এতে করে তাদের আশ্রয় হয় গলির একটি ছোট স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে। এদিকে শৈলবালা গর্ভবতী হওয়ায় তার অসন্তোষ আর বিরক্তির সীমা থাকে না। হরসুন্দরী তাকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেও সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন না। অবশেষে সংসারে সকল সোহাগের বন্ধন ছিন্ন করে শৈলবাল সংসার ত্যাগ করে। এ ঘটনায় নিবারণের প্রচণ্ড আঘাত লাগলেও পরবর্তীতে অনুভব করেন মুক্তির আনন্দ। কিন্তু সহজ হতে পারেন না সে হরসুন্দরীর সাথে। হরসুন্দরী ও নিবারণের মাঝে শৈলবালা এক অলঙ্ঘনীয় দেয়াল হয়ে থাকে চিরকাল।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পটি পারিবারিক কাহিনি নিয়ে রচিত। গল্পটিতে মাত্র তিনটি চারিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। গল্পে হরসুন্দরীর হৃদয় রহস্য, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, ব্যাপকভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে। হরসুন্দরী ও নিবারণের মনোরহস্যের নির্মম সত্য ছবি চিত্রণে লেখক যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। যে মিথ্যা আদর্শে উদ্বেলিত হয়ে হরসুন্দরী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করিয়েছেন সেই আদর্শ কঠিন বাস্তবতার বেদনাপূর্ণ আঘাতে ধূলিসাৎ হয়েছে। শৈলবালার প্রতি নিবারণে মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ হরসুন্দরীর চৈতন্যোদয় হয়েছে, তিনি দুঃসহ যন্ত্রণায় উপলব্ধি করেছেন জীবনের সকল পূর্ণতা থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করে এসেছে। তার নারীজীবন কেবল অপ্রাপ্তিতেই কেটেছে। অন্যভাবে দেখা যায় তরুণী স্ত্রীর প্রতি মোহে মুগ্ধ নিবারণের চিত্তের বিপরীতমুখীতা শৈলবালার মৃত্যুতে নিবারণ মর্মাহত হলেও মুক্তির আনন্দ তাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তার প্রথমা স্ত্রী হরসুন্দরীর সাথে।

'মহামায়া' গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে সহমরণ প্রথার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গল্পের নায়িকা মহামায়া কুলীন ঘরের কন্যা। উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় অধিক বয়সেও অবিবাহিতা। প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন গ্রামের রেশমের কুঠির বড় সাহেবের আশ্রিত রাজীবলোচনের সাথে। মহামায়ার ভাই ভবানীচরণ এই ঘটনা অবহিত হওয়ার পর সেই রাত্রেই মহামায়াকে শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পরের দিনই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মারা যাওয়ায় সেই চিতায় মহামায়াকে সহমৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

সেইদিন রাজীবের অন্তরে যে ঝড় উঠেছিল বাইরের প্রকৃতিতেও অনুরূপ মহাবিপ্লব শুরু হয়েছিল। আর তাই প্রকৃতির আশীর্বাদে চিতা নিভে গেলে মহামায়া প্রাণে বেঁচে যান। তিনি প্রথমে তার দগ্ধ শরীর নিয়ে নিজগৃহে গিয়ে আয়নায় নিজেকে অবলোকন করেন তারপর ঘোমটার আড়ালে নিজেকে আবৃত করে রাজীবের ঘরে পৌঁছান। এবং রাজীবকে শর্তে আবদ্ধ করে তার ঘরে থাকতে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। রাজীব ভবিষ্যৎ কৌতূহলের কথা চিন্তা না করেই মহামায়ার কথায় রাজি হয়ে যান।

অবশেষে একদিন রাজীব প্রতিজ্ঞা ভুলে জ্যোৎস্নারাত্রিতে স্বপ্নচালিতের মতো মহামায়ার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন, এবং ঘুমন্ত মহামায়ার অনাবৃত মুখ দেখে ফেলেন। আর সেই অপরাধেই মহামায়া রাজীবের ঘর ছেড়ে চিরবিদায় নেন।

'মহামায়া' গল্পের নামকরণ করা হয়েছে নায়িকা মহামায়ার নামানুসারে। অর্থাৎ এ গল্পের আবর্তন নায়িকাকে কেন্দ্র করেই। কুলীন ঘরের কন্যা হওয়ায় তার যেমন ছিল প্রখর আত্মোহংকার তেমনি তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব। তার প্রতি রাজীবের ভালোবাসা নিখাদ হলেও রাজীব তাকে ভয় করতেন। তাই নিস্তব্ধ দুপুরে নির্জন ভাঙা মন্দিরে মহামায়াকে বিয়ের প্রস্তাব করে রাজীবের সাহস ছিল না তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর শোনার। এমনকি চিতা থেকে উঠে অর্ধদগ্ধ মহামায়া রাজীবের সাথে একই ছাদের তলায় থাকতে রাজি হয় শুধুমাত্র একটি প্রতিজ্ঞায় রাজীবকে আবদ্ধ করে, কখনো তার ঘোমটা খোলা যাবে না। এ কথায় এটাই প্রমাণিত যে, এ কোনো অসহায়ের আশ্রয় চাওয়া নয় বরং ভালোবাসার মানুষকে কৃপা করে সঙ্গ দেয়া। তা নইলে সেই মুহূর্তেই অর্ধদগ্ধ মহামায়া দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রাজীবকে বলতে পারত না আবার চিতায় ফিরে যাবার কথা। তখন ক্ষণিকের উত্তেজনায় রাজীব রাজি হলেও ক্রমান্বয়ে তাদের দিন-রাত্রির মধ্যে একটি দুঃসহ বেদনা রাজীবকে আঘাত করতে থাকে। তিনি যেন মহামায়ার আর কোনো নাগাল পান না। কেবল একটি অতৃপ্ত বাসনা এই অটল রহস্য ভেদ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই একদিন রাজীব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মহামায়ার অনাবৃত মুখ দর্শন করায় তার আত্মোহংকারে আঘাত লাগে। আর সে কারণেই রাজীবের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধানকল্পে তীক্ষ্ণব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নারী রাজীবকে নীরব ক্রোধানলে দগ্ধ করে তার গৃহ ছেড়ে চিরবিদায় নেন।

'মানভঞ্জন' গল্পে ধনীগৃহের নিঃসন্তান গৃহিণী গিরিবালা। আপন রূপের মোহে মুগ্ধ গিরিবালার নিজেকে বসন-ভূষণে সজ্জিত করা ছাড়া সাংসারিক কোনো কর্ম ছিল না। তার স্বামী থেকেও নেই। বাল্যকালে স্বামীর যে সোহাগ তিনি পেয়েছিলেন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে তা নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল।

শ্বশুর রমানাথ শীলের মৃত্যুর পর স্বামী গোপীনাথ অল্প বয়সে প্রভূত অধিকারের অধিকারী হয়ে অন্দরমহলের সাথে সম্পর্ক ঘুচিয়ে বহির্জগতের সাথে সখ্য স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেন। অন্যদিকে বিশ্বজয়ী রূপ নিয়ে আপন নিভৃত রাজ্যে গিরিবালা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তবে তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল বিধাতা তাকে যে রাজদণ্ড দিয়েছেন তা দিয়ে তিনি বিশ্ব জয় করতে পারেন, যদিও গিরিবালা নিজ স্বামীকে বন্দী করতে পারেননি। স্বামীর মুখে থিয়েটারের অভিনেত্রী লবঙ্গর প্রশংসা তাকে মাঝে-মাঝে ঈর্ষান্বিত করেছে। লবঙ্গকে দেখার অনুমতি স্বামীর কাছ থেকে না পেয়ে পালিয়ে থিয়েটারে গিয়ে রঙ্গ-মঞ্চ, বাদ্য, আলোকমালা, সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা, সংগীত সব কিছুর মধ্যে গিরিবালা যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাই নিত্যদিনের চিরপরিচিত গৃহকে সেদিন তার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী মনে হয়েছিল। তাই যেদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গোপীনাথ চাবির গোছাকে কেন্দ্র করে তাকে প্রহার করে গা থেকে অলংকার খুলে নিয়েছিলেন সেদিনই তিনি স্বামীর সংসার ত্যাগ করেছেন। বেছে নিয়েছেন স্বামীর শখের থিয়েটারকে, পেয়েছেন প্রধান অভিনেত্রীর মর্যাদা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে থিয়েটারওয়ালারা নতুন নাটক 'মনোরমা'র বিজ্ঞাপনে পুরো কলিকাতা যখন ছেয়ে ফেলেছেন তখন গোপীনাথ তাদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে 'মনোরমা'র প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে নিয়ে পালিয়ে যান। আর সেই লবঙ্গের স্থলাভিষিক্ত হন নতুন অভিনেত্রী গিরিবালা। এবং অল্পদিনেই খ্যাতি অর্জন করেন। এমনকি কাগজেও প্রশংসার সীমা নেই।

এদিকে গোপীনাথ আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে কলিকাতা ফিরে আসেন। উপভোগ করতে যান নতুন অভিনেত্রীর অভিনয় এবং শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন এই মনোরমা তারই গৃহবধু গিরিবালা। আর তখনই গোপীনাথ উন্মত্ত হয়ে গিরিবালা নাম ধরে চিৎকার করতে করতে স্টেজে ওঠার চেষ্টা করলে বাদকগণ তাকে ধরে ফেলেন। এবং অন্যান্য দর্শকগণ তার উপর চরম বিরক্তি প্রকাশ করলে, পুলিসের সাহায্যে তাকে বের করে দেয়া হয়। সমস্ত কলিকাতার দর্শক যখন গিরিবালার অভিনয় দেখতে থাকেন সেখানে জায়গা হয় না কেবল তার স্বামী গোপীনাথের।

কলিকাতার নব্য ধনী শ্রেণীর এক উচ্ছৃঙ্খল বাবুর জীবনের খণ্ডাংশ অঙ্কিত হয়েছে গল্পটিতে। মূলত বাবু জীবনের চালচিত্র অঙ্কনের অন্তরালে যা প্রধানরূপে প্রকাশিত হয়েছে তা একটি নারীর জীবনকথা। গোপীনাথের স্ত্রী গিরিবালা ছিলেন নিঃসন্তান। স্বামী উপেক্ষিতা গিরিবালা হয়তো একটি সন্তান থাকলে তবুও নিজেকে সংসারের সাথে জড়িয়ে রাখতেন। কিন্তু সেই বন্ধনটুকুও যখন ছিল না তখন আত্মরতিমগ্নতায় আচ্ছন্ন গিরিবালা তাই স্বামীর

আশ্রয়ে থাকতেও আর প্রস্তুত ছিলেন না। নিজের অস্তিত্ব জাহিরের প্রয়োজনে স্বামী-সংসার ত্যাগ করে বহির্জগতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে তার কোথাও বাধেনি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গিরিবালা স্বামীর অবহেলা নীরবে সহ্য না করে তথাকথিত সংসারের শেকল ছিন্ন করে মুক্তি খুঁজে পেতে ভিড় করেছেন থিয়েটারের ঝলমলে জগতে। থিয়েটারের সুসজ্জিতা ব্রজাঙ্গনা লবঙ্গকে নিয়ে স্বামীর নিরুদ্দেশের খবরে থিয়েটারে লবঙ্গর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দর্শক নন্দিত গিরিবালা নিজের আত্মাভিমান অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

'মাল্যদান' গল্পের নায়ক যতীন ও পটল উভয়ে খুড়তুতো জাঠতুত ভাইবোন। বয়সে পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড় হলেও যতীন তাকে সম্মান দেখিয়ে দিদি সম্বোধন করতেন না। পটলের স্বামী হরকুমারবাবু কলিকাতার আবগারি বিভাগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তবে তিনি কলিকাতায় থাকেন না, প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগান বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। ডাক্তারিতে নব উত্তীর্ণ যতীন তাই সপ্তাহখানেকের জন্য বোনের নিমন্ত্রণে তার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। কলিকাতার যান্ত্রিক জীবনের বাইরে গিয়ে যতীন প্রকৃতির নির্মল আবেশে উদাসীন হয়ে পড়েন। তার এই অন্যমনস্ক মনোভাব তার জাঠতুতো বোন পটলের দুষ্টুমির খোড়াক যোগায়। তিনি যতীনকে এত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার জন্য তিরস্কার করেন। তাদের বাড়ির মালী ধনারও যে একটি বউ আছে আর যতীনের নেই সেজন্য তিনি যতীনকে ধিক্কার জানান। এমনকি যতীনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন, পরের দিন যার মুখই দেখবে যতীন তার গলায়ই মালা দেবেন। কিন্তু পটলের আর তর সহে না পরের দিনের জন্য, সেদিনই সে তার গৃহে আশ্রিতা কুড়ানিকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেন যতীনের সামনে।

কুড়ানি ষোলো বছর বয়সী বুদ্ধিহীনা একটি মেয়ে। হরকুমারবাবু ও পটল যখন পশ্চিমে ছিলেন তখন দুর্ভিক্ষের সময় সেই মেয়েটিকে তারা আশ্রয় দেন। খাদ্যের অভাবে কুড়ানির বাবা-মার মৃত্যু হয়েছিল কেবল ওর প্রাণটুকুই ছিল কোনোরকমে। পটলের সেবা-যত্নে ও বেঁচে উঠেছে। ওর জাত কেউ জানে না। কুড়িয়ে পাওয়ার দরুন পটল ওকে কুড়ানি বলে ডাকতেন।

পরবর্তীতে পটলের বাড়িতে যতীন বেড়াতে এলে হরকুমার যতীনকে কুড়ানির চিকিৎসার কথা বলেন। কিন্তু পটল এই কুড়ানির সাথে যতীনকে জড়িয়ে নানা রকম রসিকতা করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে একদিকে কুড়ানি পটলের রসিকাতকে সরল হৃদয়ে বিশ্বাস করে, অন্যদিকে পটলের উপর অভিমান করে যতীন কাউকে কিন্তু না জানিয়ে গৃহত্যাগী হন। যতীনের নীরব প্রস্থান অবোধ কুড়ানিকে ব্যথিত করে, সে ভাবে যতীন তাকে অবহেলা করে চলে গিয়েছে। তাই এই অপমান সহ্য করতে না পেরে অভিমান করে সেও পটলের দেয়া সকল উপহার সামগ্রী রেখে গৃহত্যাগ করে। কৌতুকপ্রিয় পটল কুড়ানির এই অভাবনীয় পরিবর্তনে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং যতীনকে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে চিঠি লেখেন। এদিকে হরকুমার কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিয়ে বহু চেষ্টায় বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত তার আশা ত্যাগ করেন।

অবশেষে কুড়ানি অসুস্থ অবস্থায় প্লেগ-হাসপাতালে আশ্রয় পায়। সে হাসপাতালে যতীন ডাক্তার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল। যতীন নতুন রোগিনীর খবর পেয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে কুড়ানিকে আবিষ্কার করেন। অনাহারে দুর্বল কুড়ানিকে প্লেগ রোগীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে যতীন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নিজ গৃহে নিয়ে এসে নিজেকে কুড়ানির সেবায় নিয়োজিত করেন। খবর পেয়ে পটল এলে তার উপস্থিতিতে যতিন কুড়ানির ভালোবাসাকে স্বীকার করেন এবং কুড়ানির মালা তার গলায় পড়িয়ে দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে কুড়ানি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার ভালোবাসা জয়ের গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই ইহলোক থেকে বিদায় নেয়।

'মাল্যদান' গল্পটি সম্পূর্ণরূপে একটি প্রেমের গল্প। গল্পটির বিশেষত্ব এখানে যে এ গল্পে প্রেমময় অভিব্যক্তির প্রকাশ নারীর দিক থেকে দেখানো হয়েছে। মূলত যে সময়ের গল্প এটি সে সময়ে নারীর চাওয়া পাওয়ার মূল্যায়ন কোথাও ছিল না। সেদিক থেকে বিবেচনা করে বলতে হয় কুড়ানি চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত যতীনের কাছ থেকে কুড়ানি তার ভালোবাসার প্রতিদান পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যতীনকে নিজের করে পাওয়ার গৌরব অর্জন করে তবেই অজানার দেশে পা বাড়িয়েছে।

'মুক্তির উপায়' গল্পটি বিদ্রূপাত্মক। গল্পের শুরুতেই ফকিরচাঁদের স্বভাব ও বাহ্যিক বেশভূষার পরিচয় দেয়া হয়েছে। গম্ভীর প্রকৃতি ফকির পরকালে দৃঢ়বিশ্বাসী তাই ভগবদগীতার পরিবর্তে তার তরুণী স্ত্রী বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়ায় তাকে শারীরিক শাসন করতেও তিনি কার্পণ্য করতেন না। দুটি সন্তান জন্মের পর চাকুরীর বাজারে ব্যর্থ হয়ে ফকির মনে করেন সেও বুদ্ধদেবের মতো সংসার ত্যাগ করবেন। সত্যিই তিনি একদিন গভীর রাতে গৃহত্যাগ করেন।

অন্যদিকে নবগ্রামের বাসিন্দা ষষ্ঠীচরণের পুত্র মাখনলালও দুই স্ত্রী আট সন্তান ও বৃদ্ধ পিতাকে রেখে ফকিরচাঁদের মতো একদিন গভীর রাতে গৃহত্যাগ করেন। কিছুদিন পর ফকিরচাঁদ মাখনের গ্রামে অর্থাৎ নবগ্রামে এসে হাজির হন। পথে নিজের পিতাকে দেখে পালাতে গিয়ে অপরিচিত এক গৃহে আশ্রয় নেন। সে গৃহের কর্তা ষষ্ঠীচরণ তার পরিচয় সন্ন্যাসী জেনে তাকে নিজপুত্র মাখনলাল ভেবে চিৎকার চেঁচামেচি করে সকলকে খবর দেন। দেখতে দেখতে বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীকে দেখে অধিকাংশই বলেন সে ফকিরই বটে তবে অনেকে আবার দ্বিমত পোষণ করেন। যারা দ্বিমত পোষণ করেন তারা বেশিক্ষণ আর কথা বলতে পারেন না। সকলের নিকট হতে তাড়না খেয়ে চুপ হয়ে যান। পাড়ার লোকের পরিহাস স্ত্রীদের তিরস্কার, পিতার অগাধ স্নেহ ফকির কোনো রকমে সহ্য করে গেলেও শ্যালা-শ্যালীর নির্মম তামাশা এবং সুমিষ্ট এক হাসির শব্দ তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাই সে বাড়ি থেকে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে উকিল ফকিরকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জানিয়ে দেন।

তখন নিরুপায় ফকির তার নিজ পিতাকে চিঠি দেন। চিঠি পেয়ে ফকিরের বাবা হরেনবাবু ফকিরকে তার পুত্র বলে দাবি করলেও ষষ্ঠীচরণ, উকিল, পাড়ার লোক তাদের দাবি ছাড়তে নারাজ।

গৃহে আরো দুজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন–একজন ষষ্ঠীচরণের ভাগ্নী হৈমবতী যিনি ফকিরের স্ত্রী, অপরজন ছদ্মবেশী মাখনলাল। মাখনলাল তার বাড়িতে হৈমবতীকে দেখে বুঝতে পেরেছেন তার পদে অভিষিক্ত ব্যক্তিটি তার ভগ্নিপতি ফকির। তাই ফকিরচাঁদকে আর বেশিক্ষণ নিজপদে বহাল না রেখে হৈমবতীর কাছে ও নিজের দুই স্ত্রীর কাছে মাখনলাল দোষ স্বীকার করেন। সবশেষে পাড়ার সকলে তার বীরত্বে ও মহত্ত্বে আশ্চর্য হয়ে যান।

'মুক্তির উপায়' গল্পটি হাস্যরসাত্মক। গল্পের প্রধান উপাদানই হলো রস, যা গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিরাজমান। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা তির্যক ভাষা ব্যবহারে অধিক প্রাণময় হয়ে উঠেছে। হাসি তামাশার ছলে লেখক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। প্রথমত ফকিরচাঁদের স্ত্রী বঙ্কিমবাবুর নভেল পাঠে অধিক আগ্রহী এবং স্বামীকে দেবতার মতো পূজা করার পক্ষপাতী নন, এর ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের বিষয়টি লক্ষণীয়। দুই সন্তানের পিতা ফকিরের কর্মের উমেদারিতে অকৃতকার্য হওয়ায় বুদ্ধদেবের মতো সংসার ত্যাগ, আট সন্তানের পিতা মাখনের সংসার থেকে পলায়নের সিদ্ধান্ত মূলত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় বহন করে। সবকিছু মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ সরস ভাষায় গল্পটিকে কৌতুকময় করে তুলেছেন।

'মুসলমানীর গল্প' গল্পে লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্র ও সামজের ভয়াবহ ক্রান্তিলগ্নে পরিবারে রূপসী কন্যার আগমন ছিল সেই গৃহস্বামীর প্রতি বিধাতার অভিশাপ। এই অভিশাপে অভিশপ্ত হলেন বংশীবদন। কেননা তার ভ্রাতৃকন্যা কমলা ছিল অপরূপা। দাদা বৌদির মৃত্যুর পর এই ছোট শিশু কন্যাটিকে তিনি অতি সযতনে লালন-পালন করেছেন। যদিও তার স্ত্রী এ ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন এবং তিনি বরাবর প্রতিবেশিনীদের কাছে এ নিয়ে আক্ষেপ করতেন। ধীরে ধীরে কমলা বড় হতে থাকে এবং তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে। সম্বন্ধটি জমিদার ঘর থেকে আসে বটে তবে পাত্রটি কমলার উপযুক্ত নয়। কমলা কেঁদে কেঁদে কাকার কাছে নালিশ জানায় তাকে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু কাকা অপারগ। মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলের সাথে কমলার বিয়ে হয়ে যায়। বউ নিয়ে বিখ্যাত তালতলির মাঠের উপর দিয়ে যাত্রা কালে রাত্রি দুই প্রহরে তাদের উপর ডাকাতের আক্রমণ হয়। কমলাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেন বৃদ্ধ হবির খাঁ। এবং একটি মহলে আশ্রয় দেন। কথিত আছে হবির খাঁর বাবা নবাব এক রাজপুতের কন্যাকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি শিবপূজা তীর্থ ভ্রমণ থেকে শুরু করে সব আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতেন। তখনকার অভিজাত মুসলিমরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের শ্রদ্ধা করতেন। হবির খাঁর মা আরো বহু হিন্দু বেগমদের এখানে এই মহলে আশ্রয় দিতেন। হবির খাঁ যদিও মায়ের ধর্ম গ্রহণ করেননি কিন্তু তিনি মাকে পূজা করতেন এবং আজো তিনি হিন্দু মেয়েদের এখানে আশ্রয় দেন।

তাই কমলাও সেই রাজপুতানী মহলে আশ্রয় পেয়ে একেবারে যেন মহিষীর পদ লাভ করে। তার পূজা-আচারের জন্য বুড়ো ব্রাহ্মণ, সেবার জন্য হিন্দু ঘরের দাস-দাসী সবই প্রস্তুত ছিল। কাকার ঘরের তুলনায় এই ঘর ছিল তার জন্য ভূ-স্বর্গ। ধীরে ধীরে কমলা হবির খাঁর মেজো পুত্র করিমের প্রেমে পড়ে যায়। এবং কমলা হবির খাঁর কাছে তাদের সব কথা স্বীকার করে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। করিমের সাথে কমলার বিয়ে হয়ে যায়। তার নতুন নামকরণ হয় মেহেরজান।

পরবর্তীতে কমলার কাকাত বোন সরলার বিয়ের সময়ও একই ঘটনার পুনরায় ঘটে। অর্থাৎ ডাকাত সর্দার মধুমোল্লা আবার আক্রমণ করে। একবার সে নিরাশ হয়েছে এবার সে শোধ নিতে চায়। কিন্তু এবারও হবির খাঁ এসে উপস্থিত সেই সাথে অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকাবাধা বর্শার ফলক নিয়ে দাঁড়িয়েছে মেহেরজান। ডাকাতদল এবারও হবির খাঁকে দেখে পালিয়ে যায়। মেহেরজান সরলাকে অভয় দান করে জানায় তার কোনো ভয় নেই, সে সরলার জন্য এমন একজনের আশ্রয়ে নিয়ে এসেছে যিনি জাত বিচার না করে সকলকে আশ্রয় দেন। এবং কাকাকে পা না ছুঁয়ে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে অনুরোধ জানায় সরলাকে ঘরে নেয়ার জন্য কারণ সে অস্পৃশ্য। এবং কাকীর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়ে আজ এমনি করে সে ঋণ শোধ করতে পারার জন্য সে গর্বিত। সেই সাথে তার শেষ স্বীকারোক্তি সরলার যে কোনো বিপদে তাকে রক্ষা করার জন্য তার মুসলমান দিদি রয়েছে।

'মুসলমানীর গল্প' সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এরকম স্পর্শকাতর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্প লেখা সম্ভব। গল্পটি ১৯৪১ সালে জুন মাসের চব্বিশ, পঁচিশ তারিখে লিখিত হয়েছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের প্রায় দেড়-দুমাস আগে। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তিনি দেখতে চেয়েছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে হিন্দু-মুসলমান এই দুইসম্প্রদায়ের মিলন। আর তাই তিনি লিখেছিলেন এক হিন্দু নারীর স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়ার গল্প। এ গল্পটিতে একই সাথে হিন্দুত্বের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল বিদ্রোহ, পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের ঔদার্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের শুরুতেই অল্পদৃষ্টি ও স্বল্পভাষা এবং তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে যার আবির্ভাব তিনি গল্পের নায়ক শশিভূষণ। তার এই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য গ্রামের কারো সাথে গভীর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, শুধুমাত্র গ্রামের নায়েব হরকুমারের দশ বছরের কন্যা গিরিবালা ছাড়া। গ্রামের সবাই যখন সামান্য ব্যাপারে চক্রান্ত, মিথ্যা মামলা, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত তখন নীরবে নিজগৃহকোণে তক্তপোষে বসে সাহিত্যচর্চা করতেন কেবল শশিভূষণ ও গিরিবালা। এ নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু মাথাব্যথার কারণ ছিল শশিভূষণের শান্তপ্রকৃতি যা অনেকে তার অহংকার বলে মনে করতেন। শুরু থেকেই গিরিবালার পিতা হরকুমারের বিরাগভাজন ছিলেন শশিভূষণ। আবার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে হরকুমারের বিবাদকে কেন্দ্র করে তা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। হরকুমারের হঠকারিতা, ইংরেজ ম্যানেজারের নিচুতা, নিজ গ্রামের মাঝিদের অকৃতজ্ঞতা

এবং সব শেষে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কর্তৃক নাজেহাল জেলেদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারে শশী ভেতর থেকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যান। তাই পাঁচ বছর কারাদণ্ড হওয়ায় শশিভূষণের পিতা আপিল করতে সচেষ্ট হলে শশী পিতাকে বারণ করেন। কেননা বাইরের অসংখ্য প্রতারক সঙ্গের চেয়ে জেলের ভেতরে সীমিত প্রতারক সঙ্গ তার কাছে সহনীয় মনে হয়েছে। কারাভোগ শেষে সহায়-সম্বলহীন শশিভূষণের আশ্রয় মিলেছে তার ছাত্রী বিধবা গিরিবালারই গৃহে।

পরোপকারী শশিভূষণ শোষকদের কবল থেকে স্বজাতীয়দের রক্ষা করতে গিয়ে কেবল তাদের কৃতঘ্নতার পরিচয় পেয়ে পেয়ে বাইরের জগৎ ছেড়ে লোহার খাঁচাকে আপন বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যু ও সম্পত্তি ভোগদখল হওয়ায় পাঁচ বছর পর বাইরের পৃথিবীকে তাই আত্মীয়-গৃহহীন শশিভূষণের কাছে অত্যন্ত শূন্য বলে মনে হয়। কিন্তু তার সমস্ত শূন্যতাকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিধবা গিরিবালা। কিশোরী গিরিবালার অন্তরে শশিভূষণের জন্য যে স্বাভাবিক আন্তরিকতাটুকু ছিল তা তরুণী গিরিবালার হৃদয়ে প্রেমের রূপ নেয়। তাই নিরাশ্রয় শশিভূষণকে সে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়েছে এবং কীর্তনের সুরে সুরে শশিভূষণের প্রতি তার পুঞ্জিত প্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পের মূল চরিত্র যজ্ঞেশ্বরের পূর্বকালের অবস্থা ভালো থাকলেও বর্তমানে মন্দ। তার ভাঙা কোঠাবাড়িটা বসবাসের অযোগ্য হওয়ায় তিনি একটি খড়ো ঘরে ভগবতগীতা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যের মধ্যে ছিল একটি এগার বছর বয়সী কন্যা কমলা আর যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা। মেয়ের বিয়ের বিষয়ে যজ্ঞেশ্বরের খুব উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল না শুধুমাত্র একটি সৎপাত্রে কন্যাসম্প্রদান করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জ্যাঠাইমা তার নাতনিকে বড় ঘরে বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কাজেই যজ্ঞেশ্বরকে তার চির পরিচিত পল্লীর বাইরে পাত্রের সন্ধানে বের হতে হয়।

এর মাঝে রাজশাহি হতে যজ্ঞেশ্বরের এক আত্মীয় উকিলের মক্কেল জমিদার চৌধুরীর কলেজ পড়ুয়া একমাত্র ছেলে বিভূতিভূষণ কমলাকে গোপনে দেখে পছন্দ করেছিলেন। যা যজ্ঞেশ্বরের অজানা ছিল এই বিভূতিভূষণকে জামাই হিসেবে পাওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষাও যজ্ঞেশ্বরের ছিল না।

তাই অন্যত্র তিনি মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। এবং এই খবর বিভূতিভূষণ জানার পর তিনি প্রথমে উকিলবাবুর কাছে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন। সেখানে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে সোজা কন্যার পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাকা করে পরবর্তীতে নিজের পিতার মত আদায় করেন।

গৌরসুন্দর শিক্ষিত ছেলের কাছে নিজের মান বাঁচাতে দায়ে পড়ে মত দিলেও এ বিয়েতে খুব একটা খুশি ছিলেন না। তাই সেই সাহসে বরযাত্রীর দল কন্যার গৃহে উপস্থিত হয়ে তাদের হেনস্থা করতে পরিবেশনের খাদ্যদ্রব্য কাদায় ফেলে নষ্ট করতে থাকেন। গৌরসুন্দর এ ঘটনায় যোগ না দিলেও তার নীরব সমর্থন ছিল তিনি বরযাত্রীদের কাউকে খাদ্য নষ্ট না করার জন্য নিষেধ করেননি। পরবর্তীতে খাবারের হেন অপচয়ে বাথানপাড়ার গোয়ালরা রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। এ ঘটনায় যজ্ঞেশ্বর অশ্রুবিসর্জন করে সকলের কাছে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন কিন্তু কেউ তার কথা শোনেন না। শেষে দিদিমা বরের দ্বারস্থ হন। নায়ক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিজের বাবাকে প্রথমে তাদের ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন। তারপর গোয়ালাদের আদেশ করেন বরযাত্রীদের পেছনে দাঁড়িয়ে যেতে যদি কেউ আর কিছু খাবার কাদায় ফেলে তাহলে সেগুলো তাদের থালায় তুলে দেওয়ার জন্য। সবশেষে বাবাকে আদেশ করেন অনেক রাত হয়েছে খাবার খেতে বসে যেতে। গৌরসুন্দর উপায় না দেখে খেতে বসে যান এবং ছানা যথাস্থানে পৌঁছাতে থাকে।

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পটিতে সমাজ বাস্তবতার ছবি নিপুণ দক্ষতায় অঙ্কিত। গল্পকার গল্পের নায়ককে যথেষ্ট সক্রিয় করে পাঠকের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। নায়কের জমিদার পিতা পুত্রের পছন্দের বিয়ে করার উপযুক্ত শাস্তি যখন পুত্রকে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন লক্ষ্য ছিল তার কন্যাপক্ষ। কিন্তু পুত্র নিজের পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। এটি সে সময়ের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। গল্পটি আকারে ছোট। গল্পকার স্বল্প পরিসরে একমুখী অভিনবতায় সহজভাবে সমাপ্তির অভিমুখে এগিয়েছেন। খুব বড় আকারে এখানে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়নি তাই বিশেষ কিছু খোঁজার অবকাশও নেই। অল্পের মধ্যে উপভোগ্য একটি গল্প।

'রবিবার' গল্পটি সম্পর্কে যে প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য সেটি হলো গল্পটির তীক্ষ্ণ-মার্জিত ও চৌকষ ভাষা। আচারনিষ্ঠ বৈষয়িক পিতা ও নাস্তিক পুত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। পুত্রের নাস্তিকতা নিয়ে পিতা অম্বিকাচরণ খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু একদিন গৃহদেবতা ভদ্রকালীর সাথে অভীকের অভদ্র আচরণের কথা পিতার কানে পৌঁছলে তিনি অভীককে গৃহ ছাড়ার নির্দেশ দেন।

অভীক ছিলেন আর্টিস্ট, সেই সাথে মোটর মেকানিক। যে হাতে তুলির আঁচর দিতেন সেই হাত সে পাকিয়ে ছিলেন যন্ত্র বিদ্যাতেও। গৃহহারা হয়ে বোহেমিয়ান জীবন থেকে ছিটকে পড়ে কিছুদিনের জন্য মিস্ত্রিগিরি করেছেন, মুসলমান খালাসিদের সাথে মিশে শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাবারও খেয়েছেন। কিন্তু যখন শনির দশা কাটিয়ে উঠে কিছু অর্থ জমিয়েছেন তখনই অজ্ঞাতবাস থেকে বেড়িয়ে ফিরে গিয়েছেন পুরনো জীবনে। পেয়েছেন বন্ধুদের, দ্বিগুণ

পেয়েছেন বান্ধবীদের। এদের মধ্যে সকলের থেকে আলাদা ছিলেন বিভা। বিভা অভীকের সহপাঠিনী। কিন্তু অভীক ছবি এঁকে এঁকে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে বছর বছর পিছিয়ে যাওয়ায় বিভার লজ্জার সীমা ছিল না। এ নিয়ে অভীককে বিভা অভিযোগ করলে অভীক নানান যুক্তি দেখিয়ে বিষয়টি উড়িয়ে দিতেন।

বিভা ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হওয়ায় ছেলেদের সাথে মেশার লজ্জা কাটিয়ে উঠলেও তার ঘনিষ্ঠ ছেলেবন্ধু ছিলেন অভীক। অন্যদিকে অভীকের বান্ধবীর অভাব ছিল না। অভীকের জীবনে বহু নারীর আগমন ঘটলেও তিনি ছিলেন 'Inscrutable' বিভার পূজারি। অভীকের কাছে আর সব নারীরা নীহারিকামণ্ডলী ধ্রুবনক্ষত্র শুধু বিভা, সকলে আভাস সত্য শুধুমাত্র বিভা। বিভার রূপ নিয়ে অভীকের মন্তব্য ছিল এ সৌন্দর্য শুধুমাত্র আর্টিস্টের জন্য ইতর জনের জন্য নয়। অভীক মুগ্ধ ছিলেন বিভার গুণে। তিনি বার বার স্বীকার করেছেন বিভা তার কাছে আশ্চর্য তাই তার মনে মনে একটি ভয়ও আছে হয়তো শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি বিভার ভগবানকে মেনে নেবেন বিভার সাথে সাথে।

অভীক তার ভালোবাসার কথা স্পষ্টভাবে বিভাকে জানালেও বিভা কোনোদিন অভীককে তার ভালোবাসার কথা জানাতে পারেননি। কারণ বিভা তার বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত, বাপ অন্তঃপ্রাণা ও ধর্মভীরু। বাবার সকল ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছিলেন। তার বাবা সমস্ত বিষয়সম্পত্তি মেয়েকে দিয়ে গেছেন তবে ট্রাস্টীর মাধ্যমে। এবং মোট টাকাটা ছিল বিভার বিয়ের জন্য উপযুক্ত বরের উদ্দেশ্যে। আর অভীক নাস্তিক হওয়ায় তাই বিভার দ্বিধা ছিল তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার। এই কষ্ট ছিল অভীকের কাছে তীব্র। আরেকটি অভিমান অভীক পুষে রেখেছিলেন সে হচ্ছে বিভা তার আর্টের বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। অন্য সব মেয়েদের মতো ভণ্ডামি করে অভীকের স্তব করতেন না। অভীক জানতেন বিভার অন্তরের সততা কিন্তু তার পরও মানতে পারতেন না। এক রবিবারের ছুটির দিনে বিভার বাড়িতে এসে অভীক নানান কথার ভিড়ে জানতে পারেন বিভা তার গণিতের শিক্ষক অমরবাবুকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন দেশের বাইরে গিয়ে দেশের গৌরব বয়ে আনতে। তাতে অভীকের ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। তাই পুজোর চাঁদার টাকা জমাদেন অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফান্ডে এবং বিভাকে না জানিয়ে প্রচণ্ড অভিমানে জাহাজের স্টোকার হয়ে চোখে ঠুলি-পরা ঘানি ঘোরানোর শেষ ছেড়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে সেই রসজ্ঞ গুণী লোকদের দেশে।

'রবিবার' গল্পটিতে বিভার সাথে অভীকের চরিত্রের বৈপরীত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিভা ছিলেন অভীকের জীবনে আগত অন্য সকলের থেকে আলাদা। মানুষের সৌন্দর্য যে মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল নয় নির্ভরশীল ব্যক্তিত্বের উপর তা আরেকবার প্রমাণিত হয় বিভার চরিত্র সূত্রে। বিভা ও অভীকের ব্যক্তিত্বের যত ব্যবধান থাকুক অভীকের প্রতি বিভার মনোভাব ছিল নিগূঢ় ভালোবাসার অভীকের ইচ্ছের সাথে বিভা নিজেকে ভাসিয়ে দিতে বাইরের কোনো বাধা না থাকলেও তার প্রচণ্ড দ্বিধা ছিল হৃদয়ের। একপ্রান্তে প্রেমিক অপর প্রান্তে

বাবা, এ দুয়ের টানাপোড়েনে বিভা ছিলেন দ্বিধান্বিত। কিন্তু গল্পের শেষে দু'জনের প্রেমের পূর্ণতার আশার আলো দেখা যায়, অভীকের সমস্ত বিশ্বাস-মত, চোখ বুজে বিভার কাছে সমর্পণ করার আশ্বাসের ভেতর দিয়ে।

'রাজটিকা' গল্পের শুরুতেই মূল চরিত্র নবেন্দুশেখরের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রসঙ্গটি এসেছে। নবেন্দু যবশেখর ইংরেজরাজ সরকার বিখ্যাত পূর্ণেন্দুশেখরের পুত্র। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে সেলাম-চালনার দ্বারা রায়বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করায়, তার অবর্তমানে পিতার দায়িত্ব পুত্র নবেন্দুশেখর পালন করতে থাকেন তার মাথা তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরেজের দ্বারে দ্বারে সর্বদাই উঠতে পড়তে থাকে।

এদিকে নবেন্দুশেখরের স্ত্রী অরুণলেখার বাবারবাড়ির পরিবেশ ছিল ভিন্ন। অরুণলেখার বড়দাদা প্রমথনাথ ছিলেন চরমভাবে স্বদেশী মনোভাবাপন্ন। এমনি তার এই মানসিকতার স্ফূরণ বিচ্ছুরিত হয়েছে সমস্ত পরিবারে। প্রমথনাথের বিদূষী এবং রূপসী বোনেরা দাদার দেখানো পথের পথিক। তাই নবেন্দুকে সেই গৃহে বর হিসেবে শ্যালিকাদের কাছে সর্বদাই হেনস্থা হতে হয়েছে। বিশেষত বড় শ্যালিকা লাবণ্যলেখা দ্বারা তিনি বেশ কয়েকবার নাকাল হয়েছেন।

পিতার দেখানো পথেই নবেন্দুর পদচারণা। আার তাই তিনি ইংরেজের বিশেষ এক পছন্দের শহরে অনেক ব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান তৈরি করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমে লাবণ্যের গৃহে বেড়াতে গিয়ে লাবণ্য ও তার স্বামী নীলরতনের পাল্লায় পড়ে কংগ্রেসের পক্ষে চাঁদার খাতায় হাজার টাকা সই করে দেন। নীলরতন আশ্বাস দিয়েছিলেন নবেন্দুর এই চাঁদা দানের কথা কোনো খবরের কাগজে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি, এ নিয়ে কংগ্রেস দলে ব্যাপক আলোড়ন এবং ইংরেজ মহলে সমালোচনা শুরু হয়।

লাবণ্যলেখার পক্ষ থেকে নবেন্দুর জন্য সর্বশেষ কষাঘাতটি ছিল ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সাক্ষাতের ঘটনাটি। লাবণ্য বেহারাকে হাত করে মিথ্যাভাবে বেহারার মাধ্যমে নবেন্দুকে জানান ম্যাজিস্ট্রেট তার সাথে দেখা করতে এসেছেন। এদিকে নবেন্দু স্নানের জন্য সর্বাঙ্গে তেল মেখে প্রস্তুতি নিযেছেন বলে তখন বেহারার এই সংবাদে তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে জানতে পান ম্যাজিস্ট্রেট চলে গিয়েছেন। তাই পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তার সম্বোধন জুটে Idiot।

এরপর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশ উপলক্ষে নবেন্দু কলিকাতায় প্রবেশ করা মাত্র তাকে নিয়ে কংগ্রেসের বাড়াবাড়ির সীমা থাকে না। এমনকি কংগ্রেস সভায় যখন পদার্পণ করেন তখন সকলে মিলে উঠে দাঁড়িয়ে বিজাতীয় বিলাতি তারস্বরে হিপ হিপ হুরে শব্দে তাকে উৎকর্ষ অভিবাদন জানান।

এদিকে এই ঘটনায় মহারাণীর জন্মদিনে নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব অন্তর্ধান হয়। আর অন্যদিকে নবেন্দু শ্যালিকামহলে সাদরে নববস্ত্রে ভূষিত হয়ে পুস্পমালা পরে সাদরে অন্তর্ভুক্ত হন। এতে নবেন্দু যথার্য সান্ত্বনা পেয়েছিলেন কিনা তা তার অন্তর্যামীই জানেন বলে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানিয়েছেন নবেন্দু মৃত্যুর পূর্বে রায়বাহাদুর হবেনই আর তার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer; একসাথে শোক করতে ছাড়বে না

'রাজটিকা' গল্পটিতে রাজনৈতিক আবহ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। গল্পে প্রমথনাথ চরিত্রটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মসম্মানবোধকে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র করেছেন। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঝকঝকে ভাষায় সমকালীন কংগ্রেস এবং ইংরেজের দরবারে সেলাম পাঠনোর লোভী দলের নির্মম বিদ্রূপ করেছেন। পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গল্পে সমকালীন রাজনৈতিক অসংঙ্গতি উঠে এসেছে, কিন্তু এত তীব্র ভর্ৎসনা আর কোনো গল্পে লক্ষ্য করা যায়নি। নবেন্দুশেখরের পারিবারিক আবহ ইংরেজীয়ানায় পরিপূর্ণ কিন্তু তার শ্বশুরগৃহে শ্যালক-শ্যালিকারা স্বদেশী মনোভাবাপন্ন। ফলে ব্যাপক টানাপোড়েনের শিকার হয়ে অবশেষে তার ইংরেজ প্রীতির হয় পরাজয়, আশ্রয় নেন তিনি কংগ্রেসে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দেশ প্রেমের আড়ালে যে ভান প্রকটিত হয়ে উঠেছিল এখানে তাই উচ্চকিত হয়েছে। সেই সাথে দেশীয় চাটুকার শ্রেণীকে ব্রিটিশরা কোন দৃষ্টিতে দেখতেন তাও লেখক নবেন্দুশেখর ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আলোচনার মাধ্যমে তুলে আনতে ভোলেননি। মূলত এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের অসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

'রাজপথের কথা' গল্পে গভীর জড়নিদ্রায় নিদ্রিত রাজপথ সজীব। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হয়ে পড়েছিল রাজপথও যেন তেমনি কারো অভিশাপে সুদীর্ঘ অজগর সাপের মতো অরণ্যপর্বতের মধ্যদিয়ে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়ে দেশ-দেশান্তর ঘিরে বহুকাল যাবৎ জড়শয়নে শুয়ে আছে। অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে ধুলায় লুটিয়ে শাপান্তকালের অবসানের অপেক্ষায় আছে রাজপথ। সে চিরকাল অবিচল। কিন্তু তবুও পথের এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই যে তার শুষ্ক শয্যার উপর একটি সিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাতে পারে বা শিয়রের কাছে একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাতে পারে। রাজপথ কথা বলতে পারে না অথচ অন্ধভাবে সবই অনুভব করতে পারে। পথের বক্ষে লক্ষ লক্ষ পদশব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের মতো আবর্তিত হয়। আর রাজপথ সেই চরণের স্পর্শে পথিকের হৃদয় পাঠ করতে পারে প্রতিদিন যারা রাজপথের উপর দিয়ে চলে তাদেরকে পথ বিশেষভাবে চেনে এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। পৃথিবীর কোনো কাহিনি সে সম্পূর্ণ শুনতে পায় না, খানিক শুনতে পায়, সে যেন কারো লক্ষ্য নয় উপায় মাত্র। দূরদেশী পথিক তাকে অভিশাপ দেয়, পথিককে গৃহে পৌঁছিয়ে সে কৃতজ্ঞতা পায় না। বরং পথের উপরই কেবল শ্রান্তির ভার কেবল বিচ্ছেদ। তবুও নিয়মিত পথিকদের রাজপথ ভালোভাবে জানে তাদের জন্য অধীর

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহে অপেক্ষা করে। এমনি একজন ছিল যে তার কোমল পা-দুখানিতে ছোট দুটি নূপুর বাজিয়ে যেখানে রাজপথের একটি শাখা লোকালয়ের দিকে গিয়েছে সেখানে বট গাছের নিচে ম্লানমুখে কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত। অপরজন দিনের কাজ শেষ করে প্রতীক্ষারতা বালিকাকে নিরাশ করে অন্য মনে গান করতে করতে লোকালয়ের দিকে চলে যত। এমনিভাবে প্রতিদিন বালিকা ধীরে ধীরে আসত এবং হতাশায় বুক ভরে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে যেত।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি যখন প্রচুর আমের মুকুলের কেশরে বাতাস মুখরিত তখন অপরজন যে আসে সে আর এলো না। সেদিন বালিকা ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু রাজপথে ঝড়িয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল। তারপর দিন আবার বালিকা অপেক্ষায় থেকে নিরাশ হয়ে পথের উপর লুটিয়ে পড়ে দুই বাহুতে মুখ থেকে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে লাগল সজীব রাজপথ তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারল তার চেয়েও কঠিন, তার চেয়েও মূক একজন এ বালিকাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বলেই বালিকা তার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। তারপর বালিকা উঠে দাঁড়িয়ে চোখমুছে পথ ছেড়ে পাশে বনে চলে গেল। এরপর রাজপথ আজ পর্যন্ত আর তার চরণের স্পর্শ অনুভব করেনি। কিন্তু সেজন্য পথের শোক করার কোনো অবকাশ নেই। এমন কত পদশব্দ নীরব হয়ে গেছে সে সব আজ আর তার স্মৃতিতেও নেই। কত ধনী-দরিদ্র, সুখী-দুঃখী, জরা-যৌবন, জন্ম-মৃত্যু সমস্ত তার উপর দিয়ে একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়ে চলেছে। সেজন্য তার হাসি-কান্নার কিছু নেই। রাজপথ শত সহস্র নতুন অভ্যাগতকে নিয়েই ব্যস্ত। সে কোনো কিছুকেই পড়ে থাকতে দেয় না, কেবল সে নিজেই পড়ে থাকে।

'রাজপথের কথা' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজপথকে বক্তা করে তুলছেন। এখানে রাজপথ 'ঘাটের কথা' গল্পের ঘাটের মতো স্মৃতিচারণা করেনি, বরং বর্তমানে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট সামান্য ঘটনা বর্ণনা করেছে। কাহিনির স্বল্পতার জন্য সমালোচকমহলে গল্পটি গল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু তবুও এর ছোটগল্পত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গল্পে দৃষ্টিশক্তিহীন রাজপথ পথিকের চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করতে পারে। তাই শ্রুতিচেতনা ও স্পর্শচেতনার দ্বারা এক অনামিকা বালিকার বিরহী প্রেমের কাহিনি বর্ণনা করেছে। তবে ঘাটের কথা'য় ঘাট ছিল নায়িকার সমব্যথী, কিন্তু রাজপথ বালিকার ব্যথায় উদাসীন। কেননা প্রতিদিন শত শত পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে পথিকের খণ্ড খণ্ড গল্প রাজপথকে পথিকের ব্যাপারে করে তুলেছে অনাসক্ত। বাতাসের উপর বাতাস যেমন স্থায়ী হতে পারে না, তেমনি রাজপথ কোনো কিছুই ধারণ করে না বা পড়ে থাকতে দেয় না, সে আনন্দই হোক আর বেদনাই হোক। সবকিছু মুছে ফেলে গল্পে রাজপথ হয়েছে গতিময়তার প্রতীক।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পের শুরুতেই দেখা যায় গুরুচরণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গুরুচরণের মৃত্যুকালে গৃহের ভেতরে নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে বসে চিংড়িমাছের চচ্চড়ি কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা তেঁতুল দিয়ে মনোযোগের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

ভাত খাচ্ছিলেন। রোগীর অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন ভেতরে ডাক পড়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সাথে নিঃশেষিত থালাটি রেখে শান্তিতে একটু পান্তা ভাত না খেতে পারার জন্য অভিযোগ করেন।

ডাক্তার জবাব দেয়ার পর গুরুচরণের ছোট ভাই রামকানাই দাদার ইচ্ছানুসারে উইল লেখেন এবং বৃদ্ধ শুধু কম্পিত হাতে সই করেন। উইল লিখতে গিয়ে রামাকানাইয়ের হাতের কলম সরছিল না। কেননা গুরুচরণ তার সকল বিষয়-সম্পত্তি একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপকে না দিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বরদাসুন্দরীকে দিয়ে যান। পান্তাভাত খেয়ে বরদাসুন্দরী যখন আসেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হয়েছে, এসেই বরদাসুন্দরী লোকদেখানো মায়াকান্না শুরু করেন। এবং বরদা সুন্দরীর জা অর্থাৎ রামকানাইয়ের স্ত্রী অভিযোগ করতে থাকেন বৃদ্ধের মৃত্যুকালে বুদ্ধিনাশের ফলেই এমন হয়েছে। এবং গুরুচরণের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ জ্যাঠামশায়ের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মে ক্ষোভে মৃত ব্যক্তিকে শাসিয়ে তার মুখাগ্নি কে করে তা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তার বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে তার মাকে জানান কোনো উপায়ে যদি বাবাকে অন্যত্র পাঠানো যায় তবে অবশ্যই এ বিষয়-সম্পত্তি তার হস্তগত হবে। কথা অনুযায়ী তখন কোনো রকম এক ছল করে কাশীতে পাঠানো হয় রামকানাইকে এবং অল্পদিনের মধ্যে নবদ্বীপ ও বরদাসুন্দরী দু'জনেই একে অন্যের নামে উইল জালের অভিযোগ করে আদালতে গিয়ে হাজির হন। নবদ্বীপের নামের উইলটিতে গুরুচরণের নামের সই দেখে সেটিকে গুরুচরণের হস্তাক্ষর বলে প্রমাণ হয়, অন্যদিকে বরদাসুন্দরীর উইলটিতে নামসই বোঝা দুঃসাধ্য। ব্যাপারটি যখন গোলেমেলে হয়ে ওঠে তখন রামকানাইকে কাশী থেকে তার স্ত্রী ডেকে পাঠান। রামকানাই ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই আদালত থেকে এক সাক্ষীর সপিনা পান এবং স্ত্রী ও পুত্রের ষড়যন্ত্র ক্রমেই বুঝতে পারেন। সম্মুখে ভীষণ বিপদ কল্পনা করে বৃদ্ধ দু'দিন পর্যন্ত জল পর্যন্ত স্পর্শ না করায় একেবারে নির্জীব হয়ে যান। এদিকে বরদাসুন্দরীর একমাত্র সাক্ষী মামাতো ভাইকে যখন নবদ্বীপ বশ করে ফেলেন তখন বৃদ্ধের ডাক পড়ে। চালাক ব্যারিস্টার নিরীহ নির্জীব রামকানাইকে জব্দ করতে একেবারে গোড়া থেকে সব শুরু করেন। কিন্তু রামকানাই জোড়হস্তে জজকে জানান তিনি বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্বল। বেশি কথা বলার সামর্থ্য নেই। দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করে দিয়ে যান। সেই উইল তিনি নিজহস্তে লিখেছেন এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করেছেন। তার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করেছে তা মিথ্যা। এই বলে বৃদ্ধ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বৃদ্ধের এই কথায় পুত্র নবদ্বীপের সাজা হয়। তার বন্ধুরা বৃদ্ধকে সমস্ত শহরের একমাত্র নির্বোধ মানুষ বলে সনাক্ত করেন।

অন্যদিকে বৃদ্ধ বাড়ি ফিরে কঠিন জ্বরে পড়েন। একসময় প্রলাপ বকতে বকতে পুত্রের নাম জপতে জপতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বৃদ্ধের এই মৃত্যু আরো কিছু আগে হলে সবদিক রক্ষা পেত বলে কোনো কোনো আত্মীয় মনে করেন। তবে লেখক তাদের নাম উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক।

Dhaka University Institutional Repository

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে বিষয় সম্পত্তির দেনা-পাওয়া ও উইল জালের মামলাকে কেন্দ্র করে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্রতা গল্পটিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। গল্পে লেখক কিছু কিছু চরিত্রে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। যার ফলে চরিত্রগুলো একেবারে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে। সার্থান্ধতায় উন্মত্ত বরদাসুন্দরী, নবদ্বীপ ও নবদ্বীপের মায়ের সামনে রামকানাইয়ের ব্যক্তিত্ব মানবিক মূল্যবোধে ঋদ্ধ। এবং সবশেষে বলা যায় গল্পের নামকরণ যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ, কেননা নামকরণ করা হয়েছে রামকানাইয়ের পুত্র স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে।

'রাসমণির ছেলে' গল্পে শানিয়াড়ির বিখ্যাত জমিদার অভয়াচরণের বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ছিল ভবানীচরণ। ভবানীচরণের মাতামহ কন্যার বিয়ের সময়ই জামাতার বয়সের দিকটি চিন্তা করে কন্যার বৈধব্যের কথা মাথায় রেখে আলন্দি তালুকটি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অভয়াচরণের মৃত্যুর বহুপরে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র শ্যামচরণ সৎমায়ের সিন্ধুক থেকে উইল চুরি করে পিতার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে ছোটো সৎভাই ভবানীচরণকে বঞ্চিত করেন। স্বামী শ্যামাচরণের এই অনৈতিক কর্মকে স্ত্রী রমাসুন্দরী কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি, কেননা তিনি দেবর ভবনীচরণকে তার পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। আর শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতাকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ব্রজসুন্দরী বার বার মহাপাপ বলে ধিক্কার দিয়েছেন। শ্যামচরণের পুত্র তারাপদ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, আরেকটি নতুন উইল বের করে এবং তাতে দেখা যায় ভবানীচরণের অংশে কিছুই নেই সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেয়া হয়েছে। তখন ভবানীচরণের পুত্র জন্মেনি তাই বলগাচরণের পরামর্শে মামলা করেন। আর সেই মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামায় ভবানীচরণের আলন্দি তালুকের সব খুইয়ে কেবল এক অংশ বেঁচে থাকে। তারাপদ বসতবাড়ি ভবানীচরণকে দিয়ে সদলবলে সদরে চলে যায়, আর সেই থেকে দুই পরিবারে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ভবানীচরণের স্ত্রী রাসমণিকে তাই এই বেহাল সংসারের হাল শক্ত হাতে চালনার ভার নিতে হয়।

স্বামী পুত্র, আত্মীয়-আশ্রিতদের নিয়ে তার সুখের সংসার ছিল না। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। রাসমণি স্পষ্ট ভাষায় তার দারিদ্র্য স্বীকার করতেন এবং তার পুত্র বড় ঐশ্বর্য বলে ভাবতেন। তাই তিনি তার ছেলেকে বাবুআনার শিক্ষা দেননি। দিয়েছেন কঠোর সংযম শিক্ষা। কালীপদও বুঝতে পেরেছিল তাকে জীবনে বড় হতে হবে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেই ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে কলিকাতায় পড়তে গিয়ে কালীপদকে চরম দারিদ্র্যের দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। সেই সাথে সইতে হয়েছে ধনীর দুলাল শৈলেন্দ্র ও তার বন্ধুমহলের অত্যাচার। মায়ের দেয়া পঞ্চাশ টাকার নোট চুরিকে কেন্দ্র করে যখন কালীপদ সেই মহলের সাথে বিবাদে জড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন শৈলেন্দ্র তার পিতা-মাতার চিঠির মাধ্যমে জানতে পারে কালীপদ তার আত্মীয়, সম্পর্কে কাকা। এরপর তাদের উভয়ের মাঝে একটি সুসম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপিত হলেও, কালীপদ সবাইকে কাঁদিয়ে পিতার উইল চুরির প্রতিশোধ না নিয়ে এ সংসার থেকে চিরবিদায় নেয়। পরিশেষে শৈলেন্দ্রের কল্যাণে ভবানীচরণ তার বহু কাঙ্ক্ষিত উইল ফেরত পেলেও পুত্র শোকে তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন।

লেখক 'রাসমণির ছেলে' গল্পটিতে তিনটি প্রজন্মের এক অংশে এবং অপর অংশে চারটি প্রজন্মের উল্লেখ করেছেন। যদিও গল্পটিতে কালীপদের মা রাসমণিকে পিতা-মাতা উভয়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে তথাপি রাসমণির স্বামী ভবানীচরণ গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তমান। রাসমণি তার পুত্র কালীপদকে যদিও আদর্শগত দিক থেকে তার পুত্র হিসেবেই গড়ে তুলেছিলেন। তথাপি অনুভূতিপ্রবণ সহজ-সরল পিতার প্রতিও পুত্রকে দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করেছিলেন। কালীপদ শহুরে জীবনে কঠোর সংগ্রামের শিকার হলেও এক মুহূর্তের জন্য তা তার পিতার চিঠিতে উল্লেখ করেননি। বহু বছরের পুঞ্জীভূত কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে কালীপদ পণ করেছিল পিতা-মাতাকে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার, কিন্তু ভাগ্যের অমোঘ নিয়মে তারই মুক্তি মিলেছে এই সংসারের সকল বন্ধন থেকে।

'রীতিমত নভেল' গল্পের শুরুতেই যবন সেনা ও আর্য সেনার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিন লক্ষ যবন সেনার বিপরীতে কাঞ্চীর সেনাপতি ললিতসিংহের নেতৃত্বে মাত্র পঁয়ত্রিশ জন সৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ভারতবর্ষের জয় নিশ্চিত করে। সেনাপতি যখন শত্রু নিধন করে কাঞ্চীর রাজপদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ নিয়ে রাজ্যে আগমন করেন সেই আগমনকে কেন্দ্র করে হর্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা, দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি ও পথে পথে প্রদীপ মালায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। নগরীর শত শত গবাক্ষ থেকে পুরনারীদের পুষ্প বৃষ্টি বীরকে ক্ষণকালের জন্যও অন্যমনস্ক করতে পারে না। অবশেষে রাজঅন্তঃপুর প্রাসাদের সামনে এসে হঠাৎ করে বীরের সাথে রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার চোখাচোখি হয়ে যায়। যে বীর শত প্রতিপক্ষের নিকট অবিচলিত সে বীর বিদ্যুন্মালার হরিণনেত্রের কাছে পরাভব মানেন। এবং এক সন্ধ্যায় লুকিয়ে রাজকুমারীর দর্শন লাভের প্রত্যাশায় রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করে সেনাপতি বন্দী হন। এ অপরাধে প্রানদণ্ড বিধান হলেও রাজা তাকে পূর্বোপকারের জন্য নির্বাসন দেন। অরণ্যে নির্বাসিত ললিতসিংহ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে দস্যুদল গড়ে তোলেন। এ দস্যুদলটি মূলত গরীবের বন্ধু আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজকর্মচারীদের যম।

উল্লেখ্য যে সেনাপতির মতো মহৎ লোক যারা উপন্যাসে সুলভ কিন্তু পৃথিবীতে দুর্লভ তারা চাকরিও করেন না আবার খবরের কাগজও চালান না। তারা সুখে থাকলে এ মুহূর্তে পুরো পৃথিবীর উপকার করার চেষ্টা করেন আর মনের ইচ্ছা পূরণ না হলে দস্যুব্যবসা আরম্ভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় অপরিচিত এক পথিক রাজবেশে গভীর অরণ্যে দৃঢ়সংকল্পে অগ্রসর হতে থাকেন। পথিকের সংবাদ দস্যুরা ললিতসিংহের কাছে বর্ণনা করলে ললিতসিংহ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে আক্রমণ করেন। এবং ভূতলশায়ী পথিকের মুখে নিজের নাম শুনে বুঝতে পারেন তিনি রাজকুমারীকে হত্যা করেছেন। তারপর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ললিত আত্মহননের পথ বেছে নেন। দলের অন্যেরা পরে দেখতে পান অন্তিম আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দুটি মরদেহ মাটিতে শায়িত।

রাজকুমারী অন্তঃপুরের বাগানে এক সন্ধ্যায় নিজের অজান্তে ললিতের প্রতি অন্যায় করেছিলেন, সেই একই ঘটনা পুনরায় ঘটেছে ললিতের ক্ষেত্রে। গহীন অরণ্যে ললিতের খোঁজে রাজবেশে এসে ললিতের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। জগৎ সংসারের বাইরে যদি মিলনের কোথাও উপায় থাকে তবে তারা উভয়ে উভয়কে ক্ষমা করবেন।

‘রীতিমত নভেল’ গল্পটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প। রোমান্স জাতীয় উপন্যাসে বা গল্পে যে চরিত্রগুলো সুলভ কিন্তু বাস্তবে দুর্লভ সে চরিত্রগুলোকেই গল্পে লেখক কটাক্ষ করেছেন। যবন ও আর্য সৈন্যের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনির মাধ্যমে হিন্দু বীর কাঞ্চীর সেনাপতি ললিতসিংহের গুণকীর্তন করা হয়েছে। গল্পে লেখক রাজনীতির পাশাপাশি কাঞ্চীর রাজকন্যার সাথে সেনাপতির প্রণয় কাহিনিকেও প্রাধান্য দিয়েছেন অতি-নাটকীয় আঙ্গিকে। যদিও চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত গল্পের শেষে উভয়ের মৃত্যু পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে, তথাপি গল্পটি লঘু মেজাজের এবং সবশেষে বলা যায় গল্পটিতে বঙ্কিমী আবহ বিরাজমান।

‘ল্যাবরেটরী’ গল্পের নায়ক নন্দনকিশোর মল্লিক ছিলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। রেলওয়ে কোম্পানির কাজে ঢুকতে পেরেছিলেন তার কর্মদক্ষতায়, কর্তারা তাকে বলতেন জীনিয়াস। কিন্তু বাঙালি হওয়ায় উপযুক্ত পারিশ্রমিক তার জুটত না। তাই এই কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর হওয়ায় নন্দকিশোর তার ডান হাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করতেন, তখন তার মন খুঁতখুঁত করত না। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য তিনি পুষিয়ে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। নন্দকিশোর ছিলেন সাজ-পোষাকে নিতান্তই সাদাসিধে, থাকতেন গলির এক সাধারণ দেড়তলা বাড়িতে। কিন্তু মশগুল ছিলেন তিনি বিজ্ঞানে। তাই বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব বড় করে।

নন্দকিশোর একসময় ব্যবসার কাজে পাঞ্জাবে ছিলেন। সেখানেই জুটে গিয়েছিল তার এক সঙ্গিনী, নাম তার সোহিনী। মেয়েটি নিজে থেকেই নন্দকিশোরকে অনুরোধ করেছিলেন তার আইমার বাড়ি দেনার দায়ে বিক্রি হওয়া থেকে বাঁচাতে। সাত হাজার টাকা হলে তা শোধ হবে। আর তার বিনিময়ে সোহিনী সারাজীবন তার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

থাকবেন। নন্দকিশোর সোহিনীর সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নন্দকিশোর সোহিনীকে যে অবস্থা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয় এবং নিভৃত নয়। বন্ধুরা বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন তা অতিরিক্ত নয় সহনীয় পর্যায়ের।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে প্রৌঢ় বয়সে নন্দকিশোর মারা গেলে, বিধবা সোহিনীকে লবঙ্গলতিকা ভেবে দূরের আত্মীয়েরা মামলার ফাঁদ ফাঁদলেও শেষ পর্যন্ত সোহিনীর সাথে পেরে ওঠেননি। রক্ষা করার মানসিকতা সোহিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি। তার স্বামীর সাধনার তীর্থক্ষেত্র ল্যাবরেটরিকে তিনি যেমন আত্মীয়দের লালসার বাসনা থেকে রক্ষা করেছেন তেমনি রক্ষা করেছেন উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে অভ্যস্ত তার কন্যা নীলার কাছ থেকেও। নীলা ছিল ভাঙন ধরানো মেয়ে। কেননা সোহিনী বেছে বেছে যে ছেলেটিকে খুঁজে ল্যাবরেটরির দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, সেই রেবতী ভট্টাচার্যও হয়েছিল নীলার অসংখ্য শিকারের একজন। সোহিনী কোলকাতার বাইরে থাকার সুযোগে নীলা জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করার মতলব নিয়ে রেবতীর গবেষণাগারে পৌঁছে, তারপর থেকে আস্তে আস্তে রেবতীকে তার খেলনার পুতুলে পরিণত করে।

তবে শেষ পর্যন্ত সোহিনী তার ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করতে পেরেছেন। এবং জাগানী সভার সান্ধ্যভোজে উপস্থিত হয়ে তার টাকার শ্রাদ্ধও দেখেছেন আর দেখেছেন রেবতীর আসল রূপ। অবশেষে রেবতীর আশ্রয় মিলেছে তার পিসিমারই কাছে।

'ল্যাবরেটরি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষের দিকের রচনা। গল্পটিতে রবীন্দ্রভাবনার অত্যাধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির মূল চরিত্রে রয়েছেন সোহিনী। বিজ্ঞান পাগল নন্দকিশোর নিজের জীবনের সাথে সোহিনীকে জড়িয়ে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তার অসবর্ণবিবাহ পছন্দ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন পতিব্রতা স্ত্রী পেতে হলে আগে ব্রতের মিল করাতে হবে। সোহিনীর চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি যাই থাক চিত্তশক্তিতে তিনি ছিলেন অদম্য, একনিষ্ঠ। সমাজে প্রচলিত সামাজিক সতীত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে তার বাঁধেনি। এমনকি আচারধর্মেরও সেবা করতে সে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে কালীতলায় ছোটেন নি, উপরন্তু যে রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের করা কুকুরটি মোটরের তলায় পড়ে পা ভেঙেছিল তাকে পরম স্নেহে তিল তিল করে বাঁচিয়ে তুলেছেন। " বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানা-খোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্য যখন মোহিনী একটা হাসপাতাল বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে–তখন বোঝা যায় যে, রক্ষা-করবার- মনোবৃত্তিই মোহিনীর স্বাভাবিক বৃত্তি। এইখানেই নন্দকিশোর আর মোহিনীর জীবনাদর্শে আশ্চর্য সাদৃশ্য।"[১৪] নিজের অবাধ্য কন্যার উপর তার একবিন্দুও বিশ্বাস ছিল না, আশাও করতেন না কিছু। কিন্তু স্বপ্ন ছিল স্বামীর সাধনার মন্দির সেই ল্যাবরেটরিকে ঘিরে, যেটির একটু ক্ষতি তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই কলকাতা ছাড়ার আগে কন্যাকে

নিজের কোমরবন্ধ ছুরি দেখিয়ে শাসিয়ে গিয়েছেন যে, সে পাঞ্জাবের মেয়ে তাই এ ছুরি তার মেয়েকেও খাতির করবে না। সোহিনীর সমস্ত চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে যে সত্যটি মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হলো তার ধারালো ব্যক্তিত্ব, যাকে নন্দকিশোরই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সত্যিই সোহিনী রবিঠাকুরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

'শাস্তি' গল্পের শুরুতেই চিত্রিত হয়েছে একান্নবর্তী পরিবারে দু'জায়ের কলহ। এ ঘটনাটি এতটাই স্বাভাবিক যে গল্পকার এ ব্যাপারটিকে সূর্যোদয়ের সাথে তুলনা করেছেন। তাদের এ কলহ যেমন পাড়া-প্রতিবেশীদের স্পর্শ করত না তেমনি দুই ভাই ছিদাম ও দুখিরাম ঘটনাটিকে গণনার মধ্যে ফেলত না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো ঘটনার, একদিন জমিদারের কাছারির ঘরে কাজ করে উপযুক্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত ক্ষুধার্ত দুখিরাম স্ত্রী কাছে ভাত চেয়ে তিরস্কৃত হয়ে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে স্ত্রীর মাথায় দা বসিয়ে দেয়ায় দুখিরামের স্ত্রীর মৃত্যু হয় আর এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন তার ছোট ভাই ছিদাম ও ছিদামের স্ত্রী চন্দ্ররা। কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে যখন প্রতিবেশী রামলোচন উপস্থিত হন তখন ছিদাম ভাইকে বাঁচাতে নিজ স্ত্রীর উপর দোষ চাপিয়ে দেন। চন্দরা স্বামীর মুখে এই নির্মম মিথ্যা ভাষণে প্রথম কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। এক মুহূর্তে তাদের অতীত স্মৃতি নিঃশেষিত হয়ে যায় তার কাছে।

এদিকে রামলোচনের বরাত দিয়ে এ সংবাদ সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ছিদাম নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্দরাকে নানা মিথ্যা গল্প কোর্টে বলার শত অনুরোধ করলেও চন্দরা নিজেই বড় জায়ের হত্যাকারী বলে জবানবন্দি দেন। চন্দরার এই প্রগাঢ় অভিমান ছিদামকে দিশেহারা করে তোলে এবং দুই ভাই পালা করে এই খুনের দায় স্বীকার করেন। কিন্তু জজ সাহেব বুঝতে পারেন ঘরের স্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অবশেষে চন্দরার ফাঁসির হুকুম হয়। এবং শেষ ইচ্ছে পূরণের প্রসঙ্গে সে তার মাকে দেখার বাসনা ব্যক্ত করে। যখন তাকে জানানো হয় তার স্বামী তার সাথে দেখা করতে চান তখন চন্দরা কেবল 'মরণ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। মূলত এই একটি শব্দ দ্বারাই চন্দরা তার স্বামী, সমাজ-সংসার ও নিজ ভাগ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়া মানুষের জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত 'শাস্তি' গল্পটি। ভূমিহীনদের শোষণ নিপীড়নের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি স্বামীর ভালোবাসাহীন কাপুরুষোচিত ব্যবহারের প্রতিবাদে গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে একটি নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব। স্বামীর দেয়া মিথ্যা অপবাদে ও অপমানে চন্দরা বিদ্রোহে ইস্পাত কঠিন হয়ে উঠেছেন। ভাইকে বাঁচাতে ছিদাম স্ত্রী চন্দরাকে দোষী সাব্যস্ত করায় তার কাছে তাদের এতোদিনের পুরোনো সাংসারিক বন্ধন, সন্দেহ মিশ্রিত তীব্র ভালোবাসা এক মুহূর্তে শূন্যতায় পরিণত হয়েছে। তাই চন্দরা

পুলিস থেকে শুরু করে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর সকলের কাছে নিজেকে দোষী আর বড় জাকে নির্দোষ বলে স্বীকার করেছেন। আর চন্দরার এই একগুয়েমিই ছিদামকে নিজ জীবনের শূন্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে চন্দরা তার বিদ্রোহকে প্রকাশ করেছেন। " দরিদ্রঘরের কুলবধূ চন্দরা জীবনের না-পাওয়াকে নিয়ে হাহুতাশ জানে না, বর্তমান জীবনকে হৃদয়ের সকল অনুরাগ দিয়ে সে ভালোবাসে। জীবনকে তার সকল সুখদুঃখসহ অঙ্গীকার করবার, তাকে ভোগ করবার প্রবৃত্তি চন্দরার মধ্যে প্রবল, তাই জীবনের ছোটোখাটো দুঃখগুলি নিয়ে তার মনে কোনো বিক্ষোভ নেই। এই চন্দরা যখন পুরুষের স্বার্থপরতার শিকার হ'ল তখন সামান্য নারীসুলভ হাহুতাশ গেয়ে কান্নায় মুষড়ে পড়েনি সে। ফাঁসির রজ্জুকে বরণ ক'রে নেবার বেলা চন্দরার যে সবল ব্যক্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করি সেটি, এককথায়, অতুলনীয়।"[১৫] চন্দরা অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি হয়েও বিদ্রোহ ব্যক্তিত্বের যে উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়েছেন সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। চন্দরা রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ সৃষ্টি।

'শুভদৃষ্টি' গল্পের নায়ক কান্তিচন্দ্রের অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগের পরও দ্বিতীয়বার বিবাহ না করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এর পরিবর্তে পশুপাখি শিকারে মনোযোগী হয়েছেন। একবার তিনি শিকারী বন্ধুবান্ধব, গাইয়ে, বাজিয়ে অকর্মণ্য অনুচর পরিচর নিয়ে নৈদিঘির বিলের ধারে শিকারে যান। সেখানে হঠাৎ প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক কিশোরী রূপ দর্শনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। এমন পরিবেশে এমন চেহারা দেখবেন ভাবেননি। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি তার যে দুটো হাঁসকে বুকে করে নদীতে ছাড়তে এনেছিল তার কাজ শেষ না করে মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হয়ে হাঁস দুটো নিয়ে আবার চলে যায়। কান্তিচন্দ্র কারণ অনুসন্ধানে জানতে পারেন তার এক পরিষদ মিথ্যাভাবে বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখানোতে মেয়েটি চলে যায়। এবং সাথে সাথে তিনি পরিষদের গালে চপেটাঘাত করে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন।

সেদিনই তারা দল বেঁধে বের হন এবং একজন কোনো একটি পাখিকে গুলি করেন। কান্তিচন্দ্র সেই পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করে গিয়ে এক স্বচ্ছল গৃহস্থ বাড়িতে উপস্থিত হন। এবং দেখতে পান এক আহত ঘুঘুকে কোলে নিয়ে সেই অপরিচিত মেয়েটি কাঁদছে।

কান্তিচন্দ্রের ইচ্ছে হয় তিনি নির্দোষ সেটি প্রমাণ করতে কিন্তু তার আগেই মেয়েটি সেখান থেকে উঠে চলে যায়। কান্তিচন্দ্র গৃহ কর্তার কাছে পানি পান করার ছল করে তার নিজ পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এবং সত্যি সত্যি বৃদ্ধ সৎপাত্র তার কন্যাদানের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলে কান্তিচন্দ্র নিজেই সেই কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ তাকে কন্যা দেখার বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কন্যা না দেখেই বিয়ে করতে প্রস্তুত হন। এবং শেষকালে বিবাহের পর শুভদৃষ্টির সময় তার পূর্ব পরিচিত প্রকৃতি লালিত মেয়েটিকে না দেখে অন্য একজন মেয়েকে নিজের বউ হিসেবে দেখতে পেয়ে কান্তিচন্দ্র চমকে ওঠেন। বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণকে প্রতারক ভাবতে যেয়েও আবার নিজের অসাবধানতার কথা ভাবেন। সবশেষে বিবাহ সভায় একটি খরগোশের বাচ্চাসহ তার পূর্ব পরিচিত সেই মেয়েটিকে দেখেন এবং সকলের কাছ থেকে জানতে পান মেয়েটি বোবা এবং কালা পাড়ার সকল পশুপাখির সে প্রিয় সঙ্গিনী।

কান্তিচন্দ্র তখন নিজের অজ্ঞাতে শান্তি লাভ করেন। একটু আগেও যে মেয়েটিকে তার স্ত্রী হিসেবে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, যখন জানলেন মেয়েটি সম্পর্কে তখন তার সমস্ত জগতের উপর থেকে একটি কালিমা দূর হয়ে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি তার মনোনেত্রের সমস্ত বাধা দূর করে একটি সুকুমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সেই মুখের শ্রী স্নিগ্ধতায় অনুভব করেন শ্বশুরের আশীর্বাদ সার্থক হবে।

'শুভদৃষ্টি' গল্পে রোমান্টিকতা বাস্তবতার চরম আঘাতে উদ্ভাসিত। গল্পের নায়ক কান্তিচন্দ্র গল্পের শেষে দুঃস্বপ্নের মোহ মুগ্ধতা থেকে ভাগ্যের জোড়ে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির হাসি হেসেছেন। কখনো কখনো মানুষের অন্তরে রোমান্টিকতার অভ্যুদয় ঘটে শুধুমাত্র প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। এ গল্পে কান্তিচন্দ্র সেই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। নৈদিঘির ঘাটে বিশ্বকর্মার সদ্য নির্মিত নবীন মুখের দর্শনে তিনি যেমন না ভালোবেসে থাকতে পারেননি ঠিক তেমনি ভাগ্যের পরিহাসে তার ভালোবাসার মানুষটি না পেয়েও তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারেননি। কেননা সংসারে প্রতিদিনের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে মূক মানবীর তুলনায় মুখরা মানবীই অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারী নিয়ে পুরুষ কল্পনায় যতই বিভোর হোক দৈনন্দিন আটপৌড়ে জীবনে সেই কল্পনার যে কোনো স্থান নেই এ সত্যই উচ্চকিত হয়েছে 'শুভদৃষ্টি' গল্পে।

'শেষ পুরস্কার' গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র বিমলা। আই.এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে ছাত্রী বিমলার কাছে পুরস্কারের ভার ছিল। সে ছিল সুন্দরী। সেই সাথে অহংকারী। অনুষ্ঠান চলাকালে অসুস্থ মুখচোরা জগদীশপ্রাসাদ এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ সাহস করে একটু কাছে এগিয়ে আসে। তার পায়ে ছিল ঘা তাতে ময়লা ব্যান্ডেজ জড়ানো। তাই দেখে বিমলা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে জানতে চায় এই ছেলে হাসপাতালে না গিয়ে এখানে কেন।

এ ঘটনার পর জগদীশ মন খারাপ করে ঘটনাস্থল থেকে বেড়িয়ে কাঁদতে থাকে। দিদি মৃণালিনী ভাইয়ের জন্য খাবার এনে কান্নার কারণ জানতে পেয়ে রাগে ক্ষুব্ধ হয়ে জানায় একদিন ঠিকই এই মেয়েকে তার ভাইয়ের এই পায়ে পড়তে হবে নইলে তার নাম মৃণালিনী নয়।

মাঝে বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। মৃণালিনী এই বোর্ডিং স্কুলের পরিদর্শক হিসেবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। এবং বহুবছর আগের এমনি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জগদীশের অপমানের গল্পটি উল্লেখ করেন জগদীশের ও বিমলার নাম গোপন রেখে। এবং মেয়েদের কাছে প্রশ্ন রাখেন তারা এখন কি হিসেবে জগদীশকে দেখতে চায়? কেউ বলে কবি, কেউ বিপ্লবী। এদের মাঝে আরেকজন নিমন্ত্রিত ছিলেন মজঃফরপুরের মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকা, তিনি বলেন হাইকোর্টের জজ হিসেবে। এই শিক্ষিকাটিকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কেননা আজ এই অনুষ্ঠানে যিনি প্রাইজ দেবেন তিনি হলেন জগদীশপ্রসাদ তিনি হাইকোর্টের জজ। তিনি বসতেই সেই শিক্ষিকাটি তার পায়ে প্রণাম করে স্কুলের মালা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিলেন। আর এই শিক্ষিকা হলেন সেই অহংকারী বিমলা। আর এই গল্পটি যে লিখেছিলেন তিনি হলেন অবিনাশ। সেই প্রথমবার পুরস্কার বিতরণের দিনে রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর আজ সে জগদীশ জজের অনুগ্রহে সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় হেড-কেরানির পদ পেয়েছেন।

খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের গল্প। পুরোপুরি দু'পৃষ্ঠাও নয়, সম্ভবত সমগ্র গ্রন্থে এর ছোট গল্প আর একটিও নেই। যাই হোক মূলভাব হিসেবে যা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হলো 'অহংকার পতনের মূল'। সুন্দরী বিমলা রূপের অহংকারে যে অসুস্থ জগদীশের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণা প্রদর্শন করেছিলেন পরবর্তী জীবনে সেই জগদীশপ্রসাদকেই ফুল চন্দন দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তার অহংকারের পতন হয়েছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পে শুরুতেই অসুস্থ রুগ্ন নায়ক যতীন তার স্ত্রী মণিকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য মাসিকে একরকম তার ইচ্ছার কথা জানান। মণি অসুস্থ স্বামীর প্রতি উদাসীন হওয়ায় মাসি সবসময় তা মিথ্যা দিয়ে ঢেকে যতীনের সামনে মণিকে পতিপরায়ণা হিসেবে উপস্থাপিত করতেন। আর যতীনের আড়ালে মণিকে শাসন করতেন তার এই নির্লিপ্ত আচরণের জন্য।

হঠাৎ মণির এক জাঠতুতো ভাই অনাথ এসে উপস্থিত হয়, উপলক্ষ মণির সবচেয়ে ছোট বোনের অন্নপ্রাশন। মণির মা তাই মেয়েকে নিতে পাঠিয়েছে। এবং মণি যেতে ইচ্ছুক। এদিকে যতীনের অবস্থা গুরুতর, সে বিষয়ে মণি ভ্রুক্ষেপহীন। মাসি যখন তাকে সাবধান করেন তখন অভিমানে কেঁদে একাকার হয় সে। কিন্তু মাসি ঠিক উল্টো করে যতীনকে জানান। যতীন মিথ্যা ভাষণে বিশ্বাস করে মণিকে আরো অধিক বিবেচক জ্ঞান করেন। সেই রাত্রেই মনি সীতারামপুরে বাবার বাড়িতে চলে যায়, এবং যতীন মাসির কাছে আবদার জানান মণির একটু কথা বলবে বলে। অবশেষে আবার মাসি যতীনের কাছে এসে মণির নামে মিথ্যা প্রশংসা করেন। যতীনের জন্য দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে বলে সে লজ্জায় কাঁদছে তাই মাসি তাকে শুইয়ে এসেছেন, সেজন্য আজ আর দেখা হবে না। ঘটনাটি শুনে যতীন ভেতরে ভেতরে স্বস্তি অনুভব করেন। এবং মাসিকে জানান তিনি

উইলটি লিখে ফেলেছেন তাতে সব কিছু মণিকে দিয়েছেন বটে তবে সব মাসিরই থাকবে। কারণ মণি তো আর মাসির অবাধ্য কখনো হবে না।

এরপর যতীন আবার মাসিকে জানান মণিকে ডেকে দেয়ার জন্য। বৈশাখের দ্বাদশী তাদের বিবাহ বার্ষিকী এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চান মণিকে। কেবল কিছুক্ষণের জন্য সে মণির সাথে কথা বলতে চান। কিন্তু মাসি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না। কাজের লোককে দরজায় রেখে মাসি চলে এলে যতীন কাজের লোকের কাছ থেকে জানতে পারেন মণি তিন দিন পূর্বেই বাবার বাড়ি গিয়েছেন এখনো ফেরেননি। তখন যতীন বিরূপ হয়ে ওঠেন মণির প্রতি। নিজেকে গুটিয়ে আনেন। কেবল মাসিই হয়ে ওঠে তার সবকিছু। অর্থহীন মনে হয় ডাক্তারের চিকিৎসা এবং ঔষধকে। শেষ পর্যন্ত মণিকে নিয়ে তার বাবা আসেন যতীনকে দেখতে। তখন যতীনের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, সে আর মণিকে চিনতে পারেন না।

'শেষের রাত্রি' গল্পটির সুর মৃত্যুর পথযাত্রী যতীনের করুণ আর্তিতে ভারী হয়ে উঠেছে। খুব অল্প কিছু চরিত্রে ও চারটি পরিচ্ছেদে গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ মুমূর্ষু যতীনের দাম্পত্য জীবনের নিষ্ফল কামনার রূপ চিত্রায়িত হয়েছে। একদিকে মণির প্রতি যতীনের অগাধ ভালোবাসা অন্যদিকে মণির নিস্পৃহতায় মাসী বাধ্য হয়েছেন ফাঁপা দাম্পত্যে মিথ্যার আশ্রয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি তথাপি যতীনের প্রতি অন্ধ স্নেহ তাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। যতীন নিজের সর্বস্ব উজার করে দেয়ার পর যখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন মণির উদাসীনতা তখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাই শেষ মুহূর্তে যতীনের জগৎ জুড়ে বিরাজ করেছেন কেবল মাসি। আর কোনো মিথ্যা আশ্বাসকেই আশ্রয় করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করেননি। তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আর ভীত নন যতীন।

'সংস্কার' গল্পের নায়িকা কলিকা খুব স্পষ্টভাষী এবং স্বভাবে আট-সাট প্রকৃতির। অপরদিকে গিরীন্দ্র ছিলেন পোশাকে ও আচার-ব্যবহারে একেবারে ঢিলেঢালা আলুথালু প্রকৃতির। শার্টের পরিবর্তে তিনি পাঞ্জাবী পরতে স্বস্তি বোধ করতেন। তাতে দু'একটা বোতাম না থাকলেও চলত, আগা-চওড়া জুতোর সাথে না পরতেন মোজা, না লাগাতেন কালি। স্বভাবে দু'জনের এত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সমঝোতার মাধ্যমে মিল ছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাদের কিছুতেই মীমাংসা হতে পারেনি। কলিকার বিশ্বাস গিরীন্দ্র দেশকে ভালোবাসেন না এবং নিজের বিশ্বাসের উপর তার খুবই আস্থা। তাই গিরীন্দ্র দেশ ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিন না কেন তা তাদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সাথে মিল না থাকায় তাকে দেশপ্রেমিক বলে কলিকা স্বীকার করতেন না। কলিকা

পূর্বে যে দলে ছিলেন গিরীন্দ্র তাদের উর্দি ব্যবহার করেননি, বর্তমানে কলিকা যে দলে ভিড়েছেন তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারেননি। যে কোনো দলেরই হোক ভেক ধারণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। অপর দিকে কলিকা কাপড় দিয়ে বর্ণ বৈষম্য ঢাকা দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আর সেজন্যই তাদের পাড়ায় জৈনদের পরবের দিনে পুণ্যার্থীদের সাথে সদ্য স্নান সেরে আসা মেথরের একটু ছোঁয়াচের ফলে মেথরের উপর যে নিরন্তর মারের বৃষ্টি ঝড়ছিল সে অবস্থার হাত থেকে রক্ষার জন্য গিরীন্দ্র তাকে তার গাড়িতে আশ্রয় দিতে চাইলে কলিকা অস্বীকৃতি জানান। শুধু তাই নয় গিরীন্দ্রর ইচ্ছেকে উড়িয়ে দিয়ে ধমকের সুরে জানিয়েছেন মেথরকে গাড়িতে ওঠানো হলে তিনি গাড়ি থেকে নেমে যাবেন।

'সংস্কার' গল্পটির বিন্যাস রাজনৈতিক আবহকে কেন্দ্র করে। স্বল্প পরিসরে, অল্প চরিত্রে, গল্পটি একেবারে পরিপাটী। স্বামী গিরীন্দ্র ও স্ত্রী কলিকা দু'জনেই গল্পের প্রধান চরিত্র। যদিও সমকালীন স্বদেশ সাধনায় তথাকথিত আদর্শবাদীদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এই 'সংস্কার' গল্পটির মূল উদ্দেশ্য। দেশপ্রেমিক হওয়ার জন্য যে খদ্দর প্রেমিক হয়ে ওঠার আবশ্যক নেই সেই কথাটিই বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রকাশমান। দেশের নিরন্ন মানুষকে পদদলিত করে মানবতার জয় ঘোষণা, আদর্শবাদের বুলি আওড়ানো শুধু ব্যর্থতারই প্রদর্শন নয় রীতিমত প্রতারণা। আর এই সত্য ভাষণটি লেখক রবীন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রের মুখের ভাষায় স্থাপন করেছেন।

'সদর ও অন্দর' গল্পের শুরুতে ধনী গৃহের পুত্র বিপিনকিশোরের পরিচয় অল্প কথায় উল্লিখিত হয়েছে। ধনী গৃহে জন্ম হয়েছিল বলেই বিপিন ছিলেন ধন উপার্জনে অক্ষম। গানবাজনায় সিদ্ধহস্ত এ সুকুমার তরুণ কাজকর্মে ছিলেন একেবারে অপদার্থ। রাজা চিত্তরঞ্জন জমিদার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস থেকে বিষয় পাওয়ার পর শখের থিয়েটার করার চেষ্টা করছিলেন। এমন পাওয়ার পর শখের থিয়েটার করার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় বিপিনের চেহারা ও গান গাওয়ার গুণে মুগ্ধ হয়ে বিপিনকে তার অনুচর শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে নেন। বিপিন হয়ে যায় রাজার বাড়ির আশ্রিত। বিপিনের সাথে চিত্তরঞ্জনের অতি মেলামেশা চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী রানী বসন্তকুমারী একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। আর তা জানার পর থেকে রাজা চিত্তরঞ্জন বেশি বেশি করে স্ত্রীর সামনে বিপিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। স্ত্রীকে খেপিয়ে তুলে তার ঈর্ষা রাজা উপভোগ করতেন।

এদিকে চিত্তরঞ্জন ও বিপিনের সুভদ্রাহরণ রিহার্সাল শেষে প্রস্তুত। রাজবাড়ির উঠানে তার অভিনয় হয়, চিত্তরঞ্জন কৃষ্ণের ভূমিকায় এবং বিপিন অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। রানী বিপিনের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে রাজার কাছে তার প্রশংসা করলে তিনি মনে মনে বিপিনের উপর রাগান্বিত হন। একদিকে অন্দর হতে গৃহিণী বসন্তকুমারী আস্তে আস্তে বিপিনের প্রতি সদয় হতে থাকেন, গান-বাজনা তার কাছে ভালো লাগতে শুরু করে।

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন শখের গান-বাজনার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠতে- থাকেন। একদিন বিপিনের গানের খাতা নিজের স্ত্রীর হাতে দেখতে পেয়ে রাজা পরের দিনই বিপিনকে বিদায় করে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ রাজার এমন ব্যবহার কোনো সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিপিন তার শেষ সম্বল পুরনো তাম্বুরাটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন।

'সদর ও অন্দর' খুবই সংক্ষিপ্ত একটি গল্প। গল্পের কাহিনি পরিপূর্ণভাবে দানা বেঁধে ওঠার আগেই সমাপ্ত হয়েছে। অন্দরের রানী বসন্তকুমারী ও সদরের রাজা চিত্তরঞ্জনের নীরব মানসিক যুদ্ধের মাশুল দিতে হয়েছে নায়ক বিপিনকিশোরকে। সে ইচ্ছাকৃত কোনো দোষ না করেও রাজার কাছে দোষী তাই সে দণ্ডপ্রাপ্ত। সংসার কর্মে অপটু শিল্পপ্রাণ বিপিন রাজার অকৃত্রিম ভালোবাসাকে অর্থের চেয়ে দামি ভেবেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্যের পরিহাসে রাজার ভালোবাসার সাথে সাথে তার আশ্রয়টুকু ও ছাড়তে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার শেষ সম্বল প্রিয় তাম্বুরাটিই হয়েছে তার সাথী।

'সমস্যাপূরণ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচায়ক।ঝিঁকড়াকোটার দয়ালু জমিদার কৃষ্ণগোপাল তার জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনবিহারীর উপর জমিদারির সকল ভার অর্পণ করে কাশীবাসী হন। বিপিনবিহারী দায়িত্ব পাওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই বুঝে যান তার পিতা যেভাবে ফেলে ছড়িয়ে দান করে প্রজাদের ভালোবাসার পাত্র হয়ে জমিদারি চালিয়ে গেছেন এভাবে আর জমিদারি রক্ষা করা যায় না। তাই তিনি পিতার বিপরীত স্বভাব অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করেন। কৃষ্ণগোপাল থেকে যা দান করেছিলেন বিপিন তা সব একে একে ফিরিয়ে নিতে থাকেন এমনকি সে ব্যবস্থা থেকে ব্রাহ্মণেরাও বাদ যায়নি। কাশী বসে কৃষ্ণগোপাল দুঃখী প্রজাদের কান্না শুনেও পুত্রের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। বিপিনবিহারী সকলকে বশ মানাতে পারলেও মুসলমান প্রজা অছিমদ্দি বিশ্বাসকে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেননি। বৃদ্ধা মির্জাবিবির একমাত্র পুত্র অছিমদ্দি। সে জেদী একরোখা জমিদার বিপিনবিহারীর উপর ক্রোধে অন্ধ। কেননা বিপিনের সাথে লড়াই করতে গিয়ে সে সর্বশান্ত হয়েছে। এক পর্যায়ে সে স্বশরীরে বিপিনের উপর আক্রমণ চালায়। আর সেই অপরাধে অছিমদ্দিকে সমর্পণ করা হয় পুলিশের হাতে। এ ঘটনার পর সমস্ত গ্রামের সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে কেবল বৃদ্ধা মির্জাবিবি পুত্রের জন্য হাহাকার করতে থাকেন।

তিনদিন পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারের দিন নির্দিষ্ট হয়। বিপিনকে জমিদারদের চিরপ্রথা ভেঙে সাক্ষ্য দিতে আদালতে যেতে হয়। বিপিন মহাসমারোহে আদালতে যান। এজলাসে আর তিল ধারণের স্থান নেই। এমনি সময়ে বিপিনের কাছে সংবাদ আসে তার পিতা কাশী থেকে তার সাথে দেখা করতে এসেছেন। খালি পায়ে একটি নামাবলি গায়ে শান্ত সিগ্ধ জ্যোতির্ময় চেহারা নিয়ে বৃদ্ধ জমিদার কৃষ্ণগোপাল কিছু দূরে বটতলায় পুত্রের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিপিন পিতাকে প্রণাম করে উঠতেই কৃষ্ণগোপাল পুত্রকে নির্দেশ দিলেন অছিম যাতে

খালাস পায় সেই চেষ্টা করতে হবে এবং তার যে সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিপিন অবাক হয়ে কারণ অনুসন্ধানে জানতে পারেন অছিম তার পিতার ঔরসজাত সন্তান-তার ভাই। শেষ পর্যন্ত বিপিন বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় এই মোকদ্দমার সমাপ্তি টানেন এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফিরে পায়। এ ঘটনায় চতুর উকিলেরা সমস্ত ব্যাপারটি অনুমান করে নিলেন। বিশেষত কৃষ্ণগোপালের অন্নে মানুষ উকিল রামতরণ সকলের চেয়ে একটু বেশি বুঝলেন যে জগতে সব সাধুরাই তার মতোই কপট।

চিরমানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের মানবতার সুর ধ্বনিত হয়েছে 'সমস্যাপূরণ' গল্পটির মাধ্যমে। গল্পে জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের টানাপোড়েনের পাশাপাশি জমিদার কৃষ্ণগোপালের সামাজিক নিন্দাকে উপেক্ষা করে সত্য ধর্ম প্রচারের বিষয়টি উচ্চকিত হয়েছে। কৃষ্ণগোপাল নামক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যধর্মের যে স্ফুরণ দেখিয়েছেন মূলত সমসাময়িক কালে তা ছিল রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার। বিশেষত যে সময়ে এ গল্পটি লেখা সে সময়ে এমন কঠিন সমস্যার এমন সহজ সমাধান লেখকের পক্ষে অত্যন্ত সৎসাহসের পরিচয় বহন করে। কৃষ্ণগোপাল রবীন্দ্রনাথের মানসসৃষ্টি। তাই কৃষ্ণগোপালের ধর্ম মধ্যযুগীয় আচার-সর্বস্ব ধর্ম নয় তার ধর্ম মানবতাবাদের ধর্ম। আর সেজন্যই যবনীর গর্ভজাত পুত্রকে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে কৃষ্ণগোপাল হীন হলেও হৃদয়ধর্মে তিনি মহান। চিরাচরিত ধর্মনীতির উপরে রবীন্দ্রনাথ তাকে বসিয়ে বিশ্বমানবতার জয় ঘোষণা করেছেন।

'সমাপ্তি' গল্পের নায়ক অপূর্বকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বি.এ. সম্পূর্ণ না করে বিয়ে করবেন না। তাই যথার্থই সে বি.এ. পাস করে মাতৃআজ্ঞা পালনে নিজ গ্রামে ফিরছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকে গ্রামের এক চঞ্চল মেয়ের সমনে হেনস্থা হতে হয়। মেয়েটি তার পূর্ব-পরিচিত, নাম মৃন্ময়ী, আগেও কয়েকবার দেখেছেন। এমনকি অপূর্ব অবকাশের সময়-অনবকাশের সময়ও একে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

অপূর্বর মা যদিও পুত্রের জন্য পূর্ব থেকেই পাত্রী নির্বাচন করে রেখেছিলেন তথাপি অপূর্ব কন্যা না দেখে বিয়ে করতে অসম্মতি জানালে তিনি পুত্রের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু অপূর্ব মৃন্ময়ীর প্রসঙ্গ টানলে মা প্রবল আপত্তি জানান কিন্তু তা সত্ত্বেও অপূর্বই জয়ী হন। তাই বিয়ের পর মৃন্ময়ীকে শাশুড়ি কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারেননি। স্ত্রী ও মায়ের মনোমালিন্যে অপূর্ব কলিকাতা ফিরে যেতে স্থির করেন, মৃন্ময়ীকে রাজি করাতে না পেরে তাকে বাপের বাড়িতে রেখে যান। এদিকে কোনো সামাজিক বা পারিবারিক অনুশাসনের চাপে নয় একেবারে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কখন যে মৃন্ময়ী বালকোচিত স্বভাব থেকে যৌবনে পদার্পণ করে তা সে নিজেও জানে না। সে শুধু এতটুকু বুঝতে পারে পূর্বের সেই অতিপ্রিয় মাতৃগৃহ তার আর আপন নয়। কেবলই অপূর্বর সঙ্গ

পাওয়ার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে থাকে। কিন্তু অপূর্ব আর আসে না। অবশেষে শাশুড়ির সাথে কলিকাতায় উপস্থিত হয়ে অপূর্বর সাক্ষাতে হাসি-বাধায় একটি অসম্পন্ন পাওনা মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

'সমাপ্তি' গল্পটি একটি নিখাদ প্রেমের গল্প। নারীসুলভ পেলবতা-কমনীয়তা বর্জিত পুরুষালী আচরণ বিশিষ্ট মৃন্ময়ী এ গল্পের নায়িকা। বড় বড় দুটি কালো চোখে তার না ছিল কোনো লজ্জা, না ছিল কোনো ভয়। যে দেশে শিকারী নেই বিপদ নেই সেই দেশের হরিণশাবকের মতো সে ছিল নির্ভীক। তার খ্যাতির পরিবর্তে গ্রামে অখ্যাতির কথাই বেশি শোনা যেত। বাবার অতি সোহাগের কন্যা হওয়ায় তার প্রতাপের সীমা ছিল না। সমাজের সকল সংস্কারকে সিকেয় তুলে সে ছিল অকৃত্রিম সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। আর এই নিখাদ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই অপূর্ব সমাজের মাপকাঠিতে সুযোগ্যা কন্যাকে এড়িয়ে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন প্রকৃতির লালিত্যে গড়া মৃন্ময়ীকে।

'সম্পত্তি সমর্পণ' ইংরেজ শাসনামলের একেবারে শুরুর দিকে ভারতীয় পল্লী সমাজের চিত্র এ গল্পের প্লট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পিতা যজ্ঞনাথ কুণ্ডু ও পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ডের মনোমালিন্য দিয়েই গল্পের সূত্রপাত। কৃপণ যজ্ঞনাথের পুত্রবধূর কঠিন অসুস্থতার সময় কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য ঔষধের ব্যবস্থা করায় যজ্ঞনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে কবিরাজকে অনভিজ্ঞ সাব্যস্ত করে বিদায় করে দেন। এতে বৃন্দাবন প্রথমে পিতার পায়ে পড়ে বহু অনুরোধ করেন কিন্তু কোনো কিছুতেই যজ্ঞনাথের পরিবর্তন না দেখে রাগারাগি শুরু করেন। তাতেও যজ্ঞনাথ নির্বিকার থাকেন। শেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর মৃত্যু হলে বৃন্দাবন পিতাকে স্ত্রী-হত্যাকারী বলে গালিগালাজ করে শিশুপুত্র গোকুলকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন।

পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে উৎফুল্ল গ্রামবাসী বৃন্দাবনের অনুপস্থিতিতে তাকে দোষারোপ করে বৃদ্ধ যজ্ঞনাথকে সমর্থন করেন। এদিকে বৃন্দাবন চলে যাওয়ায় বৃদ্ধের একদিকে সংসারের ব্যয় যেমন কমে তেমনি অন্যদিকে পুত্রের হাতে মৃত্যুর আশংকাও নিঃশেষিত হয়। যজ্ঞনাথের কেবলমাত্র একটি দুর্বলতার জায়গা ছিল তার নাতি গোকুল। বৃন্দাবনের সাথে গোকুলও গৃহছাড়া হওয়ায় যজ্ঞনাথের আহারে, পূজায় হিসাব লেখায় উপদ্রব করার কেউ না থাকায় শূন্যগৃহে অতি নিরুপদ্রবে যজ্ঞনাথ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এবং মনে মনে স্থির করেন গোকুল ফিরে এলে আর কোনো বিষয়ে তাকে তিরস্কার করবেন না। কিন্তু ক্রমেই দিন যেতে থাকে কিন্তু গোকুল ফিরে না। যজ্ঞনাথের একা গৃহে মন টিকত না, সে দুপুরে হুকা হাতে বেরিয়ে পড়তেন। কৃপণ যজ্ঞনাথকে পাড়ার বড়রা আড়ালে ডাকতেন যজ্ঞনাশ আর ছোট ছেলেরা লুকিয়ে তামাশা করে ডাকত চামচিকে। একদিন যজ্ঞনাথ দেখলেন একটি অপরিচিত

বালক নিজ কৌশলে গ্রামের অন্য বালকদের দলপতি বনে গিয়েছে। এই ছেলেটি তার সাথে অসংকোচে দুষ্টুমি করত। যজ্ঞনাথ কোনো মতে তার সাথে ভাব জমিয়ে ছেলেটিকে গৃহে নিয়ে আসেন। জানা যায় ছেলেটির নাম নিতাই পাল। পিতা পাঠশালায় পাঠাতে চায় বলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। অল্প দিনের মধ্যে ছেলেটি তার খাওয়া পড়া নিয়ে বৃদ্ধের সাথে ঝগড়া করে নিজের মতামত জাহির করতে থাকে। আর বৃদ্ধকে শাসায় গৃহ থেকে চলে যাবে বলে কিন্তু বৃদ্ধ তাকে বিষয়-সম্পত্তির প্রলোভন দেখিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করতেন।

একদিন যজ্ঞনাথ এক পথিকের কাছ থেকে জানতে পারেন দামোদার নামে এক ব্যক্তি তার হারানো পুত্রের সন্ধানে এই গ্রামের দিকে আসছে। খবর শুনে নিতাই অস্থির চিত্তে পালাতে চায়; বৃদ্ধ তাকে বার বার আশ্বাস দেন যে সে তাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যেখান থেকে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। এ সংবাদে নিতাইয়ের কৌতূহল আরো বেড়ে ওঠে। নিতাই যতই রহস্য আবিষ্কারে আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠে বৃদ্ধ ততই তাকে রাত্রি গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। রাত্রি দু'প্রহরে নিদ্রাতুর নিতাই বৃদ্ধের হাত ধরে ঘুমন্ত গ্রামের পথে বের হয়। নিস্তব্ধ গ্রামে তখন কেবল কুকুরের ডাক আর নিশাচর পাখির আনাগোনায় নিতাই ভয়ে বৃদ্ধের হাত আরো শক্ত করে চেপে ধরে। অবশেষে বহু মাঠ অতিক্রম করে তারা পৌঁছায় এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে। নিজেকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে জায়গাটি নিতাইকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য থেকে একটি পাথর সরিয়ে ফেলতে নিতাই দেখে ভেতরে একটি ঘরের মতো তারপর ভয়ার্ত হৃদয়ে বৃদ্ধের পেছনে পেছনে মই দিয়ে সেই প্রদীপালোকিত ঘরে নেমে পড়ে। নিতাই দেখে ঘরের চারদিকে পিতলের কলস কেবল মাঝের আসনে পূজার উপকরণ। বৃদ্ধ জানায় ধনে পরিপূর্ণ এসব কলস নিতায়ের তবে যদি বৃদ্ধের নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র বা এই বংশের অন্য কারোর আগমন ঘটে তখন নিতাইকে এই অর্থ দিয়ে দিতে হবে। নিতাই মনে মনে ভাবে বৃদ্ধের মাথা খারাপ হয়েছে তথাপি সে মেনে নেয়। বৃদ্ধ তাকে মাঝে বসিয়ে চন্দন, সিঁদুর মালা পরিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন। শেষে ছোট ঘর প্রদীপের ধোয়া ও উভয়ের নিশ্বাস বায়ুতে ভরে উঠল, মন্ত্র পাঠে নিতায়ের জিভ জড়িয়ে তালু শুকিয়ে গেলে প্রদীপ নিভে গেল। অন্ধকারে নিতাই বুঝতে পারল বৃদ্ধ মই বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে তাকে রেখে। নিতাই ব্যাকুল কণ্ঠে জানাল সে বাবার কাছে যেতে চায়। বৃদ্ধ মই উঠিয়ে তাকে রেখে গুহার মুখে পাথর চাপা দেবার কালে শুনতে পেলেন নিতাই রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে 'বাবা' বলে চিৎকার করছে। বৃদ্ধ পাগলের মত পাথর, ইট, বালি ঘাসের চাপড়া সকল কিছু গুহার মুখের উপর চাপা দিতে লাগলেন, এই করতে করতে ভোর হয়ে গেল ক্ষণে ক্ষণে কেবল 'বাবা' ডাক তার কানে বাজতে লাগল। অবশেষে মাঠে পৌঁছে শুনলেন আবার 'বাবা' ডাক দেখলেন তার পুত্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবন জানায় সে তার ছেলে নিতাই পালের খুঁজে তার কাছেই যাচ্ছিল, সেই সাথে জানায় যে তারা গ্রাম ছাড়ার সাথে সাথে নাম ও পরিবর্তন করেছিল। বৃদ্ধ প্রথমে চেতনা হারিয়ে ফেলে তারপর পুত্রকে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে জানতে চান গুহার মুখে কোনো কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। যখন জানতে পারেন কোনো শব্দ নেই তখন থেকেই বৃদ্ধ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে চার বছর পর বৃদ্ধের শ্বাস রুদ্ধ

হয়ে আসে, সে বিকারের বেগে নিতাইয়ের কাছে জানতে চায় তার মইটা কে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি অমোঘ নিয়মে বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আলোহীন বাতাসহীন মহাগহ্বরে থেকে ওঠার মই না পেয়ে ধুপ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়েন।

'সম্পত্তি সমর্পণ' রবীন্দ্রনাথ রচিত নির্মম কাহিনির গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গল্প। সনাতন বিশ্বাসে বিশ্বাসী বিবেকহীন এক কৃপণ বৃদ্ধের সম্পত্তি রক্ষার নামে শিশুহত্যার বর্বরতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ গল্পে। বৃদ্ধ পিতা যজ্ঞনাথ ও পুত্র বৃন্দাবনের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পিতার স্বেচ্ছায় কৃচ্ছসাধনা পুত্রের কাছে যেমন অর্থহীন ঠিক তেমনি পুত্রের সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন পিতার কাছে অর্থ অপব্যয়ের নামান্তর। দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের পার্থক্য গল্পটিকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে, যার নির্মম শিকার একটি ছোট শিশু। অর্থলোভী বৃদ্ধের নিরেট হৃদয়ের একমাত্র স্নেহের বিন্দু ছিল পৌত্র গোকুল। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধে বৃদ্ধ পৌত্রকে যজ্ঞ করে নিজেই নিজের জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তিটি বরাদ্দ রেখেছিলেন। অবশেষে ভাগ্যের পরিহাসে গল্পের শেষে কৃপণ বৃদ্ধ নিজেও যজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন।

'সুভা' গল্পের শুরুতেই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সুচারুরূপে লক্ষণীয়। পিতা বাণীকণ্ঠ তার প্রথম দুটি কন্যার নাম সুকেশিনী ও সুহাসিনী রেখেছিলেন তাই সবচেয়ে ছোটটির নাম শখ করে রেখেছিলেন সুভাষিণী। কিন্তু তার মুখে কোনো ভাষা ছিল না, সে শুধু নিজের অন্তরের ভাষাকে তার বড় বড় দুটি কালো চোখে ফুটিয়ে তুলত।

সুভার তেমন কোনো বন্ধু ছিল না। তার সম-বয়সী বালক-বালিকারা তাকে ভয় করত একরকম, আবার সে যে একেবারে নির্বান্ধব ছিল তাও না। তাদের গোয়ালের দুটি গাভী ছাড়াও ছাগল ও বিড়ালশাবক ও ছিল তার মূকবন্ধু। কিন্তু ভাষাবিশিষ্ট যে বন্ধুটি সুভার জুটেছিল তার নাম প্রতাপ। স্বভাবে ছিল অকর্মণ্য, মাছ ধরা ছিল তার একমাত্র কাজ।

এদিকে সুভার পিতা-মাতা সুভাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সুভাও যেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমেই আপনি আপনকে অনুভব করতে শিখছিল। অবশেষে একদিন চিরপরিচিত গ্রাম ছেড়ে সুভাকে পিতা-মাতার সাথে যেতে হয় কলিকাতায় বিয়ে উপলক্ষে। এবং পাত্র পক্ষের কাছে সুভার কথা বলতে না পারার ব্যাপারটি গোপন করে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যে সবাই জানতে পারে নববধূ বোবা। তাই সুভা ফিরে আসে বাবা-মার কাছে। এবং সুভার স্বামী চোখ কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভালো করে পরীক্ষা করে দ্বিতীয়বার একটি ভাষাবিশিষ্ট কন্যাকে বিয়ে করেন।

'সুভা' গল্পটিতে একটি বোবা মেয়ের করুণ কাহিনির ছবি অঙ্কিত হয়েছে। আশৈশব সুভা বুঝতে শিখেছিল সে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপ। তাই সে সকলের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখত। আর সেজন্যই এই মূক মেয়েটির সম-বয়সী ছেলে-মেয়ের সাথে সখ্যতার বদলে সখ্য গড়ে উঠেছিল মূক পশুদের সাথে। আর সুভার ভাষাবিশিষ্ট যে বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যায় সে গ্রামের অকমর্ণ্য প্রতাপ। মাছ ধরা ছিল তার নেশা। তাই এই কাজে বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাই প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত। কিন্তু সুভা প্রতাপের নীরব সাথী হয়েই তৃপ্ত ছিল না তার ভেতরে সুপ্ত ছিল প্রতাপের কোনো কাজে সাহায্য করে তার কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার বাসনা। ঠিক হৃদয়ানুরাগ না হলেও প্রতাপের প্রতি তার একটু মানসিক দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল। এছাড়া ভাষাহীন সুভার ভেতর দিয়ে নির্বাক প্রকৃতির সাথে মানব প্রকৃতির যে একটি সম্পর্ক রয়েছে তা আবিষ্কারের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এবং গল্পের শেষে নির্দোষ সুভা যে অমোঘ শাস্তি ভোগ করে তা পাঠককে অবাক করে না বটে কিন্তু হৃদয়কে বেদনার্ত করে তোলে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি নারী মুক্তির শ্লোগান। গল্পের নায়িকা মৃণালের চৌকষ ব্যক্তিত্বের আবহ সমস্ত গল্পটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মৃণালের বুদ্ধির জন্য তার মা ছিলেন বিশেষ উদ্বিগ্ন, কেননা তার দৃষ্টিতে মেয়ে মানুষের জন্যে বুদ্ধি এক বালাই ছাড়া আর কিছু নয়। মাত্র বার বছর বয়সে মৃণাল যখন বউ হয়ে শ্বশুরবাড়ির এই নির্বান্ধব প্রাসাদে এসেছিল তার কাছে তখন একমাত্র আপন মনে হয়েছিল গোয়ালঘরের গরুগুলোকে, যে কারণে তার ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়েরা তার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

সন্তানহীনা মৃণাল স্বামীর সংসারে অনেকের মাঝে থেকেও ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ। তার মেয়েটিকে সে সন্ধ্যাতারার সাথে তুলনা করেছেন অর্থাৎ যে জন্ম নিয়েই মাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে। তাই মৃণালের সারা জীবনের আফসোস ছিল মা হওয়ার দুঃখটুকু তিনি পেয়েছেন, কিন্তু মা হওয়ার মুক্তিটুকু পাননি। মুক্তি মৃণালের ছিল, তার কবিতার খাতায়। যেখানে মেজোকর্তার অন্দরমহলের কোনো পাঁচিলের আভাস মাত্র ছিল না, সেইখানে মৃণাল নিজের। তবুও নিজের কন্যাটির অনুপস্থিতি ও বড় জায়ের ছোট বোন বিন্দুর উপস্থিতি তাকে নতুন করে চেনার জানার প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিন্দু বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর খুড়তুতো ভাইয়েদের অত্যাচার সইতে না পেরে এসেছিল বড় দিদির কাছে আশ্রয় প্রার্থিনী হয়ে। বাড়ির সবাই বিরক্ত হওয়ায় মৃণালের বড় জায়ের স্পর্ধা ছিল না প্রকাশ্যে বোনটিকে স্নেহ দেখানোর। তাই উল্টো সংসারের কাজে বিন্দুকে লাগিয়ে সামান্য অবহেলা দেখলে কপট রোষে বাড়ির সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাইতেন বোনের প্রতি তার কোনো সহমর্মিতা নেই। কিন্তু এই হতভাগিনী মেয়েটিকে মৃণাল নিজের কাছে টেনে নিলে দিনে দিনে স্বামীর সাথে তার দূরত্ব আরো বেড়ে যেতে থাকে। কোনো অবস্থাতেই মৃণাল যখন বিন্দুকে কাছ ছাড়া করতে চায়নি তখন তারা বিন্দুকে পাকাপাকিভাবে গৃহছাড়া করতে বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

এতে করে বিন্দুর মৃত্যুটাই অবধারিত হয়। বিন্দু আত্মহত্যা করেছিল, কেননা তার স্বামী ছিল পাগল। এমন স্বামীর ঘর করার চেয়ে আত্মহত্যা করাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

মৃণালের ইচ্ছে ছিল বিন্দুকে নিয়ে তীর্থে চলে যাওয়ার, তাই স্বদেশী ভাই শরৎকে দায়িত্বও দিয়েছিলেন বিন্দুকে পালিয়ে পুরী যাওয়ার ট্রেনে তুলে দিতে। কিন্তু তার আগেই বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে বিদায় নিয়েছে এই তথাকথিত সমাজ-সংসার থেকে। আর বিন্দুর এই মৃত্যুই মৃণালকে তার প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবন-যাত্রা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে সমাজে নারীর প্রতি যে প্রতিনিয়ত অত্যাচার তা অংকনের পাশাপাশি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী নারী মুক্তির চিত্র অংকিত হয়েছে। নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা বরাবরই বৈষম্যের শিকার। নারীকে স্নেহময়ী মা, পুরুষনির্ভরশীল, সৌন্দর্যসামগ্রী, নির্বোধ ইত্যাদির অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যে সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে নারীর বিচরণ সেখানে মুক্ত চিন্তার অবকাশ নেই বললেই চলে। কিন্তু মৃণাল সে দলের নয় যাকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখা যাবে। " মৃণাল শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীত ছিল না। [...] তবুও তাকে চিরকালের জন্য সংসার ছেড়ে যেতে হয়। অভাব থেকে নয়, লাঞ্ছিত হয়ে নয়, দাম্পত্যজীবনের প্রথাসিদ্ধ শান্তি ও প্রাপ্তি স্খলিত হবার জন্য নয়, স্বামী দুশ্চরিত্র বলে নয়। তবুও সে চলে যায়। তার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে কোন্ বিপন্ন বিস্ময় খেলা করেছিল? সে তার নারীত্ব, তার মনুষ্যত্ব-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।"[১৬] মৃণাল তার তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই বিন্দুর মৃত্যুর খবরে মরেছে আসলে সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির মেজোবউ, আর সেই সাথে নতুন ভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছেন মৃণাল।

'স্বর্ণমৃগ' গল্পের বৈদ্যনাথ রবীন্দ্রনাথের আরেকটি সৃষ্ট চরিত্র। শিবনাথ চক্রবর্তী ও মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী দুই ভাই। মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি মোটেও ছিল না, আর সেই সুযোগে বড় দাদা শিবনাথ ছোটভাই মহেশকে স্নেহবাক্যে ভুলিয়ে তার বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র কতগুলো কোম্পানীর কাগজ তার কাছে অবশিষ্ট ছিল।

শিবনাথের পুত্র আদ্যানাথ ও মহেশচন্দ্রের পুত্র বৈদ্যনাথ দুই শরিক। স্বাভাবিকভাবেই শিবনাথের প্রতারণার কারণে বৈদ্যনাথের অবস্থা কিছুটা মন্দ। শিবনাথ তার পুত্র আদ্যানাথের বিয়ে দিয়েছিলেন এক ধনী

পিতার একমাত্র কন্যার সাথে। অন্যদিকে বৈদ্যনাথের বিয়ে হয়েছিল সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা কন্যার সাথে। তার উপর মহেশচন্দ্র এক পয়সাও পণ গ্রহণ করেননি পুত্রের বিয়েতে।

মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তার প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের দিকে দৃষ্টি রেখে বেকার ছিলেন। কাজের মধ্যে তিনি বহু যত্নে তৈরি করতেন গাছের ডাল দিয়ে ছড়ি। এদিকে বৈদ্যনাথের স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীর ক্ষোভ স্বামীর উপর দিন দিন বেড়েই চলছিল। আদ্যানাথের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর সাথে নিজেকে তুলনা করে ক্রমেই তিনি শ্বশুর ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। এবং দৈবধনের অলীক আশায় বুক বাঁধেন। নিজ গ্রামেই এক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে কাশী থেকে আগত খুড়ার প্ররোচনায় তিনি নিজের অলংকার বিক্রি করে বৈদ্যনাথকে কাশী পাঠান। সেখানে বৈদ্যনাথ স্ত্রীর অলংকার বিক্রির অর্থে নির্দিষ্ট বাড়ি ক্রয় করে দৈবধনের সন্ধান করে কোনো কিছু না পেয়ে নিরাশ হয়ে পুনরায় গৃহে ফিরে আসেন। গৃহে ফিরে সন্তানদের সঙ্গ পেয়ে পুরাতন পরিবেশে বৈদ্যনাথ যেন পুলকিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু মোক্ষদা যখন প্রশ্ন করে বুঝতে পারেন তার স্বামী খালি হাতে এসেছেন তখন তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পর মোক্ষদা কোনো কথা বলে শয়ন গৃহে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। দৈবধন না পেয়েও বৈদ্যনাথ এত মর্মাহত ছিলেন না কিন্তু স্ত্রীর এই নিদারুণ ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হয়ে গৃহত্যাগ করেন।

'স্বর্ণমৃগ'-এর বৈদ্যনাথ রবীন্দ্র গল্প ভাণ্ডারে একেবারে নতুন আগত চরিত্র নয়। পূর্বেও এমন কোমল শিল্পমনা বাস্তব কর্মজগতে অপটু ব্যক্তিত্বের দেখা পাওয়া গিয়েছে। বাৎসল্যপ্রীতিতে ভরপুর এক সহজ হৃদয়ে অধিকারী বৈদ্যনাথকে লেখক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। স্ত্রী মোক্ষদার দৈবধনের লোভের বাসনা তাকে চারদিক থেকে চেপে ধরে লোভীর আচরণ করতে বাধ্য করেছেন মাত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে লোভী করে তুলতে পারেনি। কিন্তু নিঃস্পৃহ বৈদ্যনাথের গুপ্তধনের সন্ধান কেবলমাত্র স্ত্রীর অভিপ্রায়ের মূল্যায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। তাই দৈবধনের অপ্রাপ্তিতে বৈদ্যনাথকে মর্মাহত হতে দেখা যায়নি। তিনি মর্মাহত হয়েছেন বরং স্ত্রীর অভিমানে।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র জমিদার মনোহরলালের পুত্র বনোয়ারিলাল। বনোয়ারি সংসারে কোনো কাজের জন্য যথার্থ নন। কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃত কবিতা এই তিনটি বিষয়ে তার বেশ শখ। জমিদারের গোমস্তা নীলকণ্ঠ জমিদার মনোহরের খুবই কাছের লোক, যাকে বনোয়ারি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। প্রথমত, সে ছিল নিজের স্বার্থের বিষয়ে টনটনে; দ্বিতীয়ত, যে কোনো কাজেই বনোয়ারিকে তার হাত থেকে টাকা

গ্রহণ করতে হত। কিন্তু বনোয়ারি নীলকণ্ঠের স্বভাব সম্পর্কে পিতাকে সাবধান করতে গেলে উল্টো মনোহরলাল নীলকণ্ঠকেই সমর্থন করায় বনোয়ারি কুণ্ঠিত হন। তিনি জমিদারের বড় পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের কোথাও তার কোন মতামতের গুরুত্ব না থাকায় এবং নীলকণ্ঠকে পিতা বেশি প্রশ্রয় দেয়ায় বনোয়ারি মনে মনে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন।

একবার মনোহরলালের এক প্রজা মধুকৈবর্ত জমিদারের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে শোধ করতে অপারগ হয়ে যখন তার স্ত্রী সুখদাকে বড় বউ কিরণলেখার কাছে পাঠান শোধ মওকুফ করার তদবিরের জন্য তখন কিরণ তাকে জমিদারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনোয়ারি নীলকণ্ঠকে হুকুম করেন মধুর ঋণ মাফ করতে। কিন্তু নীলকণ্ঠ তা করতে নারাজ। এ নিয়ে বনোয়ারির সাথে তার পিতার ও নীলকণ্ঠের খিটিমিটি বাধে। বনোয়ারি পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে মধুকে সাহায্যে করেন এবং নীলকণ্ঠ তার কুকর্মের জন্য ছয়মাস জেলের সাজা ভোগ করেন। এরপর থেকে আস্তে আস্তে বনোয়ারি শুধু পিতা নন তার আদরে ছোট ভাই বংশীলাল ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী কিরণলেখার কাছ থেকেও দূরে সরে যান।

এর পূর্বেও নীলকণ্ঠের সাথে বনোয়ারির ঝামেলা হয়েছিল। বনোয়ারি অপুত্রক থাকায় নীলকণ্ঠ জমিদার বাবুকে ভুলিয়ে রাজি করান বনোয়ারিকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য কিন্তু তা শুনে বনোয়ারি রাগান্বিত হয়ে নীলকণ্ঠকে মারতে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় বনোয়ারির স্ত্রী স্বামীর প্রতি কৃতার্থ না হয়ে বরং মধ্যযুগীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে নীলকণ্ঠকেই সমর্থন করেছিলেন।

পরবর্তীতে বংশীলালের স্ত্রী পুত্রসন্তান জন্ম দেয়ায় এবং গুরুতর অসুখে বংশীর মৃত্যু হওয়ায় জমিদার মনোহরলাল নিজের মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নাতি হরিদাসের নামে উইল করে যান। এবং বনোয়ারির জন্য যাবজ্জীবন দু'শত টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা রেখে যান, আর নীলকণ্ঠ একজিক্যুটর হালদার পরিবারের সকল ভার তার উপরই থাকে। এ ব্যবস্থায় বনোয়ারি ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে কলিকাতায় চলে যেতে চাইলে কিরণলেখা অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে বনোয়ারি পিতার দেয়া এ ভিক্ষাবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পিতার শ্রাদ্ধের জন্য অপেক্ষা না করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে হালদার পরিবারে মধ্যযুগীয় সাান্ততান্ত্রিক পরিবেশে আধুনিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ বনোয়ারিলাল যে কি অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রবীন্দ্রসৃষ্ট পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বনোয়ারিলাল একেবারেই স্বতন্ত্র। বনোয়ারি নবযুগের নবীন জীবন-সাধনাকে আত্মস্থ করে পারিবারিক সর্বপ্রকার প্রথাবদ্ধ নিয়মকে লংঘন করেছেন। গল্পে বেশ কিছু চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয় মনোহরলাল, কিরণলেখা,

বংশীলাল এবং নীলকণ্ঠ–এরা সকলেই চিরাচরিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী, ব্যতিক্রম কেবল বনোয়ারিলাল। বনোয়ারি প্রচণ্ডভাবে প্রাণধর্মিতার জয়গান করেছেন। তার জমিদার পিতা যে অসহায় প্রজাকে পীড়ন করেছেন সেই প্রজাকেই সাহায্যের জন্য বনোয়ারি পিতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তার দুর্দান্ত অভিনব জীবন চেতনার কারণে সে পরিবারের অন্য সদস্যের কাছে ছিলেন ভীষণ। সেজন্য তার দুঃখ ছিল না তার দুঃখ ছিল কেবল স্ত্রী কিরণলেখাকে বিপদের সময় পাশে না পাওয়ায়। বনোয়ারি নিজের বিদ্রোহী সত্তা নিয়ে জমিদার প্রথার বিরুদ্ধে একা লড়াই করায় সকলের থেকে দূরে সরিয়ে গিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে সে ক্ষান্ত হয়েছেন। এবং নিজের পূর্ব পরিচয়কে ছুড়ে ফেলে জীবনের মধ্যেই নতুনভাবে বাঁচার জন্য মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন।

'হৈমন্তী' গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা, গল্পের নায়কের নাম অপু। গল্পের শুরুতেই বিয়ে ও কনের প্রসঙ্গ। কনের বর্ণনা বিষয়ে বলা যায় অর্থাৎ নায়িকা হৈমন্তী প্রসঙ্গে একদমই সহজ সরল একটি মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদামাটা একটি শাড়ি। যেন শৈলচূড়ার শুভ্রতা নিয়ে এ গিরিনন্দিনীর আবির্ভাব। হৈমর পিতার অর্থাৎ অপুর শ্বশুরের নাম ছিল গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। গৌরীশংকরের ব্যক্তিত্বের বিশালতা তার কন্যা হৈমকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা হৈম কলকাতায় শ্বশুরবাড়ির বিরূপ পরিবেশের আভাস তার পিতার চিঠিতে কখনো উল্লেখ করেননি, এমনকি স্বামী অপুকেও জানতে দেননি।

পারিবারিক সমস্ত সংকট-নিগ্রহতার মাঝে হৈমর একান্ত সান্ত্বনার জায়গা ছিল অপুর সান্নিধ্য। কিন্তু রাস-উপলক্ষে আগত সকল কুটুম্বের সামনে হৈমর বয়স নিয়ে তাকে একগুঁয়ে ও তার পিতাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় তিনি একেবারেই দমে গিয়েছিলেন। সেদিন ভীত হরিণীর মতো স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকেও অপরিচিত মনে হয়েছিল হৈমর।

পরিবারের সবাই জেনে গিয়েছিলেন হৈমর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা কোনটি, তাই সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে তারা দ্বিধাবোধ করতেন না। পিতার আর্থিক অসংগতির পরিচয় পাওয়ার সাথে সাথে শ্বশুরবাড়িতে হৈমর পারিবারিক অবস্থানেরও অবনতি ঘটেছে। তবুও হৈম নীরবে সব সয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তার অসুস্থতার খবরে পিতা তাকে নিতে এসে বেহাইয়ের কাছে হেনস্থা হলে হৈম আর ধৈর্যের বাঁধ রাখতে পারেননি। তার সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকুর সাথে সাথে সে হারিয়ে গিয়েছিলেন চিরতরে।

'হৈমন্তী' গল্পটিতে সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনের নিগড়ে বাঁধা হৈমর যে করুণ পরিণতি তাই বিধৃত হয়েছে। হিমালয়ের শুভ্রতা, খোলা আকাশের অনাবিল প্রসারতা আর পিতার সান্নিধ্যে হৈমর যে ব্যক্তিত্ব তা

ছিল সমস্ত মিথ্যা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। দেব-দেবীর প্রতি তার ভক্তি জন্মায়নি, ভক্তি করতেন তিনি তার পিতাকে। তার কাছে সেটাই ধর্ম যা সত্য। অপুর নিবিড় ভালোবাসা হৈমর মনকে রঙিন করে তুলেছিল বটে কিন্তু দু'জনের ব্যক্তিত্বের মাঝে যে ফাঁকটুকু ছিল তা পূরণ করতে পারেনি। হৈমন্তী সতের বৎসর যাবৎ ভেতরে ও বাইরে যে বিশাল এক মুক্তির মধ্যে মানুষ হয়েছেন সেখানে হৈমর সাথে অপুর সমান আসন ছিল না। হৈমকে অপু সব দিতে পারেন কিন্তু মুক্তি দিতে পারেন না। তা আসলে অপুর নিজের মধ্যেও ছিল না। আর সেজন্যই হৈম এ সাংসারিকতার ক্ষুদ্র পরিসরের সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে নীরবে ধিক্কার জানিয়ে চির-বিদায় নিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', চতুর্থ খণ্ড একত্রে (তৃতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ:১৩৩৩, চতুর্থ খণ্ড: আশ্বিন ১৩৬৯), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮০-২৮১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৭।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫।

১৩. উদয়চাঁদ দাস, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: প্রেক্ষিত বাস্তবতা' প্রথম প্রকাশ-২২ শে শ্রাবণ ১৪০৩, ৭ আগষ্ট, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৮০-৮১।

১৪. তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ; দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা-৭০০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৯৭, পৃষ্ঠা-৩৭৯।

১৫. আনোয়ার পাশা, 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' ষ্টুডেন্ট ওয়েজ ॥ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ কার্তিক, ১৩৭০, পৃ.৩৬।

১৬. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'রবীন্দ্র-গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ,' প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৯১ আগষ্ট, ১৯৮৪, গ্রন্থনিলয় ৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ.-১৬০

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-ছোটগল্পঃ নারীর অবস্থান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ। তিনি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেছেন। 'গল্পগুচ্ছ' তাঁর অনন্য গ্রন্থ। পূর্বের অধ্যায়টিতে 'গল্পগুচ্ছ'-এর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অভিনিবেশ সহকারে আমরা রবীন্দ্র ছোটগল্পগুলো পাঠ করেছি। দেখা গেছে, সব গল্পেই নারীচরিত্র মুখ্য নয় অথবা এমন অনেক গল্প আছে যেখানে নারীচরিত্র নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক যে ছোটগল্পসমূহ লিখেছেন, যেমন 'বলাই' বা 'ছুটি'–এসব ছোটগল্পে নারীচরিত্র থাকলেও তা নাম-মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এসব গল্পে শিশু-মনোরাজ্য বিহার করেছেন। আবার 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে নর্তকীর উল্লেখ মানেই নারীর উল্লেখ নয়। পরিবেশ সৃজনের জন্য এখানে এসেছে নারী। অতএব, আমরা এই অধ্যায়ে সেই ছোটগল্পগুলোকেই মুখ্য বিবেচনা করেছি যে ছোটগল্পসমূহে নারী কোনো-না-কোনোভাবে নিয়ামক চরিত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এতে বর্তমান অধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই অনেক রবীন্দ্র ছোটগল্প আলোচনা বহির্ভূত থাকবে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নারীর অবস্থানকে আমরা মুখ্যত দুই ভাগে বিভক্ত করে বিবেচনা করেছি। যেমনঃ প্রথাগত ও প্রথাবিরোধী। 'প্রথা' হলো বহুকাল ধরে চলে আসা সমাজ বা পরিপার্শ্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক রকম কাচের দেয়াল– যা অমান্য করলে প্রথমেই ক্ষিপ্ত হয় সমাজ। মানুষের মনও প্রথা দিয়ে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই প্রথাকেই সর্বস্ব ভাবে অনেকে। কিন্তু কুপ্রথা থেকে মুক্তির জন্য আসে আইন– যেখানে যুক্তি ও মানবিকতার স্থান মেলে। যেখানে আইন প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানেই শুরু হয় প্রথাবিরোধিতা। প্রথাবিরোধিতা স্বাধীন চিন্তাকারী মানুষের ভেতরে কাজ করে । এই প্রথাবিরোধিতা প্রথমত আসে ব্যক্তি থেকে এবং পরে তা সঞ্চারিত হয় সমষ্টিতে বা সমাজে। বর্তমান অধ্যায়ে কয়েকটি গল্পের আলোকে 'প্রথাগত' এবং 'প্রথাবিরোধী' নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো।

প্রথাগতঃ

'উলুখড়ের বিপদ' একটি সংক্ষিপ্ত ও আপাতদৃষ্টে সাধারণ গল্প। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখড়ের যেমন প্রাণ যায় এ গল্পে প্যারীর অবস্থা অনেকটা তেমন। জমিদারের নায়েব বৃদ্ধ গিরিশ বসু। তার গৃহে দূরদেশী প্যারী নামের এক অল্পবয়সী মেয়ে কাজে যোগ দেয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে সে গৃহিণীর কাছে আশ্রয় চায়। গৃহিণী তাকে গোপনে সামান্য অর্থ দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। প্যারী আশ্রয় নেয় গ্রামের অপর গণ্যমান্য ব্যক্তি হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে। নায়েব হরিহর মহাশয়কে সরাসরি অভিযোগ করেন তার ঝি ভাগিয়ে আনার জন্য। আর এতে হরিহর ভট্টাচার্য কিছু অপ্রিয় সত্য

কথা নায়েবকে শুনিয়ে দেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নায়েব সেদিন মনে রাগ জমিয়ে ভট্টাচার্যের পায়ের ধুলা নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু দু'চারদিন পরই ভট্টাচার্যের গৃহে পুলিশের আগমন ঘটে এবং ভট্টাচার্যের গৃহিণীর বালিশের নিচ থেকে নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বের হয়। ভট্টাচার্য প্রতিপত্তির জোরে পুলিশি হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলেও প্যারী চোর সাব্যস্ত হয়ে জেলে যায়। প্যারীর আর আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছু নেই কেননা তার কথা শুনবে না। সে যেমন গিরিশবসুর বাড়ির ঝি ছিল তাকে হয়তো আবার সেখানেই যেতে হবে।

ক্ষমতাবানদের ব্যক্তিগত ঈর্ষায় ন্যয়বিচার যে নিয়ন্ত্রিত তাই প্রকটিত হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। গল্পে অল্প কিছু চরিত্রের মাধ্যমে চরম সমাজবাস্তবতাকে লেখক দ্বিধাহীনভাবে তুলে এনেছেন।

'একরাত্রি' গল্পটিতে মানব হৃদয়ের প্রেমের হাহাকার উন্মোচিত হয়েছে। গল্পের নায়ক প্রথম জীবনে যাকে উপেক্ষা করেছিলেন সেই পরস্ত্রী সুরবালাকেই পরবর্তী জীবনে না পাওয়ার ব্যর্থতায় বেদনার্ত হয়েছেন। গল্পে নায়িকা সুরবালার ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে গৌণ হলেও প্রচ্ছন্নভাবে তিনিই গল্পের সমস্ত বিষাদময়তার মূল কারণ।

একসময় সুরবালার সাথে নায়কের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাদের অভিভাবকেরা। তখন নায়ক পড়ালেখার প্রসঙ্গ তুলে সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। তাই দু চার মাসের মধ্যেই যখন সুরবালার, উকিল রামলোচন বাবুর সাথে বিয়ে হয়ে যায় এ খবর তখন দেশ উদ্ধারে ব্যস্ত নায়কের কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

এদিকে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে নায়ক যখন নওয়াখালিতে চাকুরীরত তখন ঘটনাচক্রে সুরবালা সেখানে তার প্রতিবেশিনী। নায়ক যান তার স্বামী রামলোচনের সাথে আলাপ করতে এবং বেশ বুঝতে পারেন সুরবালা পাশের ঘর থেকে তাকে নিরীক্ষণ করছে। কিন্তু সুরবালার সাহস হয়নি তার বাল্যের পরিচিত মানুষটির সাথে যেচে আলাপ করতে কারণ সামাজিক প্রথার নিয়মে সে এক আদর্শ গৃহিণী। তেমনি নায়কও সুরবালার সাথে একটু দেখা করার বা কথা বলার সাহস অর্জন করতে পারেননি। কারণ তিনি পরপুরুষ তাই সমাজের রক্তচক্ষুকে অমান্য করা তার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এখন অন্য পুরুষের সাথে কথা বলা অন্যায় সে যতই হোক গ্রামের পরিচিত এক সময়ের খুব কাছের বন্ধু। তার সাথে পূর্বের স্মৃতিচারণা করতে যাওয়ার অর্থ স্বামী ও সমাজের চোখে খারাপ হয়ে যাওয়া, তাই সুরবালা সেই ঝুঁকি নেয়নি।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি বাৎসল্য রসের মহিমায় উদ্ভাসিত। গল্পটি নারী চরিত্র কেন্দ্রিক নয়, গল্পের মূল নায়ক পুরুষ। কিন্তু তবুও যে অংশটুকুতে মিনির মার উপস্থিতি সে অংশটুকুতে তিনি প্রথাগত নারীর ভূমিকাই পালন করেছেন।

অশিক্ষিত রহমত সুদূর কাবুল থেকে বাংলায় এসেছেন জীবন-জীবিকার সন্ধানে। তিনি বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়ান কিন্তু তার মন পড়ে থাকে মরু কাবুলের পর্ণ-কুটিরে। যেখানে তিনি ফেলে এসেছেন নয়নের মণি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাকে। রহমতের বাৎসল্য স্নেহের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় লেখকের পাঁচ বছরের মেয়ে মিনির সাথে সম্পর্ক সূত্রে। তার কর্মব্যস্ত নিঃসঙ্গ জীবনে অতি চঞ্চল মিনি এক আনন্দের ঝর্ণাধারা। আফগানিস্তানে তার ফেলে আসা মেয়েটিকে তিনি আবিষ্কার করেন মিনির ভেতর। শ্রেণি বৈষম্য ভাষা বৈষম্য পিতা রহমতের অপত্যবোধ ও বাৎসল্য প্রীতিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। অপত্যবোধের কারণে মিনিকে কাবুলিওয়ালা পেস্তা, আঙ্গুর, কিসমিস ইত্যাদি দিয়ে শিশু মনকে ভরে দিতেন। লেখক একদিন মিনির হাতে বাদাম-কিসমিস দেখে কাবুলিওয়ালাকে ওসব দিতে নিষেধ করেন এবং তার মূল্যস্বরূপ একটি আধুলি কাবুলিওয়ালার হাতে দেন। কাবুলিওয়ালা এতে মনে মনে আহত হলেও অসংকোচে আধুলিটি গ্রহণ করে পরবর্তীতে মিনির হাতে তা ফেরৎ দেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিনির মা পরিবারে গোলযোগ তৈরি করেন। তিনি কাবুলিওয়ালার আচরণে শংকিত হন, তার ধারণা কাবুলিওয়ালা অসৎ মতলবের লোক হতে পারে এবং লেখককে তিনি বার বার অনুরোধ করেছিলেন রহমতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য। লেখক স্ত্রীর ভয় দূর করতে চাইলে মিনির মা মানুষের সন্তান চুরি, কাবুলের দাস ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলে লেখককে থামিয়ে দিতেন। মিনির মায়ের দেখা-শোনার গণ্ডীটা ছিল ছোট তাই তার ভাবনার জগৎটাও সামান্য। সেইজন্য রহমতের সহজ স্নেহকে তিনি সহজভাবে নেননি। কিন্তু তাই বলে লেখক স্ত্রীর কথায় বিনা দোষে রহমতকে বাড়িতে আসতে বারণ করতে পারেননি। বরং এই অসম বয়সী বন্ধুত্বকে তিনি উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন।

'খাতা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বালিকা উমা। সাত বছরের 'বালিকা' উমা লেখা শেখার পর থেকে বউঠাকুরাণীর গল্পের বই, দাদার খবরের কাগজ, বাবার হিসাবের খাতা কোনো কিছু তার কাঁচা অক্ষরের হাত থেকে রেহাই পায় না।

এদিকে সারগর্ভবিহীন রচনার রচয়িতা উমার দাদা গোবিন্দলাল উমাকে তার লেখা নষ্ট করার জন্য শাস্তিস্বরূপ উমার লেখার উপকরণ কেড়ে নেন। পরবর্তীতে অনুতপ্ত চিত্তে সকল উপকরণ ফিরিয়ে দেওয়ার সময় একটি খাতাও উপহার দেন। বছর দুয়ের মধ্যে খাতাটিতে ভূমিকা উপসংহার ছাড়া স্বাধীন রচনা স্থান পেতে থাকে।

নয় বছর বয়সে উমার দাদার সহযোগী লেখক প্যারীমোহনের সাথে উমার বিয়ে হয়। প্যারীমোহন পুরাতন ধ্যান ধারণার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। উমা বিয়ের পূর্বে দাসীর কোলে উঠে খাতাটি নিয়ে বিদ্যালয়ে যেত বলে বিয়ের পর দাসী যশোদা সেই খাতাটি উমার স্বামীর গৃহ পর্যন্ত নিজ গরজেই নিয়ে আসে। শ্বশুরবাড়ি আসার পর নিঃসন্দেহে উমা তার সকল দুঃখ বেদনার কথা খাতায় লিখে রাখত।

একদিন দরজা বন্ধ করে সে খাতায় লিখছিল আর তা তার তিন ননদীরা দেখে ফেলে এবং এ কথা উমার স্বামীর কানে পৌঁছায়। আর খাতা গিয়ে পরে স্বামীর হাতে। তার এতদিনের সঞ্চিত কথামালা সেদিন সকলের সামনে অনাবৃত হওয়ায় এবং তাদের সম্মিলিত উপহাস উমাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেয়। সেদিন থেকেই উমা আর খাতাটি হাতে পায়নি। কিন্ত প্যারীমোহনের শুকনোতাত্ত্বিক প্রবন্ধেপূর্ণ খাতাটি অক্ষত ছিল।

'খাতা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র উমা। গল্পে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার রূপ চিত্রায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে খুব সুচারুভাবে রক্ষণশীল সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন লেখকদের তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করে জয়গান করেছেন অপটু সরলপ্রাণা রচয়িতা উমার। উমাকে স্বামী-গৃহে পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু মানসিক নির্যাতন তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সে মর্মান্তিক আহত হয়েছে যখন তার মধুর স্বাধীনতার আস্বাদ খাতাটিকে তার স্বামী ও ননদীরা উপহাস করেছে। তার প্রতিবাদের কোন ভাষা ছিল না, তাই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর দেখানো পথে পাঠকদের ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়েছে তর্কবাগীশ গোবিন্দলাল ও প্যারীমোহনের জন্য আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে উমা ও তার খাতা।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘাটের কথা' গল্পটিতে কঠিন পাষাণে তৈরি গঙ্গার ঘাটকে গল্পবক্তা করে তুলেছেন। শ্রোতার উদ্দেশ্যে ঘাটের যে স্মৃতিকথন তাতে বাহুল্য নেই, একটি প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে বটে তবে তা বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। যেন গল্পের মাঝেই গল্পের জন্ম। গঙ্গার ঘাটের স্মৃতিকথার যে অংশটুকুতে নায়িকা কুসুমের উপস্থিতি সে অংশটুকু মর্মান্তিক। মূলত এই বেদনাঘন কাহিনি শোনানোর অভিপ্রায়েই ঘাটের এই স্মৃতিচারণা। আট বছর বয়সেই বাল্যবিধবার অভিশপ্ত জীবন নিয়েও কুসুম ধীরে ধীরে প্রকৃতির আশীর্বাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশেষে তাদের গ্রামে দশ বছর পর আগত তরুণ সন্ন্যাসীর সেবা করতে গিয়ে দেব সেবায় তার ফাঁকি নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। অখণ্ড ভক্তির সাথে কুসুম দেব-সেবায় সম্পৃক্ত হলেও নিজেকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি বলেই সে সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হতে পারছিল না। অন্যদিকে সন্ন্যাসীও কুসুমকে দেখার জন্য ছিল ব্যগ্র। তাই দেব-সেবায় আলস্যের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ত চেয়েছেন। কুসুমের সমস্যার কথা জেনেছেন কিন্তু সমাধান হিসেবে যথার্থ পদক্ষেপ নেননি।

কুসুম ও সন্ন্যাসীর অন্তরে যে দীর্ঘশ্বাস জমা হয়েছে তা পাঠককে ব্যথিত করে। পূর্বেই সন্ন্যাসীর কাছে কুসুমের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে কিন্তু তারপরও তিনি গ্রাম ছেড়ে যাননি। অথচ যখন জানতে পেরেছেন কুসুমের মনের দুর্বলতার কথা তখন তাকে কঠিন শর্তে আবদ্ধ করেছেন এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য শেষে গ্রাম ছেড়েছেন। কুসুমের উচিৎ ছিল সন্ন্যাসীর এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা কিন্তু তা কুসুম করেনি। অন্যদিকে তার প্রেম ছিল তার অস্তিত্ব যে প্রেমকে ভোলা ছিল তার কাছে মৃত্যুর শামিল। তাই সামাজিক প্রথা মেনে কলঙ্কের ভয়ে প্রতিদানহীন প্রেমকে কুসুম আত্মহননের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতি মানুষের ভেতরেই এই

স্বাভাবিক মানসিক ও মানবিক দুর্বলতা রয়েছে, কুসুম ও সন্ন্যাসী এর ঊর্ধ্বে নয়। সন্ন্যাসী ভণ্ডামী করেছেন আর কুসুম আত্মহত্যা। যা যৌক্তিক ছিল না।

অচিরা 'ছোটোগল্প' গল্পের একজন প্রথা মেনে বড় হওয়া নারী। অবশ্য সে প্রথা মানে সে প্রথাকে পরীক্ষা করার জন্য। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত অচিরা অরণ্যে এসেছেন মূলত লজ্জা ঢাকতে। প্রথম প্রেমিক ভবতোষের কাছ থেকে প্রতারিত হয়ে দাদু ও নাতনি আশ্রয় নিয়েছেন লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এই বনে। ভবতোষ অধ্যাপকের ছাত্র ছিলেন, এমনকি অধ্যাপক ও তার নাতনি দু'জনেরই মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। অচিরার বিয়ে পাকা হয়েছিল ভবতোষের সাথে, অপেক্ষা শুধু বিলেত থেকে ফেরার। এমনকি বিলেতে যাওয়ার খরচ জুগিয়েছে অচিরার বাবা। কিন্তু আশা হয় ভঙ্গ। লোভী ভবতোষ বিলেত থেকে সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরে ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের উচ্চপদস্থ মুরব্বির কন্যাকে বিয়ে করেন। সেই থেকে অধ্যাপক ও তার নাতনি লোকসমাজ থেকে দূরে চলে গিয়েছেন।

নবীন সব খবর জেনেছেন তার কেমব্রিজের সতীর্থ প্রফেসর বঙ্কিমের বরাত দিয়ে। এবং এও বুঝতে পেরেছেন অচিরার প্রতি তার মনের কোণে কোথাও একটা অনুভূতির জন্ম নিয়েছে। আর তা অচিরার কাছে ধরা পড়ায় অচিরা ধিক্কার দিয়েছেন নিজেই নিজেকে। অচিরার মনে হয়েছে প্রতিভাবান একজন মানুষ শুধুমাত্র তার জন্য ছিটকে পড়বে তার কর্মজগৎ থেকে, এটা তিনি ভেতর থেকে মানতে পরেনি। এমনকি অচিরা নিজেও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন নবীনের প্রতি। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়েছেন মনকে।

অচিরা ভবতোষকে চিঠি লিখেও পোস্ট করেননি। হয়তো তার মনে হয়েছে, যে ভবতোষ তার ব্যক্তিসত্তাকে মূল্যায়ন করেনি তার সাথে আর কেন? "অরণ্যের নির্জনতায় অচিরা নিজের ভালোবাসার আদর্শ ফিরে পেয়েছে। ভবতোষকে সে আর ভালোবাসে না, কিন্তু নিজের প্রথম প্রেমকে সে ভালোবাসে যাকে সে সতীত্ব বলে আখ্যা দিয়েছে।"[১] অচিরা মূলত ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতায় উদ্ভাসিত। তিনি নিজেকে নবীনের মোহ থেকে মুক্ত করেছেন আবার নবীনকে তার বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে লোকালয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জয়গান করেছেন নারীর মনুষ্যত্বের। আবার সাথে সাথে এও বলা যায় তিনি সবকিছু থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এমনকি নিজের কাছ থেকেও, বঞ্চিত করেছেন তিনি নিজেকে সবকিছু থেকে। তবে এ সিদ্ধান্ত অচিরার আত্মছলনা নয়, এ তার স্বাতন্ত্র্য।

'তপস্বিনী' গল্পে ধর্মীয়-সংস্কার বাস্তবতার কষাঘাতে বিদীর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব এমনিভাবে কৌতুকের আবরণে একটি গল্পকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নেয়া। গল্পের নায়ক বরদাকে কেন্দ্র করে কাহিনির সূত্রপাত হলেও গল্পের মূল চরিত্র বরদার স্ত্রী ষোড়শী এবং ষোড়শী সম্পূর্ণরূপে একজন প্রথাগত নারী।

বরদা ছিলেন লেখাপড়ায় অমনোযোগী। তাই নতুন বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে তার সংসার ধর্ম শুরুতে বাধা হয়েছিলেন তার পিতা মাখনবাবু। তিনি চেয়েছিলেন আগে পুত্রের বি.এ. পরীক্ষার কৃতকার্যতা, তারপর সংসারধর্ম। আর সেই কারণে বহু অর্থ ব্যয়ে মাখনবাবু বরদার জন্য নামজাদা সব শিক্ষক নিয়োগ করেন, এবং বরদার বাবুয়ানার করার জন্য যে ঘোড়ার গাড়িটি ছিল তা বিক্রি করে দেন। আদরে লালিত বরদা স্কুলে হেঁটে যাওয়ার অপমান সইতে না পেরে নিরুদ্দেশ হন। এবং যাওয়ার আগে একটি চিরকুটে তার সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেন। বরদার এই গৃহ ত্যাগের ঘটনা সকলের কাছে হাসি-তামাশার বিষয় হলেও তার স্ত্রী ষোড়শীর কাছে তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তার স্বামী সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হয়েছেন, তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেই চিরকুটের কথাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন। ক্রমেই যখন দিন-মাস-বছর গড়িয়ে যেতে থাকে তখন সকলে বরদার দোষগুলো ঢেকে তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। এতে করে ষোড়শীর মন গৌরবে ভরে উঠে। একটি কল্পমহিমায় বরদাকে দাঁড় করিয়ে ষোড়শী আত্মছলনায় মেতে উঠেন। ষোড়শী ঘরে থেকে সন্ন্যাসের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন তার সমস্ত বিশ্বাসকে এই ছলনা আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনি অভ্যাসের আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে তার চারিদিকে কৃচ্ছ্রসাধনায় কাঁটা গেড়ে নিজেকে সকলের কাছে পুণ্যবতী বলে উপস্থাপিত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। তিনি বুঝতেও পারেননি তিনি কিভাবে আস্তে আস্তে ভণ্ডদের দলভূক্ত হয়ে যাচ্ছেন। মাখন পুত্রবধূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করায় সাহস হারিয়ে ফেলেন, ষোড়শী যা বলেন তিনি তাই করেন। এতে করে তার গৃহ হয়ে যায় ভণ্ড সাধু, কপট যোগী সন্ন্যাসীদের আস্তানা। দেনার দায়ে যেকোনো দিন মাখনের সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, অথচ এসবে ষোড়শীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই বরং তিনি খুশি।

কিন্তু এমন সময়ই ঘটে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটি। মাখনবাবু যখন ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন তখন সাহেবি পোশাক পরা বরদা কাপড়-কাঁচা কল কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে ফিরে এসে বাবাকে চমকে দেন। আর এখানেই লেখকের স্বাতন্ত্র্য।

কাহিনির শেষের বিদ্রূপাত্মক দৃশ্য ষোড়শীকে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, "যে-রমণী নিজের সযত্নে গড়ে তোলা আত্মছলনার দুর্গ থেকে খোলা কঠিন বাস্তবতায় নিক্ষিপ্ত হল তার কষ্ট সব হাস্য-

রসিকতা ছাপিয়ে স্পর্শ করে। রচয়িতার একটি আঙ্গুল এই লুকানো তারটি বাজিয়েছে জেনেশুনেই এবং এর ফলেই গল্পটির মান বেড়েছে।"[২]

'দর্পহরণ' গল্পটি কৌতুক রচনা। সংসারে গিন্নীর অনুপস্থিতিতে কর্তা সংসারে লক্ষ্মীস্থাপনের জন্য আঠার বছর বয়সী হরিশকে বিয়ে দিয়ে বার বছরের কন্যা নির্ঝরিণীকে ঘরে আনেন। হরিশচন্দ্রের পড়াশোনা সম্পূর্ণ না হওয়াতে কর্তা তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে পুত্রবধূকে পাঠদানে প্রবৃত্ত হন। তাই বাধ্য হয়ে নবদম্পতিদের মাঝে চিঠি আদান-প্রদান শুরু হয়।

এদিকে নির্ঝরিণীর জ্যাঠতুত বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে তার কাব্যপ্রতিভার কথা শ্বশুরমহাশয় থেকে শুরু করে হরিশের বন্ধুমহলেও প্রচার হয়ে যায়। যা হরিশের কাছে প্রীতিকর কোনো ব্যাপার ছিল না। তাই শ্বশুরমহাশয় যতই পুত্রবধূকে নির্বিচারে উৎসাহ দিয়েছেন স্বামী হরিশ ততই সতর্কতার সাথে ত্রুটি নির্দেশ করে স্ত্রীকে সংযত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি যখন নির্ঝরিণীর লেখা কর্তা কাগজে ছাপতে উদ্যত হয়েছেন তখন হরিশ নিজে উদ্যোগী হয়ে তা বন্ধ করেছেন।

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝাই যাচ্ছে হরিশ তার শিক্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে মনে মনে ভয়ে থাকতেন, পাছে নির্ঝারিণী তাকে টপকিয়ে যায়। কিন্তু বেশিদিন আর স্ত্রীর প্রতিভা লুকিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ মাসিক 'উদ্দীপনা' পত্রে গল্প চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হলে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই গল্প পাঠিয়ে বিজয়ী হন নির্ঝরিণী। কিন্তু দেখা গেল নির্ঝর স্বামীকে পরাস্ত করে বিজয়ী হওয়ায় সংসারে স্বামী-স্ত্রীতে অশান্তি শুরু হয় যা নির্ঝর চায়নি অর্থ্যাৎ তার এই মানসিকতাই জানিয়ে দিচ্ছে সে প্রথার বাইরে যেতে চায় না। সংসার একটি নারীর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ত্যাগ কি শুধু তাকে করতে হবে? হরিশকে কি এটা বোঝানো উচিত ছিল না নির্ঝরের। অথচ তিনি তা করেননি। তাই সে অশ্রুসিক্ত হয়ে তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি দাহ করেছে, আর হরিশ তার স্ত্রীর এই মহৎ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে সকল দম্ভ ত্যাগ করে স্ত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

'দর্পহরণ' গল্পটিতে পারিবারিক জীবনের বাইরে অন্য কোনো বিষয়ের পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না। হরিশের চরিত্রে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের কাছে নিজেকে বড় এবং স্ত্রীকে সামান্য ক্ষুদ্র ভাবার একটি প্রবণতা প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু সত্যিই যখন নির্ঝরিণী নিজের সুখ্যাতিকে ঢেকে সংসারে শান্তি রক্ষার্থে ব্যগ্র হয়ে ওঠে তখন হরিশচন্দ্র নিজের দম্ভ পরিত্যাগ করে দীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

'দৃষ্টিদান' গল্পের শুরুতেই গল্পের নায়িকা কুমুদিনীর স্বামীর আকাঙ্ক্ষায় শিবপূজার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। আট বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মেডিকেলের ছাত্র অবিনাশের সাথে তার বিয়ে হয়। কুমুদিনী চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। শরীরের নানা দুর্বলতায় মনের খেদে চোখের রোগে আক্রান্ত

হয়। অবিনাশ নতুন নতুন ডাক্তারি বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহবশত কুমুকে ভালো চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে নিজেই চিকিৎসা শুরু করেন। কুমুর দাদা তার এই গোঁড়ামির জন্য প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু অবিনাশ তার কোনো কথাই আমলে নেননি। দাদা বোনের চিকিৎসার জন্য অন্য একজন ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কুমু সংসারের শান্তির জন্য দাদার দেয়া ঔষধ ফেলে দিয়ে স্বামীর মন রক্ষার জন্য তার চিকিৎসা গ্রহণ করে। অবশেষে যা হয় তা হলো অবিনাশের অভিজ্ঞতা কম হওয়ায় কুমুর দুটো চোখই নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও সেই একই কথা সংসারের শান্তি। সেজন্য কুমু একেবারে সাংসারিক নারীর ঊর্ধ্বে উঠে নিজের মহামূল্যবান দুটো চোখই হারিয়ে ফেলে।

কুমুদিনী শুধুমাত্র নিজের সংসারের শান্তি ও স্বামীর কথা চিন্তা করে নিজের চোখ দুটো নষ্ট করেছে, অথচ একদিন এই কুমুকে রেখে তার স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার কুমুর কাছে ফিরে আসেন।

'দৃষ্টিদান' গল্পটিতে লেখক এক মানবী পাশাপাশি দেবী-প্রতিমার চিত্র অংকনের চেষ্টা করেছেন। যার জন্ম এ যুগে কিন্তু তার চিন্তা-চেতনার মূল কেন্দ্রিভূত ছিল ভারতীয় জীবনাদর্শের মাঝে। কুমুদিনী অন্ধ হলেও তাকে লেখক একেবারে পরনির্ভরশীল না করে ব্যক্তিত্বময়ী করে উপস্থাপিত করেছেন। অধিক ব্যক্তিত্বময়ী হওয়ার কারণে স্বামীর সহজ প্রেম স্ত্রীর প্রতি বিকশিত হতে দেখা যায়নি। সাধারণ মানবীর পরিবর্তে দেবী হিসেবেই কুমু স্বামীর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। কুমুর স্বামী আত্ম-অহমিকার বশবর্তী হয়ে কুমুর প্রতি অবিচার করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্ত্রীকে দেবী মহিমায় মণ্ডিত করে নিজে এক ভুলের আবর্তে আচ্ছন্ন থেকেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা তাদের হয়েছে, ফিরে পেয়েছেন একে অন্যকে।

'নামঞ্জুর গল্প' গল্পটি রাজনৈতিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অমিয়া সমস্ত গল্পে প্রথাকে অবহেলা করলেও শেষ পর্যন্ত প্রথাগত চরিত্রই হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের পর যে রাজনৈতিক আবহ দেশে বিরাজ করছিল তারই বরপুত্র গল্পের নায়ক। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেছেন আর সে কারণেই তিনি ছিলেন শারীরিকভাবে অসুস্থ। মা ও বাবার মৃত্যুর পর নায়কের দূর-সম্পর্কের পিসি এবং পিসির স্বামীর অন্যপক্ষের কন্যা অমিয়াই ছিল তার নিকট আত্মীয়। নায়ক পিসি ও অমিয়াকে নিয়ে পশ্চিম থেকে চলে আসেন কলকাতায়।

নায়ক অসুস্থ শরীরে নিষ্কর্ম অবস্থায় খেয়াল করলেন অসহযোগের প্রবল হাওয়ায় অমিয়া হয়েছে কলেজত্যাগিনী। হাজারো মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে অপরিচিত লোকের কাছে অনাথসদনের জন্য চাঁদা তুলতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে সে তার অসুস্থ দাদাকে একটু দেখার সময় পেত না। তার দলের ছেলেরা

তাকে 'যুগলক্ষ্মী' সম্ভাষণ করত। তাই নিজেকে অমিয়া সেই পদবীর উপযুক্ত করতে সদাই থাকত অস্থির। অমিয়া অনাথসদনের জন্য বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে বেড়াত অথচ নিজগৃহে পিসিমার গ্রামের আশ্রিতাদের সে মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। যে হরিমতির একটু সেবা বিপ্লবীর কাছে অন্য সকল প্রাপ্তির চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই হরিমতি অমিয়ার কাছে ছিল বিরক্তিকর। তাই দাদার সেবায় সে অন্য মেয়েকে স্থলাভিষিক্ত করেছিল। অমিয়ার এই নীরব ভর্ৎসনা হরিমতি সইতে না পেরে গ্রামে চলে যায়। এদিকে অমিয়ার বন্ধু অনিল অমিয়া ও তার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হলে বিপ্লবী দাদা আর নীরব না থেকে অমিয়ার জন্মের সত্য ঘটনা অর্থাৎ অমিয়ার মা ছিলেন জাতিতে কাহার তা প্রকাশ করেন। এতে করে তাদের নবীন স্বদেশীদের ভাইফোঁটা আর জমে না। অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ প্রচারের কাজ নিয়ে চলে যায়, আর দেবী অমিয়া দেবীর মুখোশ খুলে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে কলেজে ভর্তির চেষ্টা করে।

'নামঞ্জুর গল্প' গল্পটি মূলত রাজনৈতিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ। ভাষার তীক্ষ্ণতা গল্পটিকে অনন্যতা দান করেছে। গল্প কথক জেলখাটা সাবেক বিপ্লবীই গল্পের প্রধান চরিত্র, এমনকি তিনি একজন লেখকও। তিনি ক্ষুরধার ভাষায় নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে বিদ্রূপ করেছেন সাময়িকভাবে উত্তেজনার মোহে মোহগ্রস্ত প্রকৃত বিপ্লবীর নিষ্ঠা বিবর্জিত স্বদেশীদের। লক্ষ করলে দেখা যায় গল্পটিতে স্বদেশসেবীদের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একই ছাদের তলায় একদিকে রোগজীর্ণ নির্মোহ অনুশোচনাহীন প্রাক্তন রাজবন্দী অন্যদিকে উন্মাদনার বশে উদ্বুদ্ধ বাহবা লোভী অমিয়া। অসহযোগ আন্দোলনের কালে দীর্ঘকাল জেলখাটা বিপ্লবীর চরিত্রে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত অমিয়ার ত্যাগের পেছনে দেবী সাজার চেষ্টা তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাই সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে হুজুগপ্রিয় স্বদেশীদের স্বদেশের প্রতি কর্তব্যের আড়ালে মূলত নিজেকে জাহির করার যে বাসনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ নিঃস্বার্থ প্রাক্তন বিপ্লবীর মাধ্যমে সেই মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াশ পেয়েছেন।

'প্রগতিসংহার' গল্পটি কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুণীদের ছেলেমানুষিকে আশ্রয় করে রচিত হলেও মূলত এ গল্পে প্রধানরূপে প্রকাশমান একটি নারীর আত্মপীড়নের চিত্র। নাম তার সুরীতি। গল্পের শুরুতে নায়িকা সুরীতির পুরুষ বিদ্বেষী যে ইস্পাতকঠিন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের শেষের দিকে তা উল্টোরূপ ধারণ করেছে। সুরীতি পুরুষের মন ভোলানোর জন্য নারীর সাজ-পোশাককে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার মনে করতেন। আর সেজন্যই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারীপ্রগতিসংঘ'। প্রগতিশীলাদের মধ্যমণি হিসেবে তিনি যখন সংঘের পক্ষ থেকে নানা অনমনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন তখন ছাত্ররা এ সংঘের ঘোরতর বিরোধী হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে নীহাররঞ্জন ছিলেন দলের হোতা। সুরীতিকে প্রতি পদে পদে অপমান-অপদস্থ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। নীহার ও সুরীতি কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতেন না।

কিন্তু হঠাৎ করেই সলিলার আগমন ঘটে। লেখক খুব কৌশলে সলিলা চরিত্রটির বরাত দিয়ে সুরীতির ভেতরের চাপা পড়া বাসনাকে জাগ্রত করেছেন। সলিলার সাথে নীহারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সলিলারই ইচ্ছায় ও অর্থে নীহার কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে পড়াশোনার আশায় পাড়ি জমায়। নীহারের এক বিশেষ স্বভাব বা গুণ ছিল তিনি নির্দ্বিধায় মেয়েদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে পারতেন। এতে তার রুচিতে বাধত না, কেবল দম্ভ ছিল তার নিজের জ্ঞানচর্চায়। যাই হোক পরবর্তীতে সলিলার মৃত্যুর পর নীহারকে আবার কলকাতা ফিরে আসতে হয়। এমন সময় সর্বন ইউনিভার্সিটির একজন ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ আসে। এই সুযোগে নীহারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে ছাত্রছাত্রীরা সকলে নীহারকে সমীহ করতে শুরু করেন, এমনকি সুরীতি নিজেও। তখন কঠিন হয়ে পড়ে প্রগতি সংঘের নিয়ম রক্ষা করা। সবার আগে সুরীতি তার নিজের নাম কাটিয়ে ফেলেন। অন্যান্য মেয়েরা খুব সহজে নীহারকে এটা সেটা উপহার দিয়ে যখন সামাজিকতা করতেন তখন সুরীতি মনে মনে কষ্ট পেতেন, তার সে বিদ্যা জানা ছিল না। বই পড়া বিদ্যাছাড়া আর কোনো বিদ্যা না থাকায় তিনি আফসোস করতেন। বিদূষী সুরীতি জানতেন তার ভালোবাসা নীহারের কাছে অবহেলিত। তবু তার অবুঝ হৃদয় নীহারের একটু প্রশ্রয় পাওয়ার জন্য বার বার তাকে নানা কাজে প্ররোচিত করেছে। অর্থ ব্যয় করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে খাটো করে বহু চেষ্টার পরও সুরীতি নীহারের মাঝে তার জন্য একটু ভালোবাসা জাগাতে পারেননি।

অকৃতজ্ঞ, জ্ঞানদাম্ভিক নীহারের কাছে সুরীতির এই ত্যাগের কোনো মূল্যই ছিল না। নিষ্ঠুর নিরেট নীহার শুধু জানতেন তার প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতে। "নিজের হৃদয়ের কাছে বন্দি সুরীতি সমস্ত আত্মনিগ্রহকে নিজেই ডেকে নিয়েছে। নীহারের হৃদয়ে একটুখানি জায়গা পাওয়ার জন্য তার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা যেন মানসিক অসুখে পৌঁছে গেছে।"[৩] মূলত সুরীতি ছিলেন সনাতন প্রথার নিগড়ে আষ্ঠে-পিষ্ঠে বাঁধা। তাই শেষ পর্যন্ত তার ভালোবাসা আত্মপীড়নের মাধ্যমেই নিঃশেষিত হয়েছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে বাঙালি ঘরের নির্যাতিতা নারীর ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বিন্ধ্যবাসিনী ধনী ঘরের কন্যা। এবং বিয়ের পর অলস কর্মবিমুখ স্বামী অনাথবন্ধুকে নিয়ে পিতার আশ্রয়েই থাকতেন। অনাথ তার স্ত্রীকে রূপে গুণে তার যোগ্য মনে না করলেও স্বামীর প্রতি বিন্ধ্যর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। ঘরজামাই স্বামী গর্বে তিনি ছিলেন গর্বিত। সকল স্ত্রীর স্বামীদের চেয়ে তার স্বামী সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা অনাথের ও বিন্ধ্যর যেমন বদ্ধমূল ছিল তেমনি অন্য সাধারণ লোকেরও তাই ধারণা ছিল। অনাথ ঘরজামাই হয়েও শ্বশুরেরই নিন্দা করতেন আর এ কারণে লজ্জিত বিন্ধ্য নিজের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু অনাথ তার গৃহের দারিদ্র্যতার মধ্যে আর ফিরে যেতে আগ্রহী ছিলেন না, তথাপি বিন্ধ্যর দৃঢ়তায় ফিরে যান।

বিন্ধ্য বড় ঘরের আদরের কন্যা বলেই তার শাশুড়ির কাছেও আদরই পেয়েছেন, কিন্তু বড় জায়ের কটু কথা তাকে অহরহ হজম করতে হয়েছে। তবে বিন্ধ্যর সবচেয়ে বড় কষ্টের জায়গা ছিল তার স্বামীর স্বভাব ও আচরণ। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যর সাথে সরাসরি খারাপ ব্যবহার করেননি কিন্তু প্রতিনিয়ত মানসিক অত্যাচার করেছেন।

অনাথ রবীন্দ্র সৃষ্ট এক চরম নির্বিবেক ও অকৃতজ্ঞ চরিত্র। শাশুড়ির গহনা ও শ্বশুরের টাকা চুরি করে বিলেত যাত্রা, স্ত্রী ও মায়ের সাথে সম্পর্ক না রাখার বাসনা, মেম বিয়ে করা আবার দেশে ফিরে শ্বশুরের সম্পত্তির প্রতি লোভ, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার নীচতার পরিচয় পরিলক্ষিত। এত কিছুর পরও বিন্ধ্য তার স্বামীর উপর বিরক্ত না হয়ে স্বামীর বাহ্যিকরূপে বিমোহিত হন। এ গল্পে মূলত পুরুষশাসিত সমাজে নারী নিগ্রহের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে এবং বিন্ধ্যবাসিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি নারীর নির্বিচার পতিভক্তি আসলে আত্মঅবমাননার শামিল। বিন্ধ্যবাসিনী প্রচণ্ডভাবে প্রথাগত এক নারী চরিত্র। নারী নিগ্রহে শুধু যে পুরুষেরাই এগিয়ে আছে তা নয়; নারীরাও যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রণী সে বিষয়টি উঠে এসেছে। বিন্ধ্যবাসিনীর সামান্য আত্মমর্যাদাবোধ তাকে মাঝে মাঝে সক্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আবার কখনো কখনো স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসার কারণে তাকে নিষ্পেষিত হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাকে হঠাৎ হঠাৎ ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন।

গল্পে একদিকে নারীর প্রতি অবহেলা অন্যদিকে পুরুষের আত্মম্ভরিতা। অনাথ চরিত্রটি অকৃজ্ঞ হলেও ইতর থেকে আলাদা। সংসারের সকল বিষয়কে তুচ্ছ, অন্যের প্রতি অবহেলা এবং শুধুমাত্র নিজ অভিমতের মূল্যায়ন তাকে এক সংকীর্ণ গণ্ডির মাঝে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর এ কারণেই অনাথবন্ধু বিরক্তির কারণ না হয়ে বিদ্রূপের পাত্র হয়েছেন। প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নে তিনি যেন তার সমাজকে অনেকটা অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু তারপরও বিন্ধ্যর স্বামীভক্তি ও স্বামীগর্ব এতটুকুও ম্লান হয়নি। স্বামীর কাছ থেকে কোনো ভালোবাসা না পেয়েও স্বামীর প্রায়শ্চিত্তের সময় অনাথের মিথ্যা অভিনয়ে তিনি বিমোহিত হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাকে শেষ আঘাতটি করেছেন অনাথের মেমবউকে হাজির করে।

নিঃসন্তান দম্পতি হরসুন্দরী ও নিবারণের ছন্দহীন জীবনের কাহিনি নিয়ে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের আবর্তন। নিবারণের চিরাভ্যস্ত জীবনে হঠাৎ সংকট উপস্থিত হয় স্ত্রী হরসুন্দরীর অসুস্থতার কারণে। স্ত্রীর পীড়ায় নিবারণ ব্যস্ত হয়ে সব কিছু বাদ দিয়ে দুইবেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্তন করে নিজেকে স্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত করেন। অবশেষে চল্লিশ দিনের মাথায় হরসুন্দরী সুস্থ হন, তবে দুর্বল হয়ে পড়েন।

এমন সময় স্বামীর ভালোবাসায় হরসুন্দরীর উচ্ছ্বসিত হৃদয় তাকে স্বামীর জন্য এক বড় ত্যাগ স্বীকারে ব্যাপৃত করে। তাই তিনি স্বামীকে অনুরোধ জানান আরেকটি বিয়ে করার জন্য। নিবারণ যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন হরসুন্দরী আনন্দিত চিত্তে ততই অনুরোধ করতে থাকেন। তারপর সত্যি সত্যি নিবারণ অশ্রুভরা

নোলকপরা শৈলবালা নামক এক কিশোরী কন্যা বিয়ে করে ঘরে আনেন। শৈলবালার প্রতি নিবারণের আগ্রহের সীমা ছিল না। কিন্তু হরসুন্দরীর সামনে নিবারণ এমন ভাব করতেন যেন কচি মেয়ে বিয়ে করে তিনি অনেক বিপদে পড়েছেন। নিবারণের আচারণে হরসুন্দরী নতুন করে এক অজানা ব্যথার দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর হতে থাকেন। এবং আফসোস করেন তার জীবনের সাতাশটি বছর তিনি কেবল দাসীবৃত্তি কাজে বৃথা ব্যয় করেছেন। আর এখন উপলব্ধি করেছেন একটি ক্ষুদ্র বালিকা তার সংসারে রাজরাজেশ্বরী হয়ে বসেছে।

মূলত 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে হরসুন্দরীর হৃদয় রহস্য, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ব্যাপকভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে। হরসুন্দরী ও নিবারণের মনোরহস্যের নির্মম সত্য ছবি চিত্রণে লেখক যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। যে মিথ্যা আদর্শে উদ্বেলিত হয়ে হরসুন্দরী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করিয়েছেন সেই আদর্শ কঠিন বাস্তবতায় বেদনাপূর্ণ আঘাতে ধূলিসাৎ হয়েছে। শৈলবালার প্রতি নিবারণের মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ হরসুন্দরীর চৈতন্যদয় হয়েছে, তিনি দুঃসহ যন্ত্রণায় উপলব্ধি করেছেন জীবনের সকল পূর্ণতা থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করে এসেছে। তার নারী জীবন কেবল অতৃপ্তিতেই কেটেছে। হরসুন্দরী সামাজিক প্রথার শেকল ভাঙ্গার অভিনয় শুরু করে শেষে নিজেরই শূন্য হৃদয়ের হাহাকারে বেদনার্ত হয়েছেন। অন্যদিকে দেখা যায় তরুণী স্ত্রীর প্রতি মোহে নিবারণের চিত্তের বিপরীতমুখীতা শৈলবালার মৃত্যুতে নিবারণ মর্মাহত হলেও মুক্তির আনন্দ তাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তার প্রথমা স্ত্রী হরসুন্দরীর সাথে।

'রাজপথের কথা' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজপথকে বক্তা করে তুলেছেন। এখানে রাজপথ 'ঘাটের কথা' গল্পের মতো স্মৃতিচারণা করেনি। বরং বর্তমানে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট সামান্য ঘটনা বর্ণনা করেছে। কাহিনি স্বল্পতার জন্য সমালোচক মহলে গল্পটি গল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু তবুও এর ছোটগল্পত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গল্পে দৃষ্টিশক্তিহীন রাজপথ পথিকের চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করতে পারে। তাই শ্রুতি চেতনা ও স্পর্শ চেতনার দ্বারা এক অনামিকা বালিকার বিরহী প্রেমের কাহিনি বর্ণনা করেছে।

অনামিকা মেয়েটি তার কোমল পাদুখানিতে ছোট দুটি নূপুর বাজিয়ে যেখানে রাজপথের একটি শাখা লোকালয়ের দিকে গিয়েছে সেখানে বট গাছের নিচে ম্লান মুখে কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত। অপরজন দিনের কাজ শেষ করে প্রতীক্ষারতা বালিকাকে নিরাশ করে অন্য মনে গান করতে করতে লোকালয়ের দিকে চলে যেত। এমনিভাবে প্রতিদিন বালিকা ধীরে ধীরে আসত এবং হতাশায় বুক ভরে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে যেত।

ফাল্গুন মাসের শেষা-শেষি যখন প্রচুর আমের মুকুলের কেশরে বাতাস মুখরিত তখন অপরজন যে আসে, সে আর এলো না। সেদিন বালিকা ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু রাজপথে ঝরিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে। তার পরদিন আবার বালিকা অপেক্ষায় থেকে নিরাশ হয়ে পথের উপর লুটিয়ে পড়ে দুই বাহুতে মুখ ঢেকে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে

থাকে। সজীব রাজপথ তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে তার চেয়েও কঠিন তার চেয়েও মূক একজন এ বালিকাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বলেই বালিকা তার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। তারপর বালিকা চোখ মুছে পথ ছেড়ে পাশের বনে চলে যায়। সে তার প্রতীক্ষার মানুষটির কাছে কোন নালিশ না জানিয়ে 'ঘাটের কথা'কুসুমের মত নীরব থেকেছে, যা উচিৎ হয়নি। সে তার ভালবাসার কথা অপর মানুষটি জানাতে পারত কিন্তু তা সে করেনি। কিন্তু সেজন্য পথের শোক করার কোনো অবকাশ নেই। তবে 'ঘাটের কথা'য় ঘাট ছিল নায়িকার সমব্যথী, কিন্তু রাজপথ বালিকার ব্যথায় উদাসীন। কেননা প্রতিদিন শত শত পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে পথিকের খণ্ড খণ্ড গল্প রাজপথকে পথিকের ব্যাপারে করে তুলেছে অনাসক্ত। তাই বালিকা যেমন তার প্রতীক্ষার মানুষটির কাছে অবহেলার পাত্রী হয়েছে তেমনি রাজপথ একদিন তাকে ভুলে যাবে। বাতাসের উপর বাতাস যেমন স্থায়ী হতে পারে না তেমনি রাজপথ কোনো কিছুই ধারণ করে না বা পড়ে থাকতে দেয় না, সে আনন্দই হোক আর বেদনা।

সমকালীন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে 'সংস্কার' গল্পটির বিন্যাস। স্বল্প পরিসরে অল্প কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে সমকালীন তথাকথিত দেশ প্রেমিকদের মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন লেখক এ গল্পে।

গল্পের নায়িকা কলিকা নিজেকে খুব প্রগাঢ় দেশপ্রেমিক বলে মনে করেন কেননা তিনি খদ্দর পরিধানে বিশ্বাসী। অন্যদিকে তার স্বামী গিরীন্দ্র ছিলেন একেবারে সরল ঢিলেঢালা গোছের, শার্টের পরিবর্তে তিনি পাঞ্জাবী পরতেন তবে সেটা খদ্দরের নয়, তাতে একটা দুটো বোতাম না থাকলেও তার কিছু আসত-যেত না। কলিকার স্পষ্ট ভাষা এবং কড়া স্বভাবের বিপরীতে স্বামীর এই অগোছালো স্বভাব তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলত। কলিকার অটল বিশ্বাস ছিল গিরীন্দ্র দেশকে ভালোবাসেন না, তাই গিরীন্দ্র আন্তরিকভাবে যতই প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা তাদের বাহ্য লক্ষণের সাথে মেলেনি বলে কলিকা স্বামীকে দেশপ্রেমিক ভাবতে পারেননি। কলিকা স্বামীর সাথে বের হতে লজ্জা পান। কেননা পূর্বে কলিকা যে দলে ছিলেন গিরীন্দ্র তাদের উর্দি ব্যবহার করেননি, এখন যে দলে ভিড়েছেন তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারেননি। যে কোনো দলেরই হোক ভেক ধারণ করার পক্ষপাতী গিরীন্দ্র ছিলেন না, এতে তিনি সংকোচবোধ করতেন।

কলিকার অধ্যাপক বন্ধু নয়নমোহনের মুখ থেকে ধার করা জ্ঞান নিয়ে কলিকা স্বামীর সাথে তর্ক করতেন। তাই সেরকমই একবার কলিকা গিরীন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন গঙ্গাস্নানের পবিত্রতার মতো খদ্দর পরিধানের শুচিতা যখন সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে তখন দেশ রক্ষা পাবে। কলিকা কাপড় দিয়ে বর্ণবৈষম্য ঢাকা দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আর সেজন্যই তাদের পাড়ার জৈনদের পরবের দিনে পুণ্যার্থীদের সাথে সদ্য স্নান সেরে আসা মেথরের একটু ছোঁয়াচের ফলে মেথরের উপর যে ক্রমাগত প্রহারের বৃষ্টি ঝরেছিল এবং ঐ অবস্থার হাত থেকে গিরীন্দ্র মেথরকে

তাদের গাড়িতে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। এতে কলিকা ভীষণ ক্ষেপে ওঠেন স্বামীর উপর এবং জানান মেথরকে গাড়িতে ওঠানো হলে তিনি নেমে যাবেন।

স্বদেশ সাধনায় উদ্ভাসিত কলিকার দেশপ্রেম মূলত খদ্দর পরিধান এবং নয়নমোহনের চায়ের আড্ডায় সীমাবদ্ধ ছিল, দেশের অবহেলিত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেনি। দেশের নিরন্ন মানুষকে এক কোণে সরিয়ে রেখে মানবতার ও আদর্শবাদের বক্তৃতা করা রীতিমত প্রতারণা। "গিরীন্দ্রের জবানীতে লেখক বলতে চেয়েছেন, মানবিক সত্যে না পৌঁছালে, দেশের অপমানিত মানুষের কাছে সহজভাবে না যেতে পারলে সব স্বদেশী আন্দোলন, আদর্শবাদের সব ঢাক পেঠানো শুধু ব্যর্থই নয় এক বিরাট প্রতারণা ও প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়।"[৪] আর কলিকার প্রসঙ্গে বলা যায় কলিকা মূলত একটি প্রথা বা সংস্কারের ভেতর আটকে ছিলেন, সেখান থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

'সমাপ্তি' গল্পটি একটি নিখাদ প্রেমের গল্প। নারীসুলভ পেলবতা-কমনীয়তা বর্জিত পুরুষালী আচরণ বিশিষ্ট মৃন্ময়ী এ গল্পের নায়িকা। বড় বড় দুটি কালো চোখে তার না ছিল কোনো লজ্জা না ছিল কোনো ভয়। যে দেশে শিকারী নেই কোন বিপদ নেই সেই দেশের হরিণশাবকের মতো সে ছিল নির্ভীক। তার খ্যাতির পরিবর্তে গ্রামে তার অখ্যাতির কথাই বেশি শোনা যেত। পুরুষ গ্রামবাসীরা তাকে স্নেহ করে পাগলী বললেও গ্রামের গৃহিণীরা ছিলেন ভীত ও চিন্তিত তাকে নিয়ে।

মৃন্ময়ী অসময়ে পারিবারিক ও সামাজিক মাপকাঠিতে নারী হয়ে ওঠেনি যেমনটা ছিল মৃন্ময়ীর বয়সী বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপ কন্যাটি। মৃন্ময়ী ছিল প্রকৃতির কন্যা তাই প্রকৃতিরই নিয়মে সেই সাথে অপূর্বর প্রেমের কারণে ধীরে ধীরে নারী হয়ে উঠেছে। অবশেষে বাবার বাড়ি, স্বামী গৃহের সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। লেখক তাকে একটু আলাদা করতে গিয়ে আবার সাধারণ করে ফেলেছেন।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র নারী নয়, পুরুষ বনোয়ারিলাল। তবুও বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখা আলোচনায় এসেছেন, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ার কারণে। জমিদার মনোহরলালের পুত্র বনোয়ারিলাল সংসারে কোনো কাজের জন্য যথার্থ নন। কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃত কবিতা এই তিনটি বিষয়ে তার বেশ সখ। জমিদারের গোমস্তা নীলকণ্ঠ জমিদার মনোহরের খুবই কাছের লোক, যাকে বনোয়ারি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। বনোয়ারি বাড়ির বড় পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পরিবারে কোথাও তার কোনো মতামতের গুরুত্ব না থাকায় এবং নীলকণ্ঠকে পিতা বেশি প্রশ্রয় দেওয়ায় বনোয়ারি মনে মনে পিতার উপর রাগান্বিত ছিলেন।

বনোয়ারি অপুত্রক থাকায় নীলকণ্ঠ জমিদারবাবুকে ভুলিয়ে রাজি করান বনোয়ারিকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য, কিন্তু এই ঘটনায় বনোয়ারি ক্ষুব্ধ হয়ে নীলকণ্ঠকে মারতে যান। আর এত কিছুর পরও কিরণলেখা স্বামীর প্রতি কৃতার্থ না হয়ে বরং নীলকণ্ঠকে সমর্থন করে স্বামীকে ভুল বোঝেন। কিরণলেখা সংসারের বড় বধূ নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে করতেন। যদিও বনোয়ারি তাকে তা অমূলক বলে আশস্ত করেছেন। কিন্তু তবুও কিরণলেখা নীলকণ্ঠের মতামতকে যুক্তিযুক্ত মনে করে স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেননি। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ফ্রেম থেকে বনোয়ারি তার স্ত্রীকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালেও কিরণের পক্ষে সম্ভব হয়নি তার স্বামীর যোগ্য সঙ্গী হওয়ার। প্রথাগত ফ্রেমে বন্দি কিরণকে তাই একাকীত্ব বরণ করতে হয়েছে।

'হৈমন্তী' গল্পে পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনে বন্দি নারী-লাঞ্ছনার চিত্র অংকনের পাশাপাশি লেখকের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মাঝে পণপ্রথা বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়ে ওঠে। গল্পের নায়ক অপু সেই শ্রেণীভুক্ত।

গল্পের শুরুতেই অপু-হৈমন্তীর বিয়ের প্রসঙ্গ, আর এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় কন্যার অধিক বয়স, পণের টাকা, দেব-অর্চনায় অনভিজ্ঞতা, মূলত এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই গল্পে জট পেকেছে। অপুর শ্বশুর গৌরীশংকর পশ্চিমের পাহাড়ের কোন এক রাজার অধীনে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাই কন্যাকে তিনি খুব করে পড়াশোনা শিখিয়েছেন। এবং তিনি নিজে যেহেতু উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী ছিলেন, ধর্মকর্মে তাঁর তেমন আস্থা ছিল না, সেহেতু তার কন্যাকে তিনি কখনো দেবতা বিষয়ে কোনো উপদেশ দেননি। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত ছিল যা তিনি নিজে বোঝেন না তা অন্যকে শেখানো কপটতা। তাই হৈম প্রকৃতির পেলবতা ও বাবার শুভ্র অন্তরের প্রভাবে ছিলেন নির্মল। সাংসারিক জটিলতা, মিথ্যাচার, অপরের দোষ অন্বেষণ এসব ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু কলকাতায় অপুদের গৃহের পরিবেশ ছিল ভিন্ন। অপুর বাবা ছিলেন শিক্ষিত এবং উগ্রভাবে সমাজ ও ধর্মের অনুগামী। অর্থাৎ অপুর শ্বশুর ও পিতা উভয়ে ছিলেন ভিন্ন মতবাদের মানুষ। তাই হৈমন্তী অনেক চেষ্টা করেও শ্বশুরবাড়ির বিরূপ পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। একবার রাস-উপলক্ষে তাদের বাড়িতে আগত সকল আত্মীয়-স্বজনের সামনে হৈমর বয়স নিয়ে তাকে একগুঁয়ে এবং তার বাবাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করায় সে চরম মর্মাহত হন। এমনকি সেদিন ভীত হরিণীর মতো স্বামীর দিকে তাকিয়ে অপুকেও তার অপরিচিত মনে হয়। হিমালয়ের শুভ্রতা, খোলা আকাশের অনাবিল প্রসারতা আর বাবার সান্নিধ্যে হৈমর যে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছিল তা ছিল সমস্ত মিথ্যা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। দেব-দেবীর প্রতি হৈমর ভক্তি জন্মায়নি কখনো, ভক্তি করতেন তিনি তার বাবাকে। তার কাছে সেটাই ধর্ম–যা সত্য। অপুর নিবিড় ভালোবাসা হৈমর মনকে রঙিন করে তুলেছিল বটে কিন্তু দু'জনের ব্যক্তিত্বের মাঝে যে ফাঁকটুকু ছিল তা পূরণ করতে পারেনি। "হৈমন্তীর এ-ই

Dhaka University Institutional Repository

স্বাতন্ত্র্য। চারধারের সমাজ ও আচরণধারার সঙ্গে মৌন সংগ্রামে তার এবং তার বাবার ব্যক্তিত্বে-একাকিত্বের যে প্রতিষ্ঠা–কথক নায়ক তার কাব্যিক ভাষায় যাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে আর বাস্তবে নাগালের বাইরে মনে করেছে।"[৫] হৈমন্তী সতের বছর যাবৎ ভেতরে ও বাইরে যে অসীম মুক্তির মাঝে মানুষ হয়েছেন সেখানে অপুর সাথে তার সমান আসন ছিল না। হৈমকে তার স্বামী সব দিতে পারেন কেবল মুক্তি দিতে পারেন না। আসলে তা অপুর নিজের মধ্যেই ছিল না। আর তাই হয়তো হৈম এ সাংসারিকতার ক্ষুদ্র পরিসরের সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সবল ধিক্কার জানাতে পারেননি। যা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, বরং হৈমন্তী প্রথার নিগড়ে নিষ্পেষিত হতে হতে এক সময় নীরবে বিদায় নিয়েছেন।

প্রথাবিরোধীঃ

জয়কালী 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের মূল চরিত্র। পল্লীসমাজের পটভূমিকায় চরিত্রটি আশ্চর্য রকমের মানিয়ে গিয়েছে। লেখক জয়কালীর যে ব্যক্তিত্ব গল্পে এঁকেছেন তার সাথে চরিত্রটির বহিরাঙ্গের সাদৃশ্য রক্ষা করেছেন। জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি সম্পন্ন একজন স্ত্রীলোক। গ্রামের অন্য স্ত্রীলোকেরা যেমন তাকে ভয় পেতেন তেমনি পুরুষেরাও তাকে সমীহ করতেন। জয়কালীর অধ্যাপক স্বামী মাধবচন্দ্রের বর্তমানে যেসব বিষয়-সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়া উপক্রম হয়েছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এই নিঃসন্তান বিধবা সকল বাকি-বকেয়া আদায় করে বহুদিনের বেদখল সম্পত্তি হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে জয়কালীর এই রূপই একমাত্র রূপ নয়। তার বাইরের পৌরুষের দিকটা যেমন সকলের প্রত্যক্ষগোচর ছিল তেমনি তার নারীত্বের কোমল অংশটুকু রাধানাথ জীউর মন্দিরের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে ব্যাপৃত ছিল। তিনি সব জায়গাতেই সকলের কাছেই ছিলেন কঠোর কেবল ব্যতিক্রম ছিলেন এই মন্দিরের প্রসঙ্গে। এখানে তিনি একান্তরূপেই জননী, পত্নী, দাসী, সেই সাথে সতর্ক, সুকোমল এবং অবনম্র। এই মন্দির তার সাধনার স্থান, এর সামান্য অযত্ন তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

অবশেষে একদিন ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি তার এই পবিত্র মন্দিরে প্রাণভয়ে ভীত এক অশুচি শূকরছানাকে বাঁচাতে ডোমের দলের সাথে কথোপকথনকালে মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। তার এই পবিত্র মন্দিরে গাছের একটি মরা পাতাকেও তিনি অপবিত্র জ্ঞান করে পড়ে থাকতে দিতেন না। এই কঠিন হৃদয়ের মানুষই কিনা দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছেন একটি অসহায় জীবকে আশ্রয় দিতে। জয়কালীর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মে পল্লীর সমাজ নামক ক্ষুদ্র দেবতাটি রাগান্বিত হলেও প্রসন্ন হয়েছিলেন সর্বজীবের মহাদেবতা।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত এই ঘটনাটির ভেতর দিয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকার সংকীর্ণ প্রথাবিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি আর দশজন সাধারণের মতো সামান্য দেব-দেবীর পূজা না করে সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মের সাধক ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব জয়কালীর মাধ্যমে অশুচিকে পবিত্র করে উপস্থাপন করা। সমকালের পাঠক থেকে শুরু করে বর্তমানকালের বহু পাঠকের কাছেও হয়তো বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। কিন্তু গল্পটিকে খাটো করে দেখার কোনো যুক্তি নেই।

উত্তম পুরুষে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পটি পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে সমাজবাস্তবতামূলক গল্প। গল্পের নায়িকা কল্যাণী রবীন্দ্রসৃষ্ট আরেকটি অনমনীয় চরিত্র। গল্পের নায়ক অনুপম তেইশ বছর বয়সে বিয়েকে কেন্দ্র করে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনি সাতাশ বছর বয়সে বিবৃত করেছেন। অনুপমের পিতার অবর্তমানে তার মামা ছিলেন তার অভিভাবক। এই মামার অতি চাতুরীর কারণে অনুপমের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। অনুপমের হবুশ্বশুর শম্ভুনাথ সেন ছিলেন স্থিতধী ব্যক্তিত্ববান মানুষ। বিবাহ সভায় অনুপমের মামার অশোভন আচরণে এবং অনুপমের নিষ্প্রভ স্বভাবের কারণে শম্ভুনাথ কন্যার বিবাহ সভায় কন্যাকে সম্প্রদান না করে বরপক্ষকে ভোজন শেষে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই দৃঢ়চিত্ত ও অহংকারী ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দেখা যায় তার কন্যা কল্যাণীর চরিত্রেও। বিবাহ সভায় সংঘটিত সেই অপমানজনিত ঘটনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী কল্যাণীও বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করেন।

কল্যাণী তার নিজ ব্যক্তিত্বের মহিমায় কখনো কোনো অন্যায়-অত্যাচারের সাথে আপোস করতে শেখেননি। গল্পে দেখা যায় বিয়ে ভেঙে যাওয়ার বহুদিন পর কল্যাণীর সাথে অনুপমের দেখা হয়। যদিও অনুপম জানতেন না এই মেয়েটিই তার স্বপ্নপ্রেয়সী। অনুপমের সাথে ছিলেন তার মা তীর্থে যাচ্ছিলেন। এক ট্রেন থেকে অপর ট্রেন বদল করার সময় অনুপমদের পূর্বকৃত টিকিটকে রেলওয়ে কর্মচারী ইংরেজ জেনারেল সাহেবের জন্য বাতিল বলে দাবি করেন। তখন কল্যাণী চোখে অগ্নিবর্ষণ করে স্টেশন মাস্টারকে মিথ্যাবাদী বলে সাহেবের নাম লেখা টিকিটটি গাড়ী থেকে প্লাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দেন। পরবর্তীতে দেখা যায় প্রতিপক্ষ কল্যাণীর এই অনমনীয় স্বভাবের কাছে পরাভব মানেন। গাড়ি ছাড়ার সময় অতিক্রান্ত হলেও গাড়ি না ছেড়ে আরেকটি গাড়িজুড়ে তবে ছাড়া হয়।

এ ঘটনায় অনুপমের মা কল্যাণীর পরিচয় জানতে ব্যগ্র হন এবং পরিচয় জেনে চমকে ওঠেন। এদিকে অনুপম যখন তার কল্পনাপ্রেয়সীকে চোখের সামনে দেখতে পান তখন তাকে নামিয়ে আনেন বাস্তবতায়। অনুপম তারপর কানপুরে গিয়েছেন হাত জোড় করেছেন মাথা হেঁট করেছেন। শম্ভুবাবুর হৃদয় নরম হয়েছে কিন্তু কল্যাণীর পণ তিনি বিয়ে করবেন না। মূলত 'কল্যাণী' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারী-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিজয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

Dhaka University Institutional Repository

'আপদ' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ নীলকান্তকে যথাযথই আপদ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নীলকান্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত গল্পটির নাম 'আপদ' সার্থক হয়েছে। গল্পের নায়িকা কিরণময়ী অসুস্থ অবস্থায় স্বামী-শাশুড়ির সাথে বায়ু পরিবর্তনে চন্দননগরের বাগান বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এবং ঘটনাক্রমে এ বাড়িতে আশ্রয় পায় যাত্রাদলের ছোকরা এক অনাথ ব্রাহ্মণবালক নীলকান্ত। যাকে বাড়ির কেউ সহ্য করতে পারতেন না, সে ছিল কেবল কিরণময়ীর স্নেহভাজন। কিন্তু কালক্রমে স্বভাবের নিয়মে সম্ভবত কিরণময়ীর সান্নিধ্যে বালক নীলকান্ত তার বয়ঃসন্ধিকাল নিঃশব্দে পার হয়ে আর বালক থাকে না। তাই তার অচেনা মন আরো বেশি কিছু দাবি করে। তার অতীতটাকে সে ভুলে যেতে চায়, হতে চায় নতুন এক নীলকান্ত যে হবে কিরণময়ীর সমকক্ষ। তাই সে পড়াশোনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তবে কিরণময়ী নীলকান্তের এই পরিবর্তনের কিছুই জানতেন না। নীলকান্তের প্রতি তার অনুভূতি ছিল নিখাদ দয়া স্নেহ ও কৌতুকের। কিন্তু পরবর্তীতে দেবর সতীশের দোয়াতদানটি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিরণময়ীর কাছে নীলকান্তের মনোভাব ধরা পড়ে। যা কিরণময়ীকে বিস্মিত করেছিল। কিন্তু কিরণ নীরব থেকে নিরুদ্দেশ নীলকান্তকে চোরের অপবাদ থেকে বাঁচিয়ে দেন। এখানে কিরণের মানসিকতাও অস্পষ্ট। কেননা "কিরণ দোয়াতদানটি বাক্সের অন্যান্য জিনিসের তলায় চাপা দিয়েছেন। পরে শরৎ নীলকান্তের বাক্স পরীক্ষা করতে চাইলে কিরণ তাতে ঘোর অসম্মতি জানিয়ে গোপনে দোয়াতটি জলে ফেলে দিয়েছেন। এ শুধু পরিবার পরিজনের কাছে নীলকান্তের ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য নয়, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কিশোরের মন যে তাঁকেই বিশেষভাবে ছুঁয়ে ছিল এই সংবাদটি কিরণের অজানা ছিল না।"[১২] কিরণ স্বামী ও দেবরের ইচ্ছেকে মূল্যায়ন না করে নীলকান্তের কারণে এক ধরণের ঘোরের মধ্যে ছিলেন, এমনকি পারিবারিক অনুশাসনও ভেঙ্গেছেন। এখানেই কিরণের ভিন্নতা।

'উদ্ধার' গল্পটিতে ত্রিকোণ জটিল মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে। নায়ক পরেশের সাথে গৌরীর বিয়ের পর তাদের মানসিক দূরত্বের কারণ হিসেবে দু'পক্ষের পারিবারিক অবস্থানকে সনাক্ত করা যেতে পারে। পরেশের আর্থিক সংগতির প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ির স্পষ্ট ইঙ্গিত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। এছাড়াও পরেশের সন্দিগ্ধ স্বভাব তার ব্যাধির মতো ছিল। আবার পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার এই পার্থক্য তাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে যা পরবর্তীতে মানসিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এদিকে স্বামী ও সংসারের সুখ বঞ্চিতা সন্তানহীনা গৌরী ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীর সংস্পর্শে এলে, পরেশের সন্দেহ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। গৌরী প্রচণ্ড ক্ষোভে পরেশের মিথ্যা সন্দেহকে সত্য বলে ঘোষণা করে সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থিনী হলে, সন্ন্যাসী তাকে স্বামীর গৃহে পাঠিয়ে দেন কিন্ত সুস্থির হতে পারেন না। আবার গৌরীকে উদ্ধারের পরিকল্পনা জানিয়ে সন্ন্যাসী পত্র প্রেরণ করেন, ঘটনাক্রমে তা পরেশের হাতে পৌঁছায়। গৌরীর স্বামী সেই পত্র পাঠ করে ঈর্ষায় দগ্ধ হচ্ছেন এই কথা মনে করে গৌরী ভেতরে

Dhaka University Institutional Repository

ভেতরে এক জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করেন। অর্থাৎ গৌরীরও যে মনোবিকার আস্তে আস্তে হচ্ছে তা এখানে স্পষ্ট। এবং পত্র পাঠের পর পরেশের মৃত্যুর পর গৌরী এক নতুন অনুভূতির সম্মুখীন হন। পরেশের মিথ্যা সন্দেহ সত্য হয়ে তার সামনে প্রতিভাত হয়। গৌরী নিজের নতুন, অজানা এক মনের সন্ধান পান যা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। সেই সাথে সন্ন্যাসীর মানসিকতাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এবার গৌরীর আর মুখ লুকানোর জায়গা থাকে না। তাই গৌরী হয়তো পরেশের ভালোবাসার উগ্রতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। আর তাই শেষ পর্যন্ত গৌরী আত্মহননের পথ বেছে নেন। গৌরীর জমাট আত্মাভিমান স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশিত হল অন্য ছল ধরে। যা গৌরীর মূল চিন্তা থেকে ছিল দূরে। গৌরী অভিনয় করতে চায়নি আবার অভিনয়ই করে ফেলেছেন। সবকিছু মিলিয়ে গৌরীকে আধুনিক জটিল ও প্রথাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

'চিত্রকর' গল্পে প্রধান নারী চরিত্র মুকুন্দলালের স্ত্রী সত্যবতী। মুকুন্দলাল পেশায় ছিলেন আইনজীবী আর সত্যবতী স্বভাবে ছিলেন শিল্পমনা। এমন কোনো অদরকারী জিনিস ছিল না যা দিয়ে তিনি কিছু না কিছু তৈরি করতেন। সত্যবতীর অনাবশ্যক এই কাজকে তার স্বামী স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। এবং আদালত থেকে ফেরার পথে রঙ, রঙিন রেশম ইত্যাদি নিয়ে এসে স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে তার ঘরে রেখে তার খেয়ালের কাজে সাহায্য করতেন। কিন্তু সত্যবতীর কপালে এ সুখ বেশিদিন সয়নি। মুকুন্দলাল মৃত্যুবরণ করেন। এ অবস্থায় সত্যবতীও তার চার বছরের পত্র চুনিলালের ভার পরে অরসিক গোবিন্দলালের উপর। তিনি শিল্পের মূল্য বুঝতেন না তার কাছে প্রধান জিনিস ছিল পয়সা। তাই মা ও ছেলের শিল্পের সাধনা চলত গোপনে দরজা বন্ধ করে। কিন্তু একদিন শিশু চুনির গোপন কাজ কাকার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ায় তাকে শাস্তি পেতে হয়। এতদিন সত্যবতী নীরবে সব সহ্য করলেও সেদিন দেবরের কাজের প্রতিবাদ করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন চুনিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়ার কথা। আর তাই সত্যবতী চুনিকে অর্থের সাধনা থেকে বাঁচাতে নামজাদা চিত্রশিল্পী সত্যবতীর ভাগনে রঙ্গলালের হাতে সমর্পণ করেন।

'চিত্রকর' গল্পটিতে শিল্পসাধনা উদ্বেলিত দুটি সুকুমার চিত্তের পরিচয় বিধৃত। ছোট আকারের গল্পটিতে খুব বেশি চরিত্রের উপস্থিতি নেই। মূলত এ গল্পের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক মানসিকতার পরিচয় প্রস্ফুটিত। গল্পের একপ্রান্তে সংকীর্ণমনা গোবিন্দলাল আর অন্যপ্রান্তে শিল্পমনা মা ও ছেলে। সংসারে যা কিছু অপ্রয়োজনীয় অদরকারী তা লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে বলেই তাতে লুকিয়ে থাকে নিখাদ আনন্দ। আর এ আনন্দে বিভোর ছিলেন সত্যবতী ও তার ছেলে। কিন্তু বাস্তব সংসারে যে হৃদয়টি সবচেয়ে সুকুমার সেটিই সবচেয়ে অরক্ষিত। এ কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে পিতার অবর্তমানে মা ও ছেলের ক্ষেত্রে। সত্যবতী যেমন করেই বাঁচুন না কেন তার ভয় ছিল ছেলেকে নিয়ে। তাই অর্থপিপাসু কাকা গোবিন্দর কাছ থেকে ছেলেকে বাঁচাতে মরিয়া সুবিবেচক সত্যবতী ছেলেকে তুলে দিয়েছেন ভাগনে রঙ্গলালের হাতে।

Dhaka University Institutional Repository

কাদম্বিনী 'জীবিত ও মৃত' গল্পের মূল চরিত্র। তিনি রানীহাটের জমিদার গৃহের বধূ। তার পিতৃকুলে এবং পতিকুলে কেউ ছিল না। তিনি নিঃসন্তান বিধবা। তাই ভাশুর জমিদার শারদাশংকরের ছোট পুত্র সতীশকে নিয়েই কাদম্বিনীর সময় কাটত। বড় গিন্নি অসুস্থ থাকায় কাদম্বিনী সতীশকে মায়ের দ্বিগুণ স্নেহ দিয়ে তার শূন্যতাকে ভরে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতেন।

হঠাৎ এক শ্রাবণের রাতে কাদম্বিনী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি মারা যাননি। সবাই ভাবেন তার মৃত্যু হয়েছে। তাই তাকে দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন সময় হঠাৎ কাদম্বিনীর জ্ঞান ফেরার পরই দাহকার্য সম্পাদনের জন্য আগত ব্রাহ্মণগণ ভয়ে পালিয়ে যান। একাকী কাদম্বিনীর প্রথমেই শ্মশানের নির্জনতা ও অন্ধকার থেকে বাড়ি ফেরার কথা মনে হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার মনে হয় তিনি বেঁচে নেই, তাকে বাড়িতে গ্রহণ করবে কেন? জীবরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি তো তার প্রেতাত্মা। এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে কাদম্বিনী আশ্রয় নেন বাল্যসখী যোগমায়ার গৃহে। এবং সেখানেও তিনি সহজ হতে পারেন না যোগমায়ার সাথে। উদ্ভ্রান্তের মতো যোগমায়াকে তার মৃত্যুর খবর জানিয়ে সখির গৃহ ত্যাগ করেন।

অবশেষে কাদম্বিনী ফিরে আসেন রানীহাটে শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে তাকে দেখে বাড়ির সকলে অশুভ কিছু ভেবে ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। শারদাশংকর পুত্রের মঙ্গলের আশায় প্রেতাত্মারূপী কাদম্বিনীর কাছে জোড়হাতে মিনতি করেন সংসার থেকে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে। কাদম্বিনী এমন মর্মান্তিক কথায় সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বার-বার সকলকে জানান তিনি জীবিত। এবং প্রমাণস্বরূপ মাটিতে পড়ে থাকা কাঁসার বাটি দিয়ে নিজের কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন। শেষে হৃদয় বিদারক হাহাকারে তিনি যে মারা যাননি এই কথাটি জানাতে জানাতে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এক নিঃসঙ্গ নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা 'জীবিত ও মৃত' গল্পটির মূল উপজীব্য বিষয়। স্বামী পুত্রহীনা ধনীকুলবধূ কাদম্বিনীর মানসিক স্তরের যে পরিবর্তন লেখক ঘটিয়েছেন অর্থাৎ জীবিতের মাঝে মৃতের যে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। শ্মশানের ভয়ংকর নির্জনতা থেকে কাদম্বিনী ছেলেবেলার সই যোগমায়ার গৃহে উপস্থিত হওয়ায় সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করলেও তিনি নিজে নিজেকে মৃত ভাবতেন। নিজেই নিজেকে ভয় করতেন। কাদম্বিনী নিজের কাছ থেকে কিছুতেই পালাতে পারেননি। কিন্তু যোগমায়ার সংসারে অবস্থান করে আপন সত্তার গভীর পরিচয় অনুভবের পর তিনি ফিরে আসেন নিজ গৃহে। যেখানে সবাই তাকে মৃত বলে জানে সেখানে তিনি দাবি করেন তিনি জীবিত। কাদম্বিনীর পিতৃকুলেও কেউ না থাকায় ভাশুরের ছোট পুত্রের প্রতি দুর্বলতা তাকে আবার সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরিবারের মানুষদের ভালোবাসার বদলে ভয় আর অবিশ্বাস তাকে সত্যি সত্যি সংসার থেকে শেকড় উৎপাটন করে আত্মহননের পথে প্ররোচিত করে। আত্মহননের মাধ্যমে কাদম্বিনী প্রমাণ করেন তিনি জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

'দিদি' গল্পটি বাৎসল্য রসের গল্প। গল্পের মূল চরিত্র শশিকলা। শশী তার পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা ছিলেন। পিতার যথেষ্ট সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অংশীদার সে-ই বলে তার স্বামী জয়গোপাল নামেমাত্র একটি চাকরি করতেন। কিন্তু প্রায় বৃদ্ধ বয়সে শশীর পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ায় শশী ও জয়গোপাল মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তাই জয়গোপাল শশীকে তার সন্তানসহ শ্বশুরবাড়িতে রেখে চা-বাগানের চাকরি নিয়ে আসামে চলে যান।

এদিকে মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে শশীর মা-বাবার মৃত্যু হওয়ায় ছোট-ভাই নীলমণির ভার পড়ে দিদি শশীর উপর। কালীপ্রসন্ন মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পত্তির সিকি অংশ শশীকে দিয়ে বাকি অংশ পুত্রকে দিয়ে যান। পিতৃ-মাতৃহীন নীলমণিকে শশী মায়ের স্নেহে লালন করলেও তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পারেন তার ভাইটি তার স্বামীর কাছে আপদ স্বরূপ। এমনকি নীলমণি অসুস্থ হলে চিকিৎসাও করাতে জয়গোপাল অনীহা প্রকাশ করতেন। অন্যদিকে নীলমণির সকল সম্পত্তি একে একে কৌশলে নিজের নামে খারিজ করে নেন। এ ঘটনায় শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে কোনো ফল না পেয়ে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানান। সমসাময়িক কালে এমন দুঃসাহসী ঘটনা ঘটানো খুব কম নারীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এ ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিবেশীরা জানতে পারে যে শশী রাত্রে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে এবং রাতেই তার দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

'দিদি' গল্পটি বাৎসল্য রসের মহিমায় উদ্ভাসিত। গল্পে ব্যক্তি শশিকলার মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও বেদনা নীলমণিকে ঘিরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও শুরুতে সম্পত্তি বিভাজনের সংবাদে ভাইটির উপর রাগান্বিত ছিলেন, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর নীলমণির দায়িত্ব যখন তারই উপর পড়ে তখন শশীর মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বে তার হৃদয় ছিল স্বামী-সংসারের চিন্তায় আচ্ছন্ন, স্বামীর প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। কিন্তু ক্রমান্বয়ে নীলমণির প্রতি স্বামীর হিংসাত্মক মনোভাবই তাকে স্বামীর বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস পতিব্রতা শশীকে বিদ্রোহী করে তোলে। আর এর মধ্য দিয়েই মূলত শশীকলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় শশী সুচারুরূপে এক প্রথাবিরোধী নারী।

'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক প্রেমের গল্প যা বাংলা সাহিত্যে নতুন। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রে রয়েছেন নায়িকা চারুলতা। ধনী গৃহের বধূ সন্তানহীনা চারুর সময় কাটতে চায় না। স্বামী ভূপতি সবসময় নিজের কর্মে অর্থাৎ পত্রিকা সম্পাদনের কাজে ব্যস্ত। চারুকে সময় দেয়ার মতো সময় তার নেই। এই পরিস্থিতিতে ভূপতির পিসতুতো ভাই কলেজ (থার্ড ইয়্যারে) পড়ুয়া অমল হয়ে ওঠেন চারুর সবচেয়ে কাছের মানুষ। চারুকে সংসারের কোনো কাজ করতে হতো না, তিনি অমলের শখের বেগার খাটতেন। বৌঠানকে সামান্য পড়া দেখিয়ে দিয়ে অমল তার কাছ থেকে কার্পেটের জুতো, রেশমের গলাবন্দ, কেদারার আবরণ এমনি আরো হাজারো আবদার

Dhaka University Institutional Repository

করে বসতেন। আর এই স্নেহের উপদ্রব চারুর কাছে অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু মাঝে পত্রিকাতে সামান্য লেখা ছাপানোকে কেন্দ্র করে দেওর-ভাজের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয় এবং তা আরো ঘনীভূত করে তোলেন চারুর বৌঠান মন্দাকিনী।

ভূপতিকে সর্বশান্ত করে চারুর দাদা, উমাপদ স্ত্রী মন্দাকে নিয়ে বাড়ি থেকে উৎখাত হলেও চারু আর অমলের দূরত্ব কমে না, কালক্রমে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। চারু ও ভূপতির মাঝে যে শূন্যতাটুকু ছিল দেওর অমল তা পূর্ণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু অমল যে চারুর কতটুকু জুড়ে ছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে অমলের অনুপস্থিতিতে। সেই শূন্যতার জগৎ ছিল চারুর সম্পূর্ণ অজানা। সম্পর্কের নিয়ম ভেঙে চারু নিজের অজান্তে যে সীমাহীন যন্ত্রণার দিকে অগ্রসর হয়েছেন তার পরিণতি গ্রীক-ট্রাজেডির সমপর্যায়ের। "দাম্পত্য জীবনের এক পরম সত্যের দিকে অসতর্ক পতি-পত্নীকে এখানে সচেতন করে দিয়েছেন লেখক; এই ভ্রান্তিটুকুর মধ্যেই দেবলোকের কুটিল নির্দেশ-এরই রন্ধ্র ধরে প্রবেশ করল নেমেসিস্। অমল ভারতবর্ষ ছেড়ে ছুটে পালালো, ভূপতি দাঁড়িয়ে রইল বজ্রদগ্ধ বনস্পতির মতো, চারু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। [···] চারু অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার ফিরে আসবার চেষ্টা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার করুণতম আত্মরক্ষার প্রয়াস, প্রাণপণে ভূপতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করবার তপশ্চর্যা, শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে পরাভূত হয়ে অনির্বাণ তুষাগ্নিতে কী দারুণ আত্মনিবেদন।"[১০] চারুর এই মানসিক অবস্থা ভূপতির কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ায় নিদারুণ কষ্টে ভূপতি সম্পাদকের কাজ নিয়ে মৈশুরে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। অবশেষে স্বামী দেওরের উপেক্ষায় চারুর শূন্য হৃদয় এক বোবা হাহাকারে বিদীর্ণ হয়েছে। চারুর ভবিষ্যৎহীন ভালোবাসা, সমাপ্তিহীন বর্তমানের কারণে চারু বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে প্রথাবিরোধী এক নায়িকা। এবং 'নষ্টনীড়' বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতম। রবীন্দ্রনাথ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য চারুর জীবনে ভূপতিকে আবার ফিরিয়ে আনেননি, তিনি তাঁর শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। দগ্ধ ভূপতি ও অবিবেচক অমলকে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুকে দাঁড় করিয়েছেন নিঃসঙ্গতার চরম সীমানায়।

'পয়লা নম্বর' রবীন্দ্রনাথের নারী মুক্তির গল্প। অনিলা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। স্বামী অদ্বৈতচরণের সংসারে নিরানন্দ জীবন-যাপনে অনিলা নিজেকে কোনোরকমে চালিয়ে নিতেন। তার কোনো দাবি-দাওয়া বা কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছাও ছিল না, অনেকটা বাধ্য হয়ে নির্লিপ্ত জীবনের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

অনিলা নিঃসন্তান নারী। সেই কারণেও হয়তো স্বামীর সংসারের প্রতি তার বাঁধনটাও জোড়ালো ছিল না। তার একমাত্র স্নেহের বন্ধন ছিল ছোট ভাই সরোজ। পিতৃ-মাতৃহীন এই ভাইটির দায়িত্ব ছিল তার উপর, কিন্তু যখন স্নেহের বাঁধনটুকু আলগা হয়ে যায় তখন তিনি সংসারের মাঝে নিজেকে বেঁধে রাখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞানপিপাসু স্বামী অদ্বৈতচরণের পাণ্ডিত্যের অন্তরালে যে দাম্ভিকতা বিরাজমান ছিল সেই দম্ভের কারণেই তিনি কখনো স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়াকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি। অনিলা তার স্ত্রী ছাড়াও যে একজন ব্যক্তি তারও যে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিসত্তা রয়েছে তা কখনো বোঝার চেষ্টা করেননি। অথচ পাশের বাড়ির সিতাংশু মৌলি অল্পদিনের মধ্যেই অনিলাকে তার নারীসত্তার খোঁজ দিয়েছিলেন। একের পর এক সিতাংশুর প্রেমময় চিঠির উন্মত্ততা তাকে কতটুকু জাগিয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সিতাংশুই যে তাকে এই একঘেঁয়ে জীবনের খাঁচা ভাঙার তাগিদ জুগিয়েছেন তা সুস্পষ্ট। কিন্তু সেজন্য অনিলা সিতাংশুর কাছে ধরা দেয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি।

অনিলা মৌনতার আবরণে ঘেরা এক রহস্যময়ী নারী। তিনি সুস্পষ্ট করে কখনো কিছু বলেননি বটে তবে তার মৌন স্বভাব থেকে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে এই জীবনের প্রতি অনীহা। তিনি ইচ্ছা করলে ত্রিকোণ প্রেমকে আরো দীর্ঘায়িত করতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। সিতাংশুর চিঠি তাকে মুক্তভাবে বাঁচার প্রেরণা জুগিয়েছে, প্রথার বাইরে তাকে স্বাধীন মুক্তির পথ দেখিয়েছে। তাই অনিলা তার স্বামীর একঘেঁয়ে নিরেট সংসার নামক খাঁচা ছেড়ে নিজেকে মেলে দিয়েছেন অসীম পৃথিবীর মুক্ত আকাশে। "অনিলা কোথায় গিয়ে মুক্তি খুঁজেছে, কোনো পথে! তার কোন পথনির্দেশ দিয়ে যায়নি। গল্পকার এখানেই আশ্চর্য সিদ্ধি দেখিয়েছেন। অনিলা সমগ্র গল্পের মধ্যে এক বিশাল জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থেকেও সে-ই এই গল্পের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, মহত্তম প্রাপ্তি।"[৬]

নীরব সুগম্ভীর অভিজাত প্রতিশোধের গল্প 'প্রতিহিংসা'। যদিও জমিদার ও দেওয়ানের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তথাপি পারিবারিক জীবনভিত্তিক হওয়ায় নারী প্রাধান্য পেয়েছে। তাই গল্পটি আবর্তিত হয়েছে নায়িকা ইন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করে।

একসময় মুকুন্দবাবু তার অল্প কিছু বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার ভার উচ্চ কুলমর্যাদাসম্পন্ন পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। গৌরীকান্তের অতি যত্নে মুকুন্দবাবুর অল্পসম্পত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি নিজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি অল্পমূল্যে বাঁকাগাড়ি পরগনা ক্রয় না করে মুকুন্দবাবুকে ক্রয় করে দিয়ে মুকুন্দবাবুকে জমিদার শ্রেণিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। মুকুন্দবাবু ছিলেন নিঃসন্তান, বিনোদ তার পোষ্যপুত্র। মুকুন্দবাবুর পোষ্যপুত্র বিনোদবিহারী জমিদারি দেখাশোনা করেন না। এদিকে দেওয়ান গৌরীকান্ত মৃত্যুর পূর্বে মনিবের জমিদারি দেখাশোনার জন্য নিজপুত্র রামকান্তকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি কুলীন অনাথ অম্বিকাচরণকে নিজ অর্থে লেখাপড়া শিখিয়ে লালন-পালন করে তাকে জমিদারি দেখাশোনার ভার অর্পণ করেন। মাঝে মুকুন্দবাবু বিনোদের সাথে গৌরীকান্তের পৌত্রী ইন্দ্রাণীর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুকুন্দবাবুরা কুলে গৌরীকান্তের সমান না হওয়ায় কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও গৌরীকান্ত এ বিয়েতে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে গৌরীকান্তের চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সাথে নয়নতারার বিবাহ হয়। এবং গৌরীকান্ত তার নাতনি ইন্দ্রাণীর বিয়ে দিয়েছিলেন কুলীন অনাথ অম্বিকাচরণের সাথে।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রাণী কুলমর্যাদায় উচ্চ, রূপসী, ব্যক্তিত্বময়ী এবং তার আচরণে এমন একটি অবিচলতা ছিল যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই সংকীর্ণমনা নয়নতারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যতবারই তাকে হেয় করার চেষ্টা করেছে স্বল্পভাষিণী মৃদুহাসিনী ইন্দ্রাণী তাকে কৌশলে পরাজিত করেছেন। নয়নতারার আচরণে সে কষ্ট পাননি বিষয়টি তা নয় তবে তার গাম্ভীর্যতা থেকে প্রতি মুহূর্তে যা ধ্বনিত হয়েছে তা যেন এই নয়নতারার তাচ্ছিল্য এতটুকু স্পর্শ করতে পারে না তাকে। এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীকে নয়নতারার উপর আরো চরম প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। জমিদারদের ভিক্ষুক করে দাঁড় করিয়েছেন ইন্দ্রাণী ও অম্বিকাচরণের সামনে। স্বামীর জন্য যে ত্যাগ নয়নতারা করতে পারেনি সে ত্যাগ ইন্দ্রাণী করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প 'বদনাম'। এ গল্পের নায়িকা রবীন্দ্র আশীর্বাদধন্য আরেক প্রথাবিরোধী চরিত্র। এ গল্পে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে নারী চরিত্রেও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, গল্পে সৌদামিনী সেই সাক্ষ্য বহন করছে।

গল্পের নায়ক বিপ্লবী অনিলকে পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয়বাবু কারাগারে পাঠানোর জন্য জোর তদারকি করছিলেন, কিন্তু সেই স্বদেশীকে গোপনে সাহায্য করছিলেন তারই স্ত্রী সৌদামিনী। অনিলের সাথে ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে ভাই ফোঁটা দিয়ে তার কাছ থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে অনিলের আদর্শে রূপান্তরিত করেছিলেন। পুলিশের গুপ্তচরেরা বিজয়বাবুকে জানিয়েছিলেন কোনো এক নারী অনিলকে তাদের সব গতিবিধির কথা ফাঁস করে থাকেন। বিজয়বাবু বুঝে উঠতে পারেননি কে সেই মানবী। একবার কেবলমাত্র কথা প্রসঙ্গে সৌদামিনী ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে জানিয়েছিলেন দেশের কত লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে আর যারা সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ তাদের হাতে হাতকড়া পরানো হচ্ছে। নারীরা গৃহের-সংসারের কাজ করে সতীসাধ্বীগিরি করছে, তার চেয়ে অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতো একটা কিছু করতে পারে তাহলেই নারীদের রক্ষা।

কৌতুকের আবরণে ঢেকে অনিল ও সৌদামিনী চরিত্র দুটো উপস্থাপিত হলেও দুটো চরিত্রই বিপ্লবী কর্মতৎপরতায় ভরপুর। গল্পে বিপ্লবী নায়ক অনিলকে জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে তাকে ধার্মিক করে তোলা হয়েছে। যার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরকারী পুলিশেরাও অনিলের ভক্তবৃন্দে পরিণত হয়েছে। সৌদামিনী ইন্সপেক্টরবাবুর স্ত্রী হয়েও দেশ বিদ্রোহীকে সাহায্য করেছেন, কোনো সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ভীত না হয়ে। এবং দেশমাতৃকার সেবায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেননি।

'বিচারক' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার নির্মম চিত্র অঙ্কনের প্রয়াশ পেয়েছেন। গল্পটি এক কুলনারীর পতিতায় পরিণত হওয়ার গল্প। গল্পটি শুরু হয়েছে বিগত যৌবনা পতিতা ক্ষীরোদার লাঞ্ছনার কাহিনি বর্ণনার মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে। ক্ষীরোদা তার বিকৃত অতীত, ক্লান্ত বর্তমান আর অন্ধকার ভবিষ্যতের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছেন আত্মহত্যার মাধ্যমে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। বরং সহ্য করতে হয়েছে আরো বহু বেদনার ভার।

মূলত ক্ষীরোদা ছিলেন ভদ্রঘরের কন্যা বাল্যবিধবা। নাম ছিল তার হেমশশী। মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে ছিল তার সংসার। এই কোমলমতি বিধবার উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ভণ্ড মোহিতের। তিনি বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামে হেমশশীর সাথে সম্পর্ক গড়েন। হেমশশী ঘর ছাড়েন বিনোদের সাথে কিন্তু ঘটনাক্রমে হেমশশী নিমজ্জিত হন পাপের পঙ্কে, আর ধীরে ধীরে শুদ্ধচারী হয়ে ওঠেন বিনোদ এমনকি স্ট্যাট্যুটরি সিভিলিয়ান-ও।

ক্ষীরোদা সমস্ত জীবন বহু গ্লানিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অবশেষে গতযৌবনা অবস্থায় যে পুরুষের আশ্রয় পেয়েছিলেন সেও তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। তাই ক্ষীরোদা সমস্ত দিন অনাহারে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে মাথা খুঁড়তে থাকেন। শেষে তিন বছরের শিশু পুত্রটিকে নিয়ে প্রাণপণে বুকে চেপে নিকটবর্তী এক কূপে ঝাঁপ দেন কিন্তু মৃত্যুও তাকে আলিঙ্গন করেনি। শেষে পুত্র হত্যার দায়ে অপরাধী হয়ে তার স্থান হয় হাজতে। আর যে লম্পট বিনোদ চব্বিশ বছর পূর্বে হেমশশী নামক কুলনারীকে পতিতা ক্ষীরোদা হতে বাধ্য করেছিলেন তিনি আজ সমাজ রক্ষার তাগিদে উদ্বিগ্ন হয়ে পুত্র হত্যাকারিণী বারবনিতাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন।

ফাঁসির হুকুমের দুদিন পর মোহিতমোহন বন্দিনীশালায় প্রবেশ করে ক্ষীরোদাকে প্রহরীর সাথে বিবাদ করতে দেখে, কারণ অনুসন্ধানে আংটির বিষয়টি অবগত হন। এবং আংটির অস্তিত্ব সত্য জেনে জজ প্রহরীর কাছ থেকে আংটি উদ্ধার করে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে পেলেন এমনিভাবে চমকে ওঠেন। কেননা প্রথম যৌবনে তার প্রেমিকাকে তিনি চব্বিশ বছর আগে এই আংটিটি দিয়েছিলেন। যে মুহূর্তে বিচারক বুঝতে পারলেন এই পতিতা চব্বিশ বছরের পূর্বের প্রেমের ছলানাকে হৃদয়ে লালন করে এসেছেন পরম মমতায়, সেই মুহূর্তেই এই পতিতা তার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন দেবী প্রতিমার ন্যায়।

'বোষ্টমী' গল্পটিকে যৌথ আত্মবিশ্লেষণমূলক গল্প বলা যায়। গল্পের প্রথম দিকে লেখকের নিজের কথা রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে বোষ্টমীর সাথে আলাপচারিতা এবং দ্বিতীয়াংশে লেখকের কাছে বোষ্টমীর আত্মকথনের মাধমে গল্পটি দানা বেঁধে উঠেছে। আনন্দী বোষ্টমীর আত্মকথনে কোনোরকম ফাঁকি নেই, তিনি নিজ মুখে নিজের অতীতের কথা লেখকের কাছে বলে হালকা হতে চেয়েছেন। তার স্বামী-সন্তান একসময় সবই ছিল। কিন্তু নিজের অসাবধানতার কারণে সন্তানকে হারিয়ে আনন্দী পাগল প্রায় হয়ে ওঠেন।

এমন সময় তার স্বামীর গুরুঠাকুর দেশে ফিরে এলে স্বামী আনন্দীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য গুরুকে অনুরোধ করেন গুরুর প্রতি বোষ্টমীর স্বামীর অফুরন্ত ভক্তি তাদের সংসারকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। বোষ্টমীও তাই দেবতাকে তার গুরুর রূপেই দেখতে পান। কিন্তু গোপনে গোপনে কোথায় একটা চুরি চলছিল যা অন্তর্যামীর

Dhaka University Institutional Repository

কাছে ধরা পড়েছে। সহজিয়া আনন্দী যে গুরুর মাঝে দেবতাকে দেখেছেন সেই গুরুঠাকুরের কামনাকাতর বাণী আনন্দীর নিজের অজানা মনটাকে নিজের কাছে স্পষ্ট করে হাজির করেছে। আনন্দী ও গুরু ভেতরে ভেতরে একে অন্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যা ক্রমেই আনন্দীর স্বামীও জানতে পারেন।

ভক্তির অন্তরালে গুরুর প্রতি তার ভোগের বীভৎসতার রূপ আনন্দীকে ধিক্কার দিয়েছে। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার একাগ্রতা না থাকায় আনন্দী নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংসার ত্যাগের। এই সংসার ত্যাগী ভিখারিনী প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে দেখা পেয়েছেন আরেক সত্য অনুসন্ধানকারীর। যিনি এই গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর কাছে বোষ্টমী অকপটে স্বীকার করেছেন তার বোষ্টমীতে পরিণত হওয়ার সমস্ত ঘটনা।

মূলত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাঁর ধর্মপালন আচারে নয় বিচারে পরিলক্ষিত হয়। তাই তিনি সমগ্র জীবন সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তিনি ভোগী নন আবার যোগীও নন, তিনি ধনবান কিন্তু বিলাসিতা নেই শুধু সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করাই তাঁর লক্ষ্য। লেখকের এই নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে বোষ্টমী তাঁকে গৌর বলে পূজা নিবেদন করেছেন। তাই সত্যকে খোঁজা ও রবিঠাকুরের মাঝে সেই সত্যের উপস্থিতি লক্ষ করে বোষ্টমীর আত্মার মুক্তি হয়েছে। মূলত বোষ্টমী চরিত্রটি প্রথা ভঙ্গকারী এক স্বতন্ত্র চরিত্র।

‘মহামায়া’ গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে কৌলিন্য ও সহমরণ প্রথাকে কেন্দ্র করে। গল্পের নায়িকা মহামায়া কুলীন ঘরের কন্যা। উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় অধিক বয়সেও অবিবাহিতা। প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন গ্রামের রেশমের কুঠির বড় সাহেবের আশ্রিত রাজীবলোচনের সাথে। মহামায়ার ভাই ভবানীচরণ এই ঘটনা জানার পর সেই রাত্রেই মহামায়াকে শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পরের দিনই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মারা যাওয়ায় সেই চিতায় মহামায়াকে সহমৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

সেইদিন প্রকৃতিতে মহাবিপ্লব শুরু হয়েছিল। আর তাই প্রকৃতির আশীর্বাদে চিতা নিভে গেলে মহামায়া প্রাণে বেঁচে যান। তিনি প্রথমে তার দগ্ধ শরীর নিয়ে নিজের গৃহে আয়নায় নিজেকে দেখে তারপর ঘোমটার আড়ালে মুখ আবৃত করে রাজীবের ঘরে পৌঁছান। এবং কখনো তার ঘোমটা অনাবৃত করা যাবে না এই শর্তে রাজীবকে আবদ্ধ করে তার ঘরে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহামায়ার এই ভয়ঙ্কর শর্তের অর্থ দাঁড়ায় তাদের প্রেমের সত্যতার অভাব। যদি তাদের ভালোবাসা নিখাঁদ হতো তাহলে এই শর্তের প্রসঙ্গ আসত না। যদিও রাজীব নেহাতই ভালো মানুষ তথাপি তার ভালোবাসায় যা বহুল পরিমাণে ছিল তা ভক্তি। রাজীব মহামায়াকে ভয় করতেন। মহামায়ার প্রখর আত্মোহংকার তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের সামনে

Dhaka University Institutional Repository

রাজীব ছিলেন ম্রিয়মাণ। তাই নিস্তব্ধ দুপুরে নির্জন ভাঙা মন্দিরে মহামায়াকে বিয়ের প্রস্তাব করে রাজীবের সাহস ছিল না তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর শোনার। এমনকি চিতা থেকে উঠে অর্ধদগ্ধ মহামায়া প্রেমিকের সাথে একই ছাদের তলায় থাকতে রাজি হয় শুধু প্রতিজ্ঞার খাতিরে। কেননা মহামায়া সব সময় প্রেমিকের কাছ থেকে পুজো নিয়েছেন আর কৃপা করেছেন, কৃপা পাওয়ার অভ্যাস তার নেই তাই এই প্রতিজ্ঞা। মহামায়ার এই আচরণ কোনো অসহায় নারীর আশ্রয় চাওয়া নয়, তা নইলে সেই মুহূর্তেই অর্ধদগ্ধ মহামায়া দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রাজীবকে বলতে পারতেন না আবার চিতায় ফিরে যাওয়ার কথা। তখন ক্ষণিকের উত্তেজনায় রাজীব রাজি হলেও ক্রমান্বয়ে তাদের দিন-রাত্রির মধ্যে একটি দুঃসহ বেদনা রাজীবকে আঘাত করতে থাকে। তিনি যেন মহামায়ার আর কোনো নাগাল পান না। কেবল একটি অতৃপ্ত বাসনা এই অটল রহস্য ভেদ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। রাজীব প্রতিজ্ঞা ভাঙেন আর তাতেই মহামায়ার আত্মোহংকারে আঘাত লাগে। সেই জন্য উগ্র আত্মসচেতন নারী মহামায়া রাজীবকে নীরব ক্রোধানলে দগ্ধ করে তার গৃহ ছেড়ে চিরবিদায় নেন। তবুও মহামায়ার স্বতন্ত্রতা তিনি অকুলীন রাজীবকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, ভালোও বেসেছেন।

'মানভঞ্জন' গল্পটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরকেন্দ্রিক সমাজ বাস্তবতার ছবি লেখক তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের শুরুতেই তিনি গল্পের নায়ক গোপীনাথ শীলের গৃহের বর্ণনার মাধ্যমে তার রুচি, স্বভাব, সামাজিক অবস্থান পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করেছেন। আর এক উচ্ছৃঙ্খল ধনী যুবকের জীবনের চালচিত্র অঙ্কনের ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে মূলত গল্পের নায়িকা গিরিবালার আত্মাভিমান।

গিরিবালা নিঃসন্তান নারী। তিনি অগাধ রূপের অধিকারিণী, সচরাচর যেমন চারিদেকে দেখা যায় তিনি তা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। গিরিবালা নিজেও তার রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়ে বাইরের যে পৃথিবীটাকে দেখতে পেতেন সেই পৃথিবীটাকে যে সে এক মুহূর্তে জয় করতে পারেন এই বিশ্বাস তার নিজের উপর ছিল। কিন্তু সত্যি কথা হল নিজের স্বামীকে তিনি বশ করতে পারেননি। তিনি অবহেলিত, অপমানিত স্ত্রী। তার স্বামী তাকে রেখে থিয়েটারের নটীর প্রতি অনুরক্ত। বাল্যকালে গিরিবালা বরং স্বামীর ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তখন গোপীনাথ স্কুল পালিয়ে অভিভাবকদের লুকিয়ে নির্জন দুপুরে স্ত্রীর সাথে প্রেমালাপ করতে আসতেন। একই বাড়িতে থেকেও উভয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি করতেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। গিরিবালার শ্বশুর রমানাথ শীলের মৃত্যুর পর গোপীনাথ যখন গৃহের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন তখন থেকেই তার গতিবিধি গৃহের পরিবর্তে অন্যত্র প্রসারিত হতে থাকে। এ সময় থেকেই তার কাছে বাইরের জগৎ, বন্ধু মহল, থিয়েটার, পরনারী, মদ, জুয়া সকলই প্রধান হয়ে ওঠে কেবল গিরিবালা ছাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিবালা যখন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন তার স্বামীর কাছে তিনি অপেক্ষা থিয়েটারের নটী লবঙ্গ অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তখন থেকেই তিনি সমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। তাকে প্রহার করে তার শরীর থেকে অলংকার খুলে গোপীনাথ লবঙ্গকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হলে, এই নিঃসন্তান গিরিবালার স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে কোথাও বাধে না। "ঘরের কুলবধূ স্বামীদেবতার কোনো আচরণেরই কোনো প্রকারের প্রতিবাদ করার অধিকার পাবে না–এমন কুসংস্কারপূর্ণ চিন্তার বিরুদ্ধে সেকালের ভীষণতম প্রতিবাদ গিরিবালা চরিত্র। এমনকি, প্রতিবাদ বঙ্কিম-রচিত আদর্শের বিরুদ্ধেও। .....স্বামী বিপথগামী হ'লে স্ত্রী কেবল বলবে–'আমি যদি সতী হই তবে...' এবং তাহ'লেই, যেহেতু সতী.বাক্য নিষ্ফল হ'তে পারে না, অতএব স্বামীকে অনুতপ্ত চিত্তে স্ত্রীর পথে আবার ফিরে আসতেই হবে। বঙ্কিমী-ধারণার এই বৃত্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, বলা ভালো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ ক'রে, 'মানভঞ্জন' গল্পের জন্ম দিলেন রবীন্দ্রনাথ। "[৭]

আর তাই গিরিবালা তার অগাধ রূপ নিয়ে হাজির হন থিয়েটার পাড়ায়। এবং অল্প সময়ে মনোরঞ্জন করেন অগণিত দর্শকদের। আত্মরতিমগ্নতায় বিভোর গিরিবালা থিয়েটারে লবঙ্গের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মূলত তার অহংবোধের জয় ঘোষণা করেছেন।

'মাল্যদান' গল্পটি সম্পূর্ণরূপে একটি প্রেমের গল্প। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রে রয়েছে নায়িকা কুড়ানি। কুড়ানি ষোল বছর বয়সী বুদ্ধিহীনা একটি মেয়ে। হরকুমারবাবু তার পরিবার নিয়ে যখন পশ্চিমে ছিলেন তখন দুর্ভিক্ষের সময় এই কুড়ানিকে তারা আশ্রয় দেন। খাদ্যের অভাবে কুড়ানির মা-বাবার মৃত্যু হয়েছিল, কেবল ও-ই বেঁচে গিয়েছিল কোনো রকমে। ওর জাত কেউ জানে না। কুড়িয়ে পাওয়ার দরুন পটল ওকে কুড়ানি বলে ডাকতেন।

গল্পে দেখা যায় পটলের খুড়তুতো ভাই যতীন পটলদের বাড়িতে বেড়াতে এলে হরকুমার যতীনকে কুড়ানির চিকিৎসার কথা বলেন। কিন্তু পটল এই কুড়ানির সাথে যতীনকে জড়িয়ে নানা রকম রসিকতা শুরু করেন। এই রসিকতায় যতীন বিরক্ত হলেও কুড়ানি সত্য বলে বিশ্বাস করে। তাই পটলের উপর রাগ করে যতীন চলে গেলে কুড়ানি এই অপমান সহ্য করতে না পেরে পটলের দেয়া সকল উপহার সামগ্রী রেখে গৃহ ত্যাগ করে।

অবশেষে কুড়ানি অসুস্থ অবস্থায় প্লেগ-হাসপাতালে আশ্রয় পায়। সে হাসপাতালে যতীন ডাক্তার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। যতীন নতুন রোগিণীর খবর পেয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে কুড়ানিকে আবিষ্কার করেন। এদিকে খবর পেয়ে পটল ও তার স্বামী এলে তাদের উপস্থিতিতে যতীন কুড়ানির ভালোবাসাকে স্বীকার করেন এবং কুড়ানির মালা তার গলায় পরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যতীনের কাছ থেকে কুড়ানি তার ভালোবাসার প্রতিদান পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যতীনকে নিজের করে পাওয়ার গৌরব অর্জন করে তবেই

Dhaka University Institutional Repository

অজানার দেশে পা বাড়িয়েছে। কুড়ানিকে রবীন্দ্রনাথ যতই বুদ্ধিহীনা করে উপস্থাপন করুন না কেন কুড়ানিকে মূলত আধুনিক নায়িকাই রেখেছেন।

'মাল্যদান' গল্পটির বিশেষত্ব এখানে এই যে, এ গল্পে প্রেমময় অভিব্যক্তির প্রকাশ নারীর দিক থেকে দেখানো হয়েছে। মূলত যে সময়ের গল্প এটি সে সময়ে নারীর চাওয়া-পাওয়ার মূল্যায়ন কোথাও ছিল না। সে দিক থেকে বিবেচনা করে বলতে হয় কুড়ানি চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

'মুসলমানীর গল্প' গল্পে লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্র ও সমাজের ভয়াবহ ক্রান্তিলগ্নে পরিবারে রূপসী কন্যার আগমন ছিল সেই গৃহস্বামীর প্রতি বিধাতার অভিশাপ। এই অভিশাপে অভিশপ্ত হলেন বংশীবদন। কেননা তার ভ্রাতৃকন্যা কমলা ছিল অপরূপা। দাদা-বৌদির মৃত্যুর পর কমলাকে বংশীবদন লালন-পালন করেন। পরবর্তীতে মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলের সাথে কমলার বিয়ে হয়। বউ নিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাত আক্রমণ করে। এ সময় কমলাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেন বৃদ্ধ হবির খাঁ এবং কমলাকে একটি মহলে আশ্রয় দেন। কমলা রাজপুতানী মহলে আশ্রয় পেয়ে একেবারে যেন মহিষীর পদ লাভ করে। তার পূজা-আচারের জন্য বুড়ো ব্রাহ্মণ সেবার জন্য হিন্দু ঘরের দাস-দাসী সবই প্রস্তুত ছিল। কাকার ঘরের তুলনায় এ ঘর ছিল তার জন্য ভূ-স্বর্গ। ধীরে ধীরে কমলা হবির-খাঁ মেজো পুত্র করিমের প্রেমে পড়ে এবং কমলা হবির খাঁর কাছে তাদের সব কথা স্বীকার করে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। করিমের সাথে কমলার বিয়ে হয়ে যায়। তার নতুন নামকরণ হয় মেহেরজান।

পরবর্তীকালে কমলার কাকাতো বোন সরলার বিয়ের সময়ও আবার ডাকাতের আগমন ঘটে। এবারও হবির খাঁ এসে উপস্থিত, সেই সাথে এসেছে অর্ধচন্দ্র আঁকা পতাকাবাঁধা বর্শার ফলক নিয়ে মেহেরজান। ডাকাতদল এবারও পালিয়ে যায়। মেহেরজান সরলাকে অভয়দান করে জানায় তার কোনো ভয় নেই, সে সরলার জন্য এমন একজনের আশ্রয় নিয়ে এসেছে যিনি জাত-ধর্ম বিচার না করে সকলকে আশ্রয় দেন। এবং কাকাকে পা না ছুঁয়ে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে অনুরোধ জানায় সরলাকে ঘরে নেয়ার জন্য, কারণ সে অস্পৃশ্য, এবং কাকীর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়ে আজ এমনি করে সে ঋণ শোধ করতে পারার জন্য সে গর্বিত। সেই সাথে তার শেষ স্বীকারোক্তি সরলার যে কোনো বিপদে তাকে রক্ষা করার জন্য তার মুসলমান দিদি আছে।

মূলত 'মুসলমানীর গল্প' সমসাময়িককালে রবীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এমন স্পর্শকাতর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্প লেখা সম্ভব। গল্পটি ১৯৪১ সালে জুন মাসের চব্বিশ, পঁচিশ তারিখে লিখিত হয়েছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের প্রায় দেড়-দু মাস আগে। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তিনি দেখতে চেয়েছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলন। আর তাই তিনি লিখেছেন

এক হিন্দু কন্যার স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়ার গল্প। এ গল্পটিতে একই সাথে হিন্দুত্বের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল বিদ্রোহ, পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের ঔদার্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। আর কমলা তার সম্পর্কে বলা যায় সে দুর্দান্তরূপে আবির্ভূত হয়েছে সাহিত্যের অঙ্গনে।

'ল্যাবরেটরি' ল্যাবরেটরি গল্পের নায়িকা সোহিনী রবীন্দ্রসৃষ্ট আধুনিকতম নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রচণ্ডরূপে প্রথাবিরোধী। বিজ্ঞানী নন্দনকিশোর এক সময় ব্যবসার কাজে পাঞ্জাবে ছিলেন। সেখানেই জুটে গিয়েছিল তার এই সঙ্গিনী, নাম তার সোহিনী। মেয়েটি নিজে থেকেই নন্দনকিশোরকে অনুরোধ করেছিলেন তার আইমার বাড়ি দেনার দায়ে বিক্রি হওয়া থেকে বাঁচাতে। সাত হাজার টাকা হলে তা শোধ হবে। আর তার বিনিময়ে মোহিনী সারাজীবন তার সাথে থাকবেন। নন্দন তার সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নন্দনকিশোর মোহিনীকে যে অবস্থা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয় এবং নিভৃত নয়। বন্ধুরা বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন তা অতিরিক্ত নয় সহনীয় পর্যায়ের।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে প্রৌঢ় বয়সে নন্দনকিশোর মারা গেলে, বিধবা সোহিনীকে লবঙ্গলতিকা ভেবে দূরের আত্মীয়রা মামলার ফাঁদ ফাঁদলেও শেষ পর্যন্ত সোহিনীর সাথে পেরে ওঠেননি। তার স্বামীর সাধনার তীর্থক্ষেত্র ল্যাবরেটরীকে তিনি আত্মীয়দের লালসার বাসনা থেকে রক্ষা করেছেন তেমনি রক্ষা করেছেন উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে অভ্যস্ত তার কন্যা নীলার কাছ থেকেও। নীলা ছিল ভাঙন ধরানো মেয়ে। কেননা সোহিনী বেছে বেছে যে ছেলেটিকে খুঁজে ল্যাবরেটরীর দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, সেই রেবতী ভট্টাচার্যও হয়েছিল নীলার অসংখ্য শিকারের একজন। সোহিনী কোলকাতার বাইরে থাকার সুযোগে নীলা জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করার মতলব নিয়ে রেবতীর গবেষণাগারে পৌঁছে, তারপর থেকে আস্তে আস্তে রেবতীকে তার খেলার পুতুলে পরিণত করে। তবে শেষ পর্যন্ত সোহিনী তার ল্যাবরেটরীকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

'ল্যাবরেটরী' রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষের দিকের রচনা। গল্পটিতে রবীন্দ্রভাবনার অত্যাধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির মূল চরিত্রে রয়েছেন সোহিনী। বিজ্ঞান পাগল নন্দনকিশোর নিজের জীবনের সাথে সোহিনীকে জড়িয়ে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তার অসবর্ণবিবাহ পছন্দ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন পতিব্রতা স্ত্রী পেতে হলে আগে ব্রতের মিল করাতে হবে। সোহিনীর চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি যাই থাক চিত্তশক্তিতে তিনি ছিলেন অদম্য, একনিষ্ঠ। সমাজে প্রচলিত সামাজিক সতীত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে তার বাধেনি। এমনকি আচারধর্মেরও সেবা করতে তিনি ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে কালীতলায় ছোটেননি। "ল্যাবরেটরী'কে রক্ষা করার বৃত্তিই সোহিনীর মজ্জাগত। মোটরের তলায় পড়ে পা-ভাঙ্গা রোঁয়া-ওঠা, হাড়-বের-করা একটা কুকুর যখন সোহিনীর সেবাযত্নে মরতে মরতে সেরে ওঠে, কিংবা বায়োলজির ল্যাবরেটরির

কানা-খোঁড়া কুকুর খরগোশগুলোর জন্য যখন সোহিনী একটা হাসপাতাল বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে–তখন বোঝা যায় যে, রক্ষা-করবার মনোবৃত্তিই সোহিনীর স্বাভাবিক বৃত্তি। এখানেই নন্দকিশোর আর সোহিনীর জীবনাদর্শে আশ্চর্য সাদৃশ্য। নন্দকিশোর 'ল্যাবরেটরী' গড়ার জন্যই 'নিষ্কাম লোভে' রেলওয়ে কোম্পানীর টাকা চুরি করেছিলেন; মোহিনীও 'ল্যাবরেটরী' রক্ষার জন্যই নিজের নারীত্বকে অনাসক্তভাবে ব্যবহার করেছে।"[১১] মোহিনীর সমস্ত চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে যে সত্যটি মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হল তার ধারালো ব্যক্তিত্ব। যাকে নন্দনকিশোর আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সত্যিই মোহিনী রবিঠাকুরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

'শাস্তি' গল্পটি ভূমিহীন কৃষক পরিবারের নিদারুণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত। পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে গল্পটির আবর্তন। দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই কোর্ফা প্রজা, অন্যের জমিতে জন কেটে তাদের সংসার চলে। এ গল্পে লেখক দ্বিধাহীনভাবে জমিদারদের শোষণ ও প্রজার দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন চন্দরা চরিত্র সৃষ্টিতে। দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি নারী চরিত্র চন্দরা। তার সবল প্রাণধর্মিতার কারণে সে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যকে বরণ করে না নিয়ে প্রতিবাদে দৃঢ় কঠিন থেকেছে।

চন্দরাকে তাদের দলের কখনোই ভাবা যাবে না যারা নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছের কাছে বিকিয়ে দেয়। তবে একটি জায়গায় সে ছিল ব্যতিক্রম–যখন তার স্বামী ছিদাম ভাইকে বাঁচাতে বৌদির খুনের দায় স্ত্রী চন্দরার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে তখন। স্বামীর দেয়া মিথ্যা অপবাদ ও অপমানের সে একটি প্রতিবাদও করেনি। মূলত এটি তার স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণ। এখানে অভিমানী চন্দরা নীরব প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের এতদিনের সাংসারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে স্বামীকে এক অসীম শূন্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। যদিও বিষয়টি ছিদাম প্রথম দিকে তলিয়ে দেখেনি। পরবর্তীতে যখন চন্দরাকে উপদেশবাক্যে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে তখন চন্দরার একগুয়েমি জেদ তাকে সজাগ করেছে তার কাপুরুষোচিত আচরণ সম্পর্কে। বউ মারা গেলে বউ পাওয়া যাবে কিন্তু ভাই মারা গেলে ভাইকে পাওয়া যাবে না–ই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিদাম ফাঁসিতে ঝুলতে উদগ্রীব চন্দরার বন্য রাগে শেষ মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পেরেছে চন্দরাকে ছাড়া তার নিজ জীবনের শূন্যতাকে।

"চন্দরা একটু যেন বন্য; অন্তত সেই সমাজের একজন সে কিছুতেই নয় যেখানে পুরুষের স্বার্থপর একাধিপত্যকে সে স্বাভাবিক সমাজ-বিধাতার নিয়ম বলে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারে। তার বন্য প্রাণধর্মিতা তাকে স্বামীর সঙ্গে সমানাধিকারের প্রশ্নে সচেতন করে তোলে।"[৮]

চন্দরাকে প্রথাবিরোধী নারী করে তুলতে লেখক রবীন্দ্রনাথ একেবারে চরমভাবে বাস্তববাদী। নির্দোষ চন্দরাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখেননি পাঠকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, বরং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে করুণরসের জন্ম দিয়েছেন। এবং চিরকালের মতো অপরাধী করে রেখেছেন ছিদামকে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি নারী মুক্তির দলিল। রবীন্দ্রনাথ খুব জোরালো ভাষায় নারীর অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন 'মৃণাল' চরিত্রটির বরাত দিয়ে। মৃণাল এ গল্পের মূল চরিত্র। তার চৌকষ ব্যক্তিত্বের আবহ পুরো গল্পটিকে আবৃত করে রেখেছে।

মৃণাল নিগৃহীতা নারী ছিলেন না। তার শ্বশুরবাড়িতে তার খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। তার ভাশুরের চরিত্র যেমনই হোক তার স্বামীর চরিত্রও মন্দ বলা যায় না। কিন্তু তারপরও মৃণাল ধনীগৃহের সুখী বধূ নন। তিনি সন্তানহীনা। মা হওয়ার কষ্টটুকু ভোগ করেছেন ঠিকই কিন্তু আনন্দটুকু বিধাতা তাকে দেননি। তাই ঠুনকো সাংসারিক বন্ধনের তিনি পরোয়া করেননি, নিঃসন্তান হওয়ায় হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিতে তাকে বেশি ভাবতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মৃণালকে শ্বশুরবাড়ির অনুশাসন ভাঙার তাগিদ জুগিয়েছে বিন্দু। বিন্দু মৃণালের বড় জায়ের ছোট বোন। তাদের বাড়ির আশ্রিতা ছিল। বিন্দুকে একটুখানি স্নেহ করার কারণে তাকে বাড়ির সকলের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। এদেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর যে সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে বিচরণ তাদের সেখানে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মৃণালকে সেই গোত্রে ফেলা যাবে না। মৃণাল চিরাচরিত প্রথার আগল ভেঙ্গে তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ততায় ছিলেন ঋদ্ধ। তাই বিন্দুকে নিজের সাথে রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিন্দু তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃণালের মুক্তিকে নিশ্চিত করেছে। বিন্দুর মৃত্যু মৃণালকে বুঝতে শিখিয়েছে সংসারে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা কি।

"বস্তুত, মৃণালের মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ তাকে ঘর ছাড়িয়েছে। চার-দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়া, সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের সীমায় আবদ্ধ মুক্তিকামী জীবন; মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে বেড়িয়ে এসেছে। মৃণাল 'মেজোবউ'-এর পরিচয় ভেঙে 'মৃণাল' হয়ে উঠতে চায়।"[৯] তাই আর তার ইচ্ছে নেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরে যাওয়ার। এইবার মরেছেন সেই বাড়ির মেজোবউ, সেই সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছেন মৃণাল।

তথ্যনির্দেশঃ

১. নীপা কর, 'নারী: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প; প্রথম প্রকাশ: ২রা ডিসেম্বর, ২০০৪, পুস্তকবিপণি-২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা-৯৮।

২. ক্ষেত্র গুপ্ত 'রবীন্দ্র-গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ; প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৯১ আগস্ট, ১৯৮৪, গ্রন্থনিলয় ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা-১৬৪।

৩. নীপা কর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪।

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮।

৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৬।

৬. উদয়চাঁদ দাস, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: প্রেক্ষিত বাস্তবতা, প্রথম প্রকাশ: ২২শে শ্রাবণ ১৪০৩, ৭ আগস্ট, ১৯৯৬, পুস্তকবিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা-৮৬।

৭. আনোয়ার পাশা, 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা; প্রথম প্রকাশ: কার্তিক, ১৩৭০, স্টুডেন্ট ওয়েজ ৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১, পৃষ্ঠা-৮০।

৮. আনোয়ার পাশা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫।

৯. উদয়চাঁদ দাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯।

১০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়. 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ; প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৭৩, বাক-সাহিত্য (প্রা:) লিমিটেড ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১৭-১৮।

১১. তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে শিল্পরূপ,' প্রথমা প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা-৩৭৯।

১২. উদয়চাঁদ দাস, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: প্রেক্ষিত বাস্তবতা,' প্রথম প্রকাশ: ২২ শে শ্রাবণ ১৪০৩, ৭ আগস্ট, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃ: ৭৩।

উপসংহার

আধুনিকতার ও ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের মুক্তি ঘটে। শুধু শিল্প সৃষ্টির তাগিদে নয় বাঙালির বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে 'গল্পগুচ্ছ' বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল সাহিত্য সম্পদ। গল্প বর্ণনার কৌশল, উপস্থাপনার নিজস্বতা, চরিত্রসৃষ্টি, ভাষানির্মাণ সর্বোপরি বিষয়ের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসাধারণ। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুখ-দুঃখের প্রশ্ন যেমন রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে তেমনি তাদের অধিকারের প্রশ্নও তাঁকে করেছে সচেতন। সমকালীন কোনো অস্থিতিশীলতা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষকশ্রেণি তাঁর স্বজাতির উপর নিত্যদিন যে নির্মম অত্যাচার অব্যাহত রেখেছিল সেই সমসাময়িক বাস্তবতাই তাঁর কলমকে করেছে অধিক শাণিত। আর সেই পরিচয় বহন করে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ বেশ কিছু গল্প। সমগ্র 'গল্পগুচ্ছ'-এ বিষয়ের ভিন্নতায় চুরানব্বইটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আর এই চুরানব্বইটি গল্পকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য নারী-পুরুষ ও শিশু চরিত্র। চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অক্লান্ত স্রষ্টা। তিনি যেমন বলাইয়ের মতো প্রকৃতিপ্রেমী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তেমনি করেছেন চুনিলালের মতো পড়ালেখায় অমনোযোগী কিন্তু শিল্পসাধনায় নিষ্ঠাবান শিশু চরিত্র। আবার দেখা যাচ্ছে তাঁর গল্পে একদিকে যেমন রয়েছে নীহারের মতো প্রতিভাবান অকৃতজ্ঞ নায়ক চরিত্র তেমনি রয়েছে শশিভূষণের মতো সত্যনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ নায়ক চরিত্রের উপস্থিতি। তবে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন নারী চরিত্র সৃষ্টিতে–মৃণাল, গিরিবালা, চন্দরা, তার সৃষ্ট অসাধারণ নারী চরিত্র।

'গল্পগুচ্ছ'-এর নারী চরিত্রের জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় ও সমাজতাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বর্তমানেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। তবে আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে নারীচরিত্রের অধিকাংশই মনস্তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক দিয়ে অনন্য এবং বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ নারীর কন্যা-জায়া-জননী রূপের পাশাপাশি মানবীয় দিকটিকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় 'নারী-স্বাধীনতা' বিষয়টির অর্থ ভিন্ন। আজকের পুঁজিবাদী বিশ্ব নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পণ্যে পরিণত করেছে, যা মূলত রবীন্দ্র-চিন্তার উল্টো পিঠ। নারীকে তিনি সর্বপ্রথমে 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাই তার চেতনায় ধরা পড়েছে 'নারীমুক্তি' মানে 'মানবমুক্তি'। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা এবং স্বতন্ত্রমহিম শিল্পচেতনা।

পরিশিষ্ট

নিচে আদ্যাক্ষর অনুসারে গল্প সাজিয়ে সেই গল্পভুক্ত নারীচরিত্রসমূহের পরিচয় প্রদান করা হলো:

"অতিথি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয় / সম্পর্ক
অন্নপূর্ণা	পঁয়ত্রিশ/চল্লিশ (আনুমানিক)	কাঁঠালিয়ার জমিদারবাবুর স্ত্রী
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ / পঁয়তাল্লিশ (ঐ)	তারাপদর মা
মা (ঐ)	পঁয়ত্রিশ / চল্লিশ (ঐ)	সোনামণির মা
দাসী (ঐ)	উনিশ / কুড়ি (ঐ)	অন্নপূর্ণা দেবীর কাজের মেয়ে

" অধ্যাপক "

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয় / সম্পর্ক
কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	ষোল/ সতের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

"অনধিকার প্রবেশ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয় / সম্পর্ক
জয়কালী দেবী	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী ও পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির স্ত্রী
নিস্তারিণী	ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ (ঐ)	পূজক ব্রাহ্মণের স্ত্রী
মোক্ষদা	উনিশ/কুড়ি (ঐ)	জয়কালীর দাসী
স্ত্রীলোকেরা	বিভিন্ন বয়সী (ঐ)	পল্লীর অন্যান্য বাসিন্দা

"অপরিচিতা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয় / সম্পর্ক
কল্যাণী	ষোল/সতের	গল্পের নায়িকা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ /বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	নায়কের মা

"অসম্ভব কথা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
দিদিমা (নাম অনুল্লিখিত)	ষাট/পঁয়ষট্টি (পূর্ববর্তী সময়ানুযায়ী আনুমানিক)	লেখকের ঠাকুরমা
মা (ঐ)	ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ (ঐ)	লেখকের মা
রানী (ঐ)	ত্রিশ/বত্রিশ (আনুমানিক)	রূপকথার চরিত্র
রাজকন্যা (ঐ)	ষোল (ঐ)	রূপকথার রাজকন্যা

"আপদ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কিরণময়ী	বিশ/একুশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
শাশুড়ি	পঁয়তাল্লিশ/ পঞ্চাশ (ঐ)	কিরণের শাশুড়ি
দাসী	সতের/আঠার (ঐ)	কিরণের কাজের মেয়ে

"ইচ্ছাপূরণ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
আন্দিপিসি	ষাট/পঁয়ষট্টি (আনুমানিক)	পাড়ার বৃদ্ধা পিসি

"উদ্ধার"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
গৌরী	বিশ/একুশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
দাসী (নাম অনুল্লিখিত)	উনিশ/কুড়ি (ঐ)	গৌরীর দাসী

"উলুখড়ের বিপদ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
গৃহিণী (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	নায়েবের গৃহিণী
গৃহিণী ঠাকুরাণী (ঐ)	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (ঐ)	হরিহর ভট্টাচার্যের গৃহিণী
প্যারী	পনের/ষোল (ঐ)	নায়েবের অন্তঃপুরের দাসী

"একটি আষাঢ়ে গল্প"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
দুয়ারানী	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	নির্বাসিত রানী
বিবি	পনের/ষোলো	তাসের রাজ্যের বিবি/নায়িকা

"একরাত্রি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সুরবালা	এগার/বার (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (ঐ)	নায়কের মা

"কঙ্কাল"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
গল্প কথক (নাম অনুল্লিখিত)	ছাব্বিশ	গল্পের নায়িকা

"করুণা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
করুণা	ষোলো/সতের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
ভবি	ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ (ঐ)	করুণার পুরাতন দাসী
মোহিনী	বাইশ/তেইশ (ঐ)	বিধাব (মহেন্দ্র ও নরেন্দ্র দুজনেরই প্রতিবেশিনী)
রজনী	সতের/আঠার (ঐ)	মহেন্দ্রের স্ত্রী
গৃহিণী (নাম অনুল্লিখিত)	ত্রিশ/বত্রিশ (ঐ)	রঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথম স্ত্রী ছিলেন (মৃত)
কাত্যায়নী	আঠার/ উনিশ (ঐ)	রঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী
শাশুড়ি (নাম অনুল্লিখিত)	পঞ্চান্ন/ছাপ্পান্ন (ঐ)	মহেন্দ্রের মা
ননদ (ঐ)	পনের/ষোলো (ঐ)	মহেন্দ্রের ছোটবোন

"কর্ম্মফল"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বিধুমুখী	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (আনুমানিক)	সতীশের মা
সুকুমারী	আটত্রিশ/চল্লিশ (ঐ)	সতীশের মাসিমা
জেঠাইমা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (ঐ)	সতীশের জেঠাইমা
ভাদুড়িজায়া (ঐ)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (ঐ)	নলিনীর মা
নলিনী	পনের/ষোলো (ঐ)	সতীশের বান্ধবী

"কাবুলিওয়ালা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁচিশ/ত্রিশ (আনুমানিক)	মিনির মা

"ক্ষুধিত পাষাণ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
পারসিক নারী (নাম অনুল্লিখিত) দূতী (ঐ)	উনিশ/কুড়ি (আনুমানিক) উনিশ/কুড়ি (ঐ)	গল্পের নায়িকা নায়িকার দূতী পারসিক নারী

"খাতা"

'গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ'

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয় / সম্পর্ক
বউঠাকুরাণী (নাম অনুল্লিখিত) যশোদা ভিখারিণী (নাম অনুল্লিখিত)	চৌদ্দ/পনের (আনুমানিক) পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ) চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (ঐ)	গোবিন্দলালের স্ত্রী বাড়ির পুরাতন দাসী বোস্টমী গায়িকা

"খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"

'গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ'

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মাঠাকুরাণী (নাম অনুল্লিখিত) স্ত্রী (ঐ) ভগ্নী (ঐ)	পঁচিশ/ছাব্বিশ (আনুমানিক) পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (ঐ) পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (ঐ)	মুন্সেফ অনুকূলবাবুর স্ত্রী রাইচরণের স্ত্রী রাইচরণের বিধবা বোন

"গিন্নি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/ সম্পর্ক
দাসী (নাম অনুল্লিখিত)	আটাশ/ত্রিশ	আশুর গৃহের দাসী

"গুপ্তধন"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বামা	পঁচিশ/ছাব্বিশ (আনুমানিক)	বাড়ির ঝি

"ঘাটের কথা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কুসুম	আঠার (বর্তমান সময়ানুযায়ী)	গল্পের নায়িকা
বৃদ্ধা	ষাট (আনুমানিক)	চক্রবর্তীদের বাড়ীর সদস্য
মাতমহী	ছয়/সাত (আনুমানিক পূর্বসময়ানুায়ী)	বৃদ্ধার মাতামহী
মেয়েরা	আঠার/কুড়ি (আনুমানিক বর্তমান সময়ানুযায়ী)	কুসুমের শ্বশুরবাড়ির গ্রামের মেয়ে এবং বউরা

"চিত্রকর"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/ সম্পর্ক
বিধবা মা (নাম অনুল্লিখিত)	পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন (আনুমানিক)	সত্যবতীর শাশুড়ি
সত্যবতী	বাইশ/তেইশ (ঐ)	মুকুন্দর স্ত্রী

"চোরাই ধন"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সুনেত্রা	আটত্রিশ	গল্পের নায়িকা
অরুণা	সতের	সুনেত্রার কন্যা
বিভাবতী	পঞ্চান্ন/ষাট (আনুমানিক)	সুনেত্রার মা

"ছুটি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মা (নাম অনুল্লিখিত)	ত্রিশ/বত্রিশ (আনুমানিক)	ফটিকের মা
মামী (ঐ)	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (ঐ)	ফটিকের মামী

"শেষ কথা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
অচিরা	পঁচিশ/ছাব্বিশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন (আনুমানিক)	নায়কের মা

"জয়পরাজয়"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
অপরাজিতা	চৌদ্দ/পনের (আনুমানিক)	অমরাপুরের রাজকন্যা
মঞ্জরী	পনের/ষোলো (ঐ)	রাজকন্যার দাসী

“জীবিত ও মৃত”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কাদম্বিনী	ত্রিশ/বত্রিশ (আনুমানিক)	বিধবা
দিদি (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (ঐ)	কাদম্বিনীর বড় জা শারদা শংকরের স্ত্রী
যোগমায়া	ত্রিশ/বত্রিশ (ঐ)	কাদম্বিনীর সই
বিধবা ননদ	সাতাশ/আটাশ (ঐ)	শারদাশংকরের বিধবা বোন

“ঠাকুরদা”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কুসুম	চৌদ্দ/পনের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

“ডিটেক্‌টিভ”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
স্ত্রী (নাম অনুল্লিখিত)	কুড়ি/বাইশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
হরিমতি	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	পুলিশ কর্মচারী

“তপস্বিনী”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
ষোড়শী	তেইশ	গল্পের নায়িকা
শাশুড়ি (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	ষোড়শীর শাশুড়ি
পিস শাশুড়ি (ঐ)	চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (ঐ)	নায়ক বরদার পিসি

Dhaka University Institutional Repository

"তারাপ্রসন্নের কীর্তি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
দাক্ষায়ণী	পঁচিশ/ ত্রিশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
অন্নদা	বাইশ/পঁচিশ (ঐ)	প্রতিবেশিনী নারী
কমলাদিদি	সতের/আঠার (ঐ)	(ঐ)
পাড়ার সকল মেয়ে (নাম অনুল্লিখিত)	বিভিন্ন বয়সী (ঐ)	প্রতিবেশিনী নারীগণ

"ত্যাগ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কুসুম	ষোলো/সতের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
কন্যা (নাম অনুল্লিখিত)	সতের/আঠার (পূর্ব সময় অনুযায়ী)	প্যারিশংকরের কন্যা
ভগ্নি (ঐ)	বার/তের (আনুমানিক)	হেমন্তের ছোট বোন

"দর্পহরণ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
নির্ঝরিণী	বার	গল্পের নায়িকা
জাঠতুত বোন (নাম অনুল্লিখিত)	এগার/বার (আনুমানিক)	নির্ঝরিণীর জাঠতুত বোন

"দানপ্রতিদান"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
ব্রজসুন্দরী	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (আনুমানিক)	শশিভূষণের স্ত্রী
রাসমণি	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	রাধামুকুন্দের স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

"দালিয়া"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
জুলিখা	আঠার/উনিশ (আনুমানিক)	শা সুজার দ্বিতীয় কন্যা
আমিনা	পনের/ষোলো (ঐ)	শা সুজার ছোট কন্যা

"দিদি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
শশিকলা	ছাব্বিশ/সাতাশ (আনুমানিক)	মূল চরিত্র
জননী (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (ঐ)	শশিকলার মা
তারা	ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ (ঐ)	প্রতিবেশিনী

"দুরাশা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
নবাবজাদী (নাম অনুল্লিখিত)	চুয়ান্ন	বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা
বেগম মাতৃগণ (ঐ)	পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন (আনুমানিক, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে)	নবাব গোলাম কাদের খাঁয়ের বেগমগণ
বাঁদি	উনিশ/কুড়ি (ঐ)	নবাব কন্যার দাসী
ভুটিয়া স্ত্রী	ষাট/পঁয়ষট্টি (আনুমানিক, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে)	নায়ক কেশরলালের স্ত্রী

"দুর্বুদ্ধি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
শশী	বার/তের (আনুমানিক)	নেটিভ ডাক্তারের মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বিধবা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	হরিনাথ মজুমদারের কন্যা

"দৃষ্টিদান"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কুমুদিনী	সতের/আঠার (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
লাবণ্য	- ঐ (ঐ)	কুমুর সখী
পিস্‌শাশুড়ি	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (ঐ)	কুমুর পিস্‌শাশুড়ি
হেমাঙ্গিনী	চৌদ্দ/পনের (ঐ)	পিস্‌শাশুড়ির ভাসুরের মেয়ে
ঝি	তের/চৌদ্দ (ঐ)	কুমুর ঝি

"দেনাপাওনা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
নিরুপমা	চৌদ্দ/পনের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
শাশুড়ি (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	নিরুপমার শাশুড়ি

"নষ্টনীড়"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
চারু	আঠার/উনিশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
মন্দাকিনী	বিশ/একুশ (আনুমানিক)	চারুর বৌদি

"নামঞ্জুর গল্প"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক

অমিয়া	বিশ/একুশ (আনুমানিক)	পিসিমার পালিত কন্যা/স্বদেশী
হরিমতি	কুড়ি/বাইশ (ঐ)	পিসিমার আশ্রিতা, গ্রাম সম্পর্কীয়
প্রসন্ন	কুড়ি/বাইশ (ঐ)	পিসিমার আশ্রিতা, গ্রাম সম্পর্কীয়
পিসিমা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (ঐ)	নায়কের পিসিমা
দাসী (ঐ)	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (ঐ)	অমিয়ার আসল মা

"নিশীথে"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
স্ত্রী (নাম অনুল্লিখিত)	উনিশ/কুড়ি (আনুমানিক)	জমিদার দক্ষিণাচরণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী
মনোরমা	পনের	হারান ডাক্তারের কন্যা

"পণরক্ষা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সৌরভী	পনের/ষোলো (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
প্রৌঢ়া বিধবা (নাম অনুল্লিখিত)	পঞ্চাশ/বায়ান্ন (ঐ)	বংশীদের বঁধুনি
মেয়ে (ঐ)	সতের/আঠার (ঐ)	জানকী নন্দীর কন্যা
গৃহিণী (ঐ)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (ঐ)	জানকী নন্দীর স্ত্রী

"পয়লা নম্বর"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
অনিলা	বিশ/বাইশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

Dhaka University Institutional Repository

"পাত্র ও পাত্রী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (পূর্ববর্তী সময়ানুযায়ী আনুমানিক)	সনৎকুমারের মা
বিধবা (ঐ)	পঁয়তাল্লিশ/ছেচল্লিশ (বর্তমান সময়ানুযায়ী আনুমানিক)	নন্দকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী
দীপালি	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	নন্দকৃষ্ণবাবুর কন্যা
কাশীশ্বরী	ত্রিশ/বত্রিশ (ঐ)	পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা

"পুত্রযজ্ঞ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বিনোদিনী	ছাব্বিশ/সাতাশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা/বৈদ্যনাথের স্ত্রী
কুসুম	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	প্রতিবেশী বান্ধবী
পরিচারিকা	ত্রিশ/বত্রিশ (ঐ)	বিনোদিনীর গৃহের কাজের লোক

"পোস্টমাস্টার"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
রতন	বার-তের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

"প্রগতিসংহার"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সুরীতি	উনিশ/কুড়ি (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
সলিলা	উনিশ/কুড়ি (আনুমানিক)	নীহারের বান্ধবী/সহপাঠী
মেয়েরা (নাম অনুল্লিখিত)	উনিশ/কুড়ি (আনুমানিক)	সুরীতির বান্ধবী ও সহপাঠীরা
দিদিমা (নাম অনুল্লিখিত)	সত্তর/পঁচাত্তর (আনুমানিক)	সুরীতির দিদিমা

Dhaka University Institutional Repository

"প্রতিবেশিনী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
প্রতিবেশিনী (নাম অনুল্লিখিত)	পনের/ষোলো (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

"প্রতিহিংসা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
ইন্দ্রাণী	উনিশ/বিশ (আনুমানিক)	দেওয়ান গৌরীকান্তর নাতনি/অম্বিকাচরণের স্ত্রী
নয়নতারা	তেইশ/চব্বিশ (ঐ)	বিনোদের স্ত্রী
ধনী গৃহবধূ (নাম অনুল্লিখিত)	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	নয়নতারার গৃহের অতিথি/হাটখোলবাসিনী

"প্রায়শ্চিত্ত"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বিন্ধ্যবাসিনী	বিশ/একুশ (আনুমানিক)	অনাথবন্ধুর স্ত্রী
কমলা, ভুবন	একুশ/বাইশ (ঐ)	বিন্ধ্যবাসিনীর সখীরা
শ্যামাশঙ্করী	তেইশ/চব্বিশ (ঐ)	বিন্ধ্যবাসিনীর জা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (ঐ)	বিন্ধ্যর মা
শাশুড়ি (ঐ)	একচল্লিশ/বিয়াল্লিশ (ঐ)	বিন্ধ্যর শাশুড়ি
দাসী (ঐ)	সতের/আঠার (ঐ)	বিন্ধ্যর দাসী
মেম (ঐ)	তেইশ/চব্বিশ (ঐ)	অনাথের বিলেতি স্ত্রী

"ফেল"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক

পরমাসুন্দরী (নাম অনুল্লিখিত) ভাবী বধূ (ঐ)	ষোলো/সতের (আনুমানিক) সতের/আঠার (ঐ)	রাওলপিণ্ডিতে প্রবাসী বাঙ্গালী/নন্দর স্ত্রী কলকাতার মেয়ে নলিনের স্ত্রী

‘বদনাম’

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সৌদামিনী মিনু	একুশ/বাইশ (আনুমানিক) পনের/ষোলো (ঐ)	গল্পের নায়িকা বিজয়বাবুর ভাতিজি গিরিশবাবুর কন্যা

“বলাই”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কাকি (নাম অনুল্লিখিত) বৌদিদি (ঐ)	কুড়ি/বাইশ (আনুমানিক) বাইশ/পঁচিশ (ঐ)	কথকের স্ত্রী বলাইয়ের মা (মৃত)

“বিচারক”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
হেমশশী ক্ষীরোদা (হেমশশীর ছদ্মনাম) মা (নাম অনুল্লিখিত)	চৌদ্দ/পনের পূর্ব সময়ানুযায়ী (আনুমানিক) আটত্রিশ (বর্তমান সময়ানুযায়ী) চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	বাল্যবিধবা বহুপরিচর্যাকারিণী (হেমশশী) হেমশশীর মাতা

“বোষ্টমী”

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
আনন্দী	আটত্রিশ/চল্লিশ (আনুমানিক)	বোষ্টমী

"ভাইফোঁটা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
অনুসূয়া	বাইশ/তেইশ (আনুমানিক)	অখিলবাবুর কন্যা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (আনুমানিক)	নায়কের মা
স্ত্রী (ঐ)	তেইশ/চব্বিশ (আনুমানিক)	নায়কের স্ত্রী
কয়েকজন বিধবা (ঐ)	বিভিন্ন বয়সের (আনুমানিক)	প্রতিবেশিনী যারা ব্যবসায়ে টাকা দিয়েছিলেন

"ভিখারিনী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কমল দেবী	পনের (বর্তমান সময়ানুযায়ী আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
বিধবা (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (আনুমানিক)	কমলের মা
প্রতিবেশিনীগণ (ঐ)	বিভিন্ন বয়সী (ঐ)	বিধবার প্রতিবেশিনীগণ
বালিকারা (ঐ)	চৌদ্দ/পনের (ঐ)	কমলের সখীরা

"মণিহারা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মণিমালিকা	চব্বিশ	গল্পের নায়িকা
মাসি (নাম অনুল্লিখিত)	পঞ্চাশ/বায়ান্ন (আনুমানিক)	ফণিভূষণের মাসি
পিসি (ঐ)	পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন (ঐ)	ফণিভূষণের পিসি
খুড়ি (ঐ)	পঞ্চান্ন/ছাপান্ন	ফণিভূষণের খুড়ি

"মধ্যবর্তিনী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক

হরসুন্দরী	পঁয়ত্রিশ	নিবারণের প্রথম স্ত্রী
শৈলবালা	বার/তের (আনুমানিক)	নিবারণের দ্বিতীয় স্ত্রী

"মহামায়া"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মহামায়া	চব্বিশ	গল্পের নায়িকা
পিসি (নাম অনুল্লিখিত)	পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন (আনুমানিক)	নায়কের পিসি

"মানভঞ্জন"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
গিরিবালা	বাইশ/পঁচিশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
সুধামুখী	উনিশ/কুড়ি	গিরিবালার দাসী
লবঙ্গ	বাইশ/পঁচিশ	থিয়েটারের অভিনেত্রী
মনোরমা	----	লবঙ্গের নাট্য নাম

"মাল্যদান"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কুড়ানি	ষোলো	গল্পের নায়িকা
পটল	বাইশ/তেইশ (আনুমানিক)	কুড়ানির পাতানো দিদি
তুলসি	আঠারো/উনিশ (ঐ)	বাড়ির দাসী

"মাস্টারমশায়"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
ননীবালা	পঁয়ত্রিশ/চল্লিশ (আনুমানিক)	বেণুগোপালের মা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (আনুমানিক)	হরলালের মা

"মুকুট"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কমলা দেবী	উনিশ/কুড়ি (আনুমানিক)	ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী

"মুক্তির উপায়"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
হৈমবতী	পনের/ষোলো (আনুমানিক)	ফকিরচাঁদের স্ত্রী
বড় স্ত্রী (নাম অনুল্লিখিত)	পঁচিশ/ছাব্বিশ (আনুমানিক)	মাখনলালের বড় স্ত্রী
ছোট স্ত্রী (নাম অনুল্লিখিত)	উনিশ/বিশ (ঐ)	মাখনলালের ছোট স্ত্রী

"মুসলমানীর গল্প"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কমলা	পনের/ষোলো (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
কাকী	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (আনুমানিক)	কমলার কাকী
সরলা	ষোলো/সতের (ঐ)	কমলার কাকাত বোন

রাজপুতানী (নাম অনুল্লিখিত)	বাইশ/তেইশ (পূর্ববর্তী সময়ানুযায়ী)	হবির খাঁয়ের মা

"মেঘ ও রৌদ্র"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
গিরিবালা	দশ/পনের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

"যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কমলা	এগার	গল্পের নায়িকা
জ্যাঠাইমা (নাম অনুল্লিখিত)	ষাট/পঁয়ষট্টি (আনুমানিক)	যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা

"রবিবার"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বিভা	একুশ/বাইশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
শীলা	একুশ/বাইশ (আনুমানিক)	নায়কের বান্ধবী
মনীষা	একুশ/বাইশ (আনুমানিক)	নায়কের প্রাক্তন প্রেমিকা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	নায়কের মা

"রাজটিকা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
অরুণলেখা	বাইশ/তেইশ (আনুমানিক)	নবেন্দুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী প্রমথনাথের দ্বিতীয় বোন

Dhaka University Institutional Repository

লাবণ্যলেখা	পঁচিশ/ছাব্বিশ (ঐ)	অরুণলেখার বড় দিদি নবেন্দুর জ্যেষ্ঠা শালী
কিরণলেখা	আঠার/উনিশ (ঐ)	নবেন্দুর তৃতীয় শালী
শশাঙ্কণলেখা	চৌদ্দ/পনের (ঐ)	নবেন্দুর চতুর্থ শালী

"রাজপথের কথা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বালিকা (নাম অনুল্লিখিত)	তের/চৌদ্দ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা

"রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
শ্রীমতী বরদাসুন্দরী	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (আনুমানিক)	গুরুচরণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী
স্ত্রী (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়তাল্লিশ/ছেচল্লিশ (আনুমানিক)	রামকানাইয়ের স্ত্রী/নবদ্বীপের মা

"রাসমণির ছেলে"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
রাসমণি	বত্রিশ/পঁয়ত্রিশ (আনুমানিক)	কালিপদর মা
ব্রজসুন্দরী	পঞ্চান্ন/ষাট (আনুমানিক)	ভবাণীচরণের মা
রমাসুন্দরী	পঞ্চান্ন/ষাট (আনুমানিক)	শ্যামাচরণের স্ত্রী/ভবানীচরণের বৌদিদি

"রীতিমত নভেল"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যুন্মালা	পনের/ষোলো (আনুমানিক)	কাঞ্চীনগরের রাজকন্যা

"ল্যাবরেটরী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সোহিনী	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (আনুমানিক)	মূলচরিত্র (নন্দনকিশোরের স্ত্রী)
নীলা	আঠার/উনিশ (আনুমানিক)	সোহিনীর মেয়ে
আইমা	পঁচাত্তর/আশি (আনুমানিক)	সোহিনীর আইমা
পিসিমা	পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন (আনুমানিক)	রেবতীর পিসিমা

"শাস্তি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
চন্দরা	সতের/আঠার (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
রাধা	বাইশ/চব্বিশ (আনুমানিক)	চন্দরার বড় জা

"শুভদৃষ্টি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সুধা	ষোলো/সতের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
ঠানদিদি (নাম অনুল্লিখিত)	ষাট/পঁয়ষট্টি (ঐ)	পাড়ার সরকারি ঠানদিদি
মেয়েটি (নাম অনুল্লিখিত)	তের/চৌদ্দ (ঐ)	পাড়ার এক বোবা ও কালা মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

"শেষ পুরস্কার"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মৃণালিনী	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (আনুমানিক)	ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস অব স্কুলস/ জগদীশপ্রসাদের দিদি
বিমলা	ত্রিশ/বত্রিশ (ঐ)	মজঃফরপুরের মেয়েদের হাইস্কুলের শিক্ষিকা
মেয়েরা (নাম অনুল্লিখিত)	চৌদ্দ/পনের (ঐ)	ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রীরা

"শেষের রাত্রি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মণি	ষোলো/সতের (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
মাসি (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়তাল্লিশ/ছেচল্লিশ (ঐ)	নায়কের মাসি

"সংস্কার"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কলিকা	পঁচিশ/ছাব্বিশ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
দাসী	ষোলো/সতের (ঐ)	কলিকার বাড়ির কাজের লোক

"সদর ও অন্দর"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
বসন্তকুমারী	সতের/আঠার	নায়িকা

Dhaka University Institutional Repository

"সমস্যাপূরণ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মির্জাবিবি (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (আনুমানিক)	অছিমদ্দির মা

"সমাপ্তি"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মৃন্ময়ী	তের/চৌদ্দ (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
শরৎ	চল্লিশ/বিয়াল্লিশ (ঐ)	মৃন্ময়ীর মা
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (ঐ)	অপূর্বের মা
ভগ্নী (ঐ)	আঠার/উনিশ (ঐ)	অপূর্বের ছোটবোন
বালিকা (ঐ)	চৌদ্দ/পনের (ঐ)	পাত্রী/বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপ

"সম্পত্তি-সমর্পণ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
দিদিমা (নাম অনুল্লিখিত)	আশি/একাশি (আনুমানিক)	বৃন্দাবনের দিদিমা (গল্পে অনুপস্থিত)
মা (ঐ)	পঁয়তাল্লিশ/ছেচল্লিশ (ঐ)	বৃন্দাবনের মা (গল্পে অনুপস্থিত)
স্ত্রী (ঐ)	আঠার/উনিশ (ঐ)	বৃন্দাবনের স্ত্রী

"সম্পাদক"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
স্ত্রী (নাম অনুল্লিখিত)	বাইশ/তেইশ (আনুমনিক)	সম্পাদকের স্ত্রী (মৃত)
দাসী (ঐ)	উনিশ/কুড়ি (ঐ)	কাজের মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

"সুভা"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
সুভাষিণী	পনের/ষোলো (আনুমানিক)	গল্পের নায়িকা
সুহাসিনী	উনিশ/কুড়ি (ঐ)	সুভার মেজো বোন
সুকেশিনী	চব্বিশ/পঁচিশ (ঐ)	সুভার বড় বোন

"স্ত্রীর পত্র"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মৃণাল	সাতাশ	গল্পের নায়িকা
বড় জা (নাম অনুল্লিখিত)	ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ (আনুমানিক)	মৃণালের বড় জা
বিন্দু	চৌদ্দর কাছাকাছি	বড় জায়ের ছোট বোন
শাশুড়ি (নাম অনুল্লিখিত)	পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ (আনুমানিক)	বিন্দুর শাশুড়ি

"স্বর্ণমৃগ"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
মোক্ষদাসুন্দরী	বাইশ/তেইশ (আনুমানিক)	বৈদ্যনাথের স্ত্রী
বিন্ধ্যবাসিনী	চব্বিশ/পঁচিশ (ঐ)	আদ্যানাথের স্ত্রী
ঝি (নাম অনুল্লিখিত)	সতের/আঠার (ঐ)	মোক্ষদার গৃহের ঝি

"হালদার গোষ্ঠী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
কিরণলেখা	পঁচিশ/ছাব্বিশ (আনুমানিক)	বনোয়ারিলালের স্ত্রী
সুখদা	পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ (ঐ)	মধুকৈবর্তের স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

ছোট বউ (নাম অনুল্লিখিত)	আঠার/উনিশ (ঐ)	বংশীলালের স্ত্রী
মা (ঐ)	পঞ্চাশ/বায়ান্ন (ঐ)	মনোহরের স্ত্রী

"হৈমন্তী"

গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নারী চরিত্র

চরিত্রের নাম	বয়স	পরিচয়/সম্পর্ক
হৈমন্তী	সতের	গল্পের নায়িকা, অপর নাম শিশির
মা (নাম অনুল্লিখিত)	চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ (আনুমানিক)	হৈমন্তীর শাশুড়ি
প্রবীণগণ (ঐ)	সত্তর/পঁচাত্তর (ঐ)	অপুর দিদিমারা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ: 'গল্পগুচ্ছ' (চতুর্থ খণ্ড একত্র সংকলন), প্রকাশকাল: চৈত্র ১৩৮৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা

সহায়ক ও পঠিত গ্রন্থসমূহ

১. অনীক মাহমুদ, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ,' বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০০

২. অমূল্য সরকার, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব', বাগার্থ, কলকাতা, ১৯৬৫

৩. অরুণকুমার বসু, 'রবীন্দ্র-বিচিন্তা (প্রথম পর্ব),' ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৭৫

৪. আনোয়ার পাশা, 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা', স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭০

৫. আহমাদ মাযহার, 'রবীন্দ্রনাথ নারী বাংলাদেশ', জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

৬. আজহার ইসলাম, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

৭. উদয়চাঁদ দাস, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: প্রেক্ষিত বাস্তবতা,' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০৩

৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'রবীন্দ্র-গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ,' গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৩৯১

৯. গোলাম মুরশিদ, 'রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৮৮

১০. গোপীমোহন সিংহরায়, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী,' ভারবি, কলকাতা, ১৯৯২

১১. গোপালচন্দ্র রায়, 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ,' সাহিত্য সদন, কলকাতা

১২. তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ,' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯৭

১৩. তরুণ ঘোষ, 'প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ও ছোটগল্প,' বসুশ্রী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৮

১৪. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্র-চর্যা, জেনারেল', কলিকাতা, ১৯৭৩

১৫. নীপা কর, 'নারী রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে,' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪

১৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ', বাক-সাহিত্য প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৭৩

১৭. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'বাঙালী জীবনে রমণী,' মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৭৪

১৮. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, 'মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ', প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯০

১৯. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্র সংস্কৃতি,' সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৯৪

২০. নীহাররঞ্জন রায়, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা,' নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৪৮

২১. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,' মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৩৬১

২২. প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', মৈত্রী, কলকাতা ১৩৬০

২৩. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা, ১৩৮৫

২৪. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', মহলানবিশ ট্রাস্ট পরিচালনা সমিতি, ১৩৯২

২৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি', জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৬৯

২৬. বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য,' নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৩৬২

২৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'সাহিত্যের অভিজ্ঞতা', সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

২৮. বেগম রোকেয়া, 'বাংলা সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্ক,' বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৪১৭

২৯. বিশ্বপতি চৌধুরী, 'কথাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩০. বিশ্বনাথ রায়, 'গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৯৫

৩১. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ', জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৭১

৩২. বিষ্ণু দে, 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৭

৩৩. বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক), 'রবীন্দ্র বিচিত্রা,' সাহিত্যম, কলিকাতা, ১৩৭৯

৩৪. ভূদেব চৌধুরী, 'পুণ্যস্মৃতি', মৈত্রী, কলিকাতা, ১৩৪৯

৩৫. ভবতোষ দত্ত, 'রবীন্দ্র চিন্তাচর্চা,' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৯

৩৬. ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৭৬

৩৭. মৈত্রেয়ী দেবী, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', রূপা এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৬৭

৩৮. মোবাশ্বের আলী, 'শিল্পীর ভুবন', বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫

৩৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ', মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৯

৪০. শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প,' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৩

৪১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৭৩

৪২. শোভন সরকার, 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ,' আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮২

৪৩. সুকুমার সেন, 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড),' ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫৩

৪৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদক), 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ'; 'শিক্ষাচিন্তা;' 'রবীন্দ্ররচনা-সংকলন,' গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮২

৪৫. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ,' গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৮৭

৪৬. সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি,' মৈত্রী, কলিকাতা, ১৩৪৯

৪৭. সুবীর চন্দ্রকর, কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬৩।

৪৮. স্বরোচিষ সরকার, অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশন, ২০০৫।

৪৯. সুনীলময় ঘোষ, রবীন্দ্রচর্চা অনুদর্শন, কলকাতা, সাহিত্যম, ২০১০।

৫০. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, এসেছে রবির কর, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রামপূর্ণিমা ১৪২২।

৫১. হীরেন দত্ত, অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।